নৈঋতে মেঘ

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
অবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

প্রণতি ও নবারুণকে

আমাদের প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই :

হাজার চুরাশীর মা

অগ্নিগর্ভ

অরণ্যের অধিকার

লায়লী আসমানের আয়না

ধানের শীষে শিশির

গল্পের নাম 'জগমোহনের মৃত্যু' হলেও জগমোহন, সোম্‌রা গঞ্জু ও বুলাকি তিনজনেই এই মৃত্যু দ্বারা অসম্ভব কিংবা সদাই সম্ভব সব পরিণামে উত্তীর্ণ হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে সাতাত্তরের অকটোবরে। কাহিনীটির একটি অলৌকিক দিকও আছে। সেটি এখন বুকডিহা গ্রামের হনুমান মিশ্রের এখতিয়ারে। বস্তুত, বুকডিহার সন্নিকটে সেই অকটোবরে, দেবীপক্ষে যেসব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে, তাতে হনুমানের শ্রেষ্ঠতা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অঞ্চলটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভারত ও ভারতবাসীর মন থেকে ছুয়াছুত ও নিম্নবর্ণ উৎপীড়ন বন্ধ করতে যাঁরা আইনের মাধ্যমে বদ্ধপরিকর, তাঁদের শিক্ষা দেবার জন্যেই ঘটনাটি ঘটেছিল বলে মিশ্র-সমর্থকরা বলে থাকেন। সেই মর্মে ব্রিজভূষণ ছত্রী লিখিত 'জগমোহন কে অমর কহানী' পুস্তিকাটি পাটনায় ছাপা হয় ও গোমো-ডালটনগঞ্জ লাইনের স্টেশনসমূহের কোথাও-কোথাও বিক্রি হয়। জগমোহন মন্দিরে স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এ লাইনটি কেতাব বিক্রির লাইন নয়। গ্রামগুলি প্রাগৈতিহাসিক। অধিবাসীরা ভারত সরকারের মর্মপীড়ার কারণ। এই সব ওঁরাও, মুণ্ডা, হো ইত্যাদির লিখিত ভাষা-লিপি নেই। তারা দিনান্তের চীনা ঘাসের দানার ঘাটো যোগাড়ে হাজার বছর ধরে হাঁটছে। জগমোহনের কেতাব এই নিরন্ন নেংটেরা পড়বে না। অতএব কেতাবটি ভুরকুণ্ডা খালাড়ি পত্রাতু ইত্যাদি নয়া-ধনী শিল্পাঞ্চলে বিক্রি হয়। এই সব আদি অধিবাসীরা ভারত সরকারকে না-জেনে নানাবিধ মর্মপীড়া দেয়। উন্নয়ন দপ্তরকে ডিফাই করে এরা অনুন্নত থাকে। ছুয়াছুত সরকারের পছন্দ নয় জেনেও এরা উচ্চবর্ণকে ভয় পায়। দেশের ধনসম্পদে এদের অধিকার থাকাই সরকারের ঘোষিত বাসনা, তবু ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, মাইকা, লোহা, তামা, সিমেন্ট, কয়লা সব অনাদিবাসীদের হাতে তুলে

দিয়ে এরা দূর থেকে অনাহারে শীর্ণ শরীর নিয়ে কলকারখানার শোভা দেখে। সবচেয়ে বিচ্ছিরি ব্যাপার হল, আকালের সময়ে দেশী ও বিদেশী প্রেস ফোটোগ্রাফার এলে এরা কেন যেন ছবি তুলতে দেয় এবং মানুষ নামের ক্যারিকেচার সদৃশ সে সব চেহারার ছবি বাইরে প্রচার হয়ে ভারত রাষ্ট্রের ইমেজ নষ্ট করে। আসলে এরা ঢ্যাঁদিয়া খচ্চর। আগের রেজিমে জরুরী অবস্থার হুমকিতে এদের জীবনে আকাল ও খবার ব্যাপার চেপে দেওয়া গিয়েছিল। বর্তমান সরকার লাক্স বলে এরা সমানে নিজেদের দারিদ্র্য জানাবার সুবিধে নিচ্ছে। আশ্চর্য কি, এরা জাতকে জাত লোপ পেলে সরকার বাঁচে? ভারতের বহির্বিশ্বের খাদ্য রপ্তানির ব্যাপারটি বদমাশি মনে হয় না? যা হোক, বর্তমানে বুরুডিহা অঞ্চলে জগমোহনের বিদেহী প্রভাব অতীব সংক্রামক। কেতাবে সবই লেখা আছে এই আটাত্তরে কর্পূরী ঠাকুরের জব-রিজার্ভেশনের সদিচ্ছা বুমেরাং হবার পর জগমোহনের কেতাবে সে ঘটনাও অ্যাডেড হয়েছে। হবার পেছনের সদুদ্দেশ্য হল, জগমোহনের ঘটনাতেই প্রমাণ হল, ছোটলোক ছোটলোকই থাকবে। অ্যাবস্ট্রাক্ট ঈশ্বর, সমূর্ত কাশীবিশ্বনাথ, হনুমানদেও, রামজী অবতার সকলেরি তাই ইচ্ছে। এর পরেও কর্পূরী ঠাকুর লাফালাফি করতে গিয়ে হিন্দু দেবতা-বর্গের হাতে হজিমতটি হলেন। কেতাবটি লাখে লাখে বিক্রি হয় এবং বুরুডিহা অঞ্চলের কাস্ট হিন্দু রমণীরা সেটিকে সাঁইবাবা ও সন্তোষী মার ছবির সঙ্গে রেখে পুজো করেন। এইভাবে জগমোহনের মৃত্যুটি ক্রমে মালটিপার্পস হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু তা পরে বিবেচ্য। জগমোহনের ব্যাপারটি জাতির জীবনে কত বড় ঘটনা, বিগত রেজিমকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে কত বড় দিগ্‌দর্শক, তা কলকেতার মানুষ বুঝবেন না। কেননা তাঁরা কলকাতাকেই ভারতবর্ষ এবং নিজেদের সকল ভারতীয় মনে করেন। তাঁরা এ খবরও রাখেন না, জগমোহনের ব্যাপারে সরকারের উপরমহলের বহুজন নূতন পথের আলো দেখেছেন এবং সরকারী সহায়তায় অচিরে জগমোহন কাহিনী চিত্ররূপ পেতে পারে। সেকুলার ইনডিয়া মানে যে উচ্চবর্ণ শাসিত ইনডিয়া, এ সত্যটি সবাই জানেন,

মুখে বলেন না, কাজে করে দেখান। সিনেমা হয়ে দেখা দিলে আইডিয়াটি সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃতি পাবে। কেননা ফিল্‌ম না দেখলে ভারতের জনগণ কিছু শিখতে চায় না। দেশপ্রেম, মাতাল স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য ও প্রতীক্ষার প্রয়োজন, পুলিসের সততা, গরিবের জন্য ধনীর মর্ম-বেদনা। এ সব দেশেই আছে ও থাকে। কিন্তু ধর্মেন্দ্র বা হেমা মালিনী বা লতা মুংগেশকর সহায়তা না করলে ভারতীয়রা ভারতীয়ত্বের এ সকল এ-বি-সি-ও শিখতে পারে না। শোনা যাচ্ছে এ চিত্রে স্বয়ং ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং কাঠিয়াবাবা জগমোহন হাতির দেহে মিলবেন ও দেহ থেকে বেরোবেন। জগমোহন যে চতুষ্পদ বৃহৎ স্তন্যপায়ীমাত্র নয়, উক্ত মহাপুরুষদের গজরূপ, তা ওইভাবেই প্রমাণ হবে। নিরন্ন সোম্‌বা, মাহুত বুলাকি ইত্যাদি চরিত্রে সর্বভারতীয় স্টার কাস্ট থাকবে। জগমোহন চরিত্রের জন্যে অভিনেতা পেলেই ছবি শুরু হবে। তবে হাতির চরিত্রে অভিনয় করতে কোনো ভারতীয় রাজী না হলে আমেরিকায় ফীলার পাঠানো হবে। যা হোক, ভবিষ্যতের কথা শিকেয় থাকুক। জগমোহন কাহিনীর গ্রামকূটে প্রত্যাবর্তনই প্রার্থনীয়।

সাতাত্তরের অকটোবরে, অন্যান্য অকটোবরের মত পালামৌয়ের জঙ্গল সরস বাঁশ ঝাড় ও অকেশনাল বটগাছে সুশোভিত ছিল। বাঁশ বলতেই বাঙালীরা প্রবাদীয় বাঁশের পায়ুভেদ বোঝেন। কিন্তু বাঁশ ও বট, দুটি গাছের পাতা ও কচি ডাল হাতির প্রিয় খাদ্য, তা সবাই জানেন না। জান দরকার নয় বলে যাঁরা ভাবেন, তাঁদের জেনে রাখা ভাল। তাঁরা যা যা জানেন, তাতে ভারত রাষ্ট্রের কিছু এসে যায় না। তাঁরা জানেন, বাঙালী হচ্ছে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং রাজনীতিতে সংগ্রামী, কিন্তু তাতে ধানবাদের গুণ্ডারাজ বা আচার্যভাবের গোহত্যা নিবারণে অনশন প্রভাবিত হয় না। জগমোহনজাতীয় এক বৃহৎ ম্যামাল তাঁদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী ও ভারতে আবার জরুরী অবস্থা কায়েমের পক্ষে সহায়ক। হাতির বাঁশগাছ ও বটপাতা প্রীত, ভারতে আবার বিগত রেজিম ফিরিয়ে আনার পরিবেশ সৃজনে সহায়ক হয়েছিল। কারণ, কাশীবাসী চরণদাস মোহান্তের কঞ্জুস স্বভাব। সে

জন্যেই এত সব ঘটে গেল ও এক নূতন, এমার্জেন্সী-উজ্জ্বল এশিয়ার মুক্তি-সূর্যালোকিত ভারতভূমির সূচনা হল।

চরণদাস বহু মোহান্তের একজন। বেনারসে তার হাবেলি কে হাবেলি—বাস-ট্যাকসি-সেবাদাসী-মোষ-দেহাতে জমি এবং চারটি হাতি আছে। হাতিগুলি তার স্টেটাস সিম্বল। কিন্তু হাতির খোরাক বিষয়ে তার আশ্চর্য নির্বেদ। বেনারস থেকে অদূরে গ্রামের বাড়িতে। পাকা বাড়ি ও চারতলা) স্থাপত লক্ষ্মী-জনার্দনই হাতির কারণ, অথবা তাঁদের কারণেই হাতি। দোল, জন্মাষ্টমী ও দশেরাতে লক্ষ্মী ও জনার্দন হাতির পৃষ্ঠে চড়ে গ্রাম ও শহরতলি ঘোরেন ও প্যালা নেন। সে কারণে মাদী হাতি মোতি আছে। মোহান্তের হাতির খোরাক তাঁর ভক্ত প্রজারাই দিয়ে থাকে। বাকি তিনটি পুরুষ হাতিতে মোহান্তর একবারই দরকার পড়ে। রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শনে তিনি আঠারোনলা থেকে গজপৃষ্ঠে শহরে ঢোকেন। জগমোহন, গণেশ ও ঘনশ্যাম, তিনটি হাতির পিঠে মোহান্ত ও সাঙ্গপাঙ্গরা বসেন। এছাড়া সম্বচ্ছর হাতি তাঁর কোনো কাজেই লাগে না। 'হিউজ ফোর ফুটেড প্যাকিডার্ম'দের দেখলে তাঁর মোহান্তগিরির মত ফায়দাজনক কারবারকে অলীক মনে হয়। ওদের আহার উনি কখনোই দেন না, তবু 'হাতির খোরাক' ভাবলেও তাঁর হৃৎকম্প হয়। গরু-মোষ নয় যে খাওয়ালে দুধ দেবে। ট্যাকসি বা বাস নয়, যে পেট্রল খাওয়ালে পয়সা এনে দেবে। পোষা মেয়েছেলে নয়, যে খাওয়ালে-মাখালে শয়নকালে মাংস-সুখ দেবে। বেগর-ফয়দা কারবারকে 'হাতি-পোষা' বলা হয়। এ তো আক্ষরিক অর্থে হাতি পোষা। হায়! সেদিন নেই, যে জরুরী অবস্থার সুখে হাতি দিয়ে দেহাতী ভাঙ্গি প্রজাদের ঘর মাড়াই করবেন, তাদের চাল থেকে খড় নিয়ে হাতি খাবে, গোলার ধান। অথচ মোহান্ত হবার বিপদ হল, চারটি হাতি ওঁকে রাখতেই হবে। তাই হাতি মরলে শোনপুরের মেলা থেকে ফিন্ ভি হাঁথি খরিদ করতে হয়। এটি না রাখলে বদনাম হয়। চরণদাস খুবই মডার্ন মোহন্ত। কিন্তু পিতৃপুরুষের স্থাপিত ঐতিহ্যটি অস্বীকার করতে পারেন না।

কিন্তু হাতি তো হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারে না। চরণদাসের ঠাকুর্দা নিয়মিত হাতিদের পানফলের জিলিপি খাওয়াতেন। চরণদাস যাতে যাবজ্জীবন হাতিদের জিলিপি খাওয়াতে পারেন সেজন্যে তিনি হাবেলি পর হাবেলি উঠাকে রেখে যান। চরণদাস তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করেন না। কেননা কাশীমাহাত্ম্য বলতে কিছুই নেই এখন। উচ্চবর্ণের দাপট ছাড়া। সেটি আছে বলেই নিম্নবর্ণের মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে রগড়া খেয়ে যান। কিন্তু অন্যদিকে সব ডামাডোল। জিলিপি এখন চড়া দামে বিকোয়।

হাতিদের খাওয়ার ব্যাপারটি মোহান্ত সুকৌশলে সেরেছেন। বেনারসে দুটি হাতি রাখেন। দু ছেলের বিয়ে হয়েছে। মোহান্তর বেয়াইরা তাদের খাওয়া যোগান। শর্ত করেই বিয়ে দেওয়া। সে দুটি গণেশ ও ঘনশ্যাম, বাচ্চা হাতি। এখনো টেনে খায় না।

জগমোহন বুড়ো হাতি। তার মাহুত বুলাকিও বুড়ো। বুলাকি ফি বছর জগমোহনকে নিয়ে বেনারস থেকে পুরী যায়। সারা বছর ও যেখানে জঙ্গল পায় সেখানে হাতি চরাই করে বাঁশপাতা ও কচি ডাল এবং বটপাতা খাওয়ায়। পুরী থেকে ফিরে অন্য হাতিরা বেনারসে ফেরে। জগমোহন ফেরে না। মেদিনীপুরের পথে হেঁটে হেঁটে সে আবার পালামৌ বা চাইবাসার জঙ্গলে হারিয়ে যায়। চরণদাস জগমোহনকে যেমন খেতে দেন না, বুলাকিকেও তেমনি মাইনে দেন না। বুলাকি জগমোহনকে গ্রাম্য জোতদারের বিয়ের শোভাযাত্রায় ভাড়া দেয়, রাঁচি শহরে ছেলেপিলেকে পয়সা নিয়ে পিঠে চড়ায়। তাতে য মেলে, তা তার। চরণদাসের ধারণা হেভি মেলে, বুলাকি জানে কিছুই মেলে না। জগমোহন ও বুলাকি, দুজনের বয়সই সাতান্ন। আঠারো বছর বয়সে বুলাকি জগমোহনের মাহুতত্বে অ্যাপয়েন্টেড হয়। মাইনে ঠিক হয় দু টাকা, খোরাকি ও বছরে তিনবার কাপড়া-লত্তা। মাইনে কম বলা চলে না। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় দু টাকায় এক মণ চাল মিলত। বেনারসে দু টাকার দাম অনেক বেশি ছিল।

কিন্তু কেন যেন, বুলাকিকে মাইনে দেওয়া আর হয়ে ওঠে নি। বুলাকিও চাইতে পারে নি, চরণদাসও দেয়নি। হাতি নিয়ে তখন শহরে

বেরুনো চলত এবং যে প্যালা পড়ত, বুলাকিও তার ভাগ পেত। জগমোহনের পুরুষকার সুবিদিত ছিল ও আশপাশের গ্রামীণ রহীস্ লোকেরা মাদী হাতি কিনলে মস্তির সময়ে জগমোহনকে নিয়ে যেতেন। তা থেকে চরণদাসের বিলক্ষণ কিছু আসত। কেন না রহীস্‌গণ হাতির বাচ্চা বিক্রি করত ভালো দামে। জগমোহন খেটে মরেছে, বাচ্চা বেচেছে রহীস্‌রা। চরণদাস টাকা পেত। বুলাকি পেত বকশিশ ও জামাকাপড়। জগমোহন পেত শীত আটকাবার কম্বল।

প্যাকিডার্মরা পরিবার নিয়ে থাকতে ভালবাসে। হাতি খুবই সংসারী ম্যামাল। জগমোহনের মুশকিল হয়েছিল, হাতি হয়ে তাকে হস্তিনীর গর্ভাধান করতে হত। কিন্তু হস্তিনীর গর্ভাবস্থা, তার শাবক জন্মালে তাকে দেখাশোনা করা এসব স্বাভাবিক কাজ সে করতে পায়নি। মানুষের প্রয়োজনে তার হস্তিত্ব সম্পূর্ণ হতে পেত না। বুলাকি তার ব্যথা বুঝত এবং ছুটকি-ছাটকি ঝি বা সস্তার রাণ্ডী ছাড়া তার স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষার কোনো পার্মানেন্ট সেটলমেণ্ট যেহেতু হয়নি, সেহেতু সে জগ-মোহনের সঙ্গে একটা আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জগমোহনকে সে মাঝেমধ্যে কিস্‌সা বলে সান্ত্বনা দিত।

যেমন: 'জানি তোর দুঃখ আছে। কি করবি বল? তু ভি মনিবের নোকর, আমিও। তুকে কি বলব বল? মনিবটো নিজে ভি লা-মরদ আছে। বচপনসে এত রাণ্ডীর সঙ্গে লাটপাট করল, যে রাত-কী-কাম করতে পারে, লেকিন ওর গর্মিসে কখুনো বেটা পয়দা হয় না। পর-পর তিনটো সাদী করে নিল। কিছু পয়দা হল না। তখুন সাধু-সন্ত, ডাগদার-ইলাজ খুব করলে। আরে গর্মিতে জীউ নেই, হেকিম কি করবে? তাতে বনারসে খুব হাঁস উঠে গেল। তখুন মনিব ভাইকে বলল, ঘর কী লাজ, তু লড় যা। ভাই ভি লড়ে গেল। বাস। আট বছরে তিন বছর ঘরে সাত বেটা-বেটি পয়দা হল। জগমোহন! তু মরদ, হামি মরদ, লেকিন্ ও লা-মরদ, হম দোনোঁকো খরিদ করে লিয়েছে। তোর দুঃখ আমি বুঝি। ই সমঝ্ যা, আর দুখ মৎ কর।'

কাহিনীটি সত্যি বলেই তা কিস্‌সা। জগমোহন এ কাহিনীর কতটা

বুঝত কে জানে। তবে বুলাকি তার আত্মার আত্মীয় ছিল। চরণদাসের প্রয়োজনে এক আনরিয়াল জগতে বাঁচত বলেই জগমোহন বুলাকির ক্ষণিক অদর্শনে, রিয়ালিটি হারিয়ে গেল বলে বেজায় ভয় খেত। বুলাকি রাণ্ডীবাড়ি গিয়ে মাঝেমধ্যে দু-তিনদিন ডুব মারলে সে খাওয়া ছেড়ে দিত। চরণদাস বলত 'একে ছেড়ে যাবি না কখনো।' এবং শোনা যায়, একবার হাতি চেপেই বুলাকি কোনো চার আনার রাণ্ডীবাড়ি গিয়েছিল। ফলে সেদিন বেনারসের সস্তার রাণ্ডীরা কুলধর্ম ভুলে সবাই এসে জগমোহনের শুঁড়ে গাঁদার মালা পরায়, পায়ে জল দেয় এবং খোল বাজিয়ে 'গোকুলবালে শঁবরিয়া' নামক ভক্তি-গীতি গায়। বুলাকিকে তারা সেদিন সঙ্গকামী পুরুষ হিসেবে না দেখে, গডের এমিসারি রূপে দেখে এবং রাণ্ডীদের মাল্‌কিন বুড়ি গুলাবী সহসা, 'বুলাকি কাঁয়? ই তো বাবা বিশ্বনাথ ছে' বলে ভরের বশে মুচ্ছো যায়।

ঘটনাটি বেনারসে ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং দামী রাণ্ডী, গাইয়ে বাঈজী সকলের মহলেই বুলাকি জগমোহনকে ঘুরিয়ে বহু পতিতাকে ফর দ্য টাইম বিয়িং উদ্ধার করেছিল। উদ্ধারের পুণ্যকাজটি স্থায়ী হয় নি, তার কারণ বড় গভীর। স্থায়ী হলে, উক্ত রমণীদের দেহ-বেচা কাজটি ছাড়তে হত। ছাড়লে তারা খেত কি? খদ্দের পুরুষরাই বা কোথায় যেত? এ ঘটনার ফলে বুলাকির জীবনেও ফোর্সড্ অ্যাবস্টিনেন্স্ ঘটে যায়। কেননা রাণ্ডীদের চোখে সে চিরতরে গডের এমিসারি হয়ে যায়। গডের এমিসারির সঙ্গে সুরাপান, মেটুলি ভোজন ও শয়ন-রমণে তারা রাজী হয় না, 'নহীঁ নহীঁ দেওতা' বলে প্রণাম ঠুকতে থাকে। চরণদাসের ছুটকি দাসীরাও উক্ত রোগের সংক্রমণে ভোগে, এবং বুলাকি ফাঁপরে পড়ে স্বাভাবিক ইচ্ছার অকেশনাল তৃপ্তি-সুখও হারায়। দু-হাজারি হাতি চেপে চার আনার রাণ্ডীবাড়ি গমনের এইসব আনফোরসিন সুদূরপ্রসারী ফললাভ ঘটে।

ফলে বুলাকি ও জগমোহন, দুই পোটেন্ট মেল আরো দুর্বোধ্য ও ব্যাখ্যাঅসাধ্য এক মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়। রহীস্‌দের মাদী হাতিকে গর্ভাধান করাবার কাজে জগমোহন যখন মেতে থাকে, তখন বুলাকি স্বীয়

বুদ্ধি খাটিয়ে সেইসব অঞ্চলে স্বীয় প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করে আসতে থাকে। ফলে পরগৃহে জগমোহন ও বুলাকির আত্মজ ও আত্মজার সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু সাতচল্লিশ সালের পর রহীসদের অবস্থা পড়ে। হাতি পোষা কমে যায়, জগমোহন ও বুলাকি সহসা দেখে তারা বেকার। এ সময়েই চরণদাস, জগমোহন ও বুলাকিকে 'ওয়ানডারিং জু' করে বেনারস ছাড়া করে। তারা বেরিয়ে পড়ে বটে কিন্তু চরণদাসের দাস হিসেবেই। লিবারেটেড বুলাকি, লিবারেটেড জগমোহনের পিঠে চেপে বেনারস ত্যাগ করলে, সামান্য মানুষ ও যন্ত্র-জগতে বাতিল প্যাকিডার্মের সে যাত্রা এক কিংবদন্তীর বিস্তার লাভ করত। কার্যকালে তা হয় না। বুলাকি মাইনে পায় না। জগমোহন খাদ্য পায় না। কিছু না দিয়েই ওদের চিরদাস করে রেখে চরণদাস ভাগিয়ে দেয়। আষাঢ়ে পুরীধামে তিনদিন সার্ভিস দেবে এবং বাকি তিনশো বাষট্টি দিন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করবে,—চরণদাসের এ অ্যারেঞ্জমেণ্টে বুলাকি বা জগমোহন কোন অন্যায় দেখে না। ব্যবস্থাটি মেনে নেয় ও সরে পড়ে।

বছর-কে-বছর ওরা বহু জায়গা ঘুরেছে। ক্রমে জঙ্গল কাটা পড়ছে, পথ-ঘাট হচ্ছে, বাস-মোটর চলছে। প্যাকিডার্ম ও মানবটির বিচরণ-ক্ষেত্রও সীমিত হয়েছে। এখন বুলাকি ও জগমোহন, পালামৌ-চাইবাসা বেল্টটিই বেশি পছন্দ করে। অল্পাহারে জগমোহন প্রায় কঙ্কাল। প্রায়শ অনাহারে বুলাকি মানুষের কাংকেলার। কিন্তু জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘোরার ফলে জগমোহন, নিজের রুট ট্রেস করতে পেরেছে। তার মস্তিষ্কের কোনো একটা অংশ, জঙ্গলকে স্বগৃহ বলে চিনতে পারে এখন। বুনো হাতি দেখলে সে ভয় পায়। নগ্ন প্রায় আদিবাসীদের সে উপেক্ষা করে। তবু অরণ্যে সে স্বস্তি পায়। স্বস্তি পায় বুলাকিও। জঙ্গলে গ্রামগুলিতে গেলে জগমোহনও খেতে পায়, সেও ঘাটো, রাথুয়া শাক, ভেলগুড় ইত্যাদি খেয়ে বাঁচে। আদিবাসীদের কাছে বছরে-বছরে সে এটুকু স্বীকৃতি পেয়েছে।

জগমোহন আগে, রাঁচি বা খালারি বা হাটিয়ারে ছেলেপিলেকে 'জয় রাইড' করতে দিত। এখন ও আর শহর বা মানুষ চায় না।

বুলাকি বুঝতে পারে। দীর্ঘদিন অল্পাহার ও অনিয়মিত আহারে জগমোহন ভেঙে পড়ছে। নিজের দেহ টেনে চলতেও ওর কষ্ট হয়। বুলাকির খুবই ভয় হয়। জগমোহন মরে গেলে ও কি নিয়ে থাকবে? জলাশয় দেখলেই ও জগমোহনকে স্নান করায়। পয়সা পেলে ওকে লবণ, কলা ও ধান খাওয়ায়। কিন্তু তাতেও জগমোহনের চোখ থেকে সেই চাহনিটা যাচ্ছে না। চাহনিটা অত্যন্ত মানুষী, বেদনার্ত ও করুণাময়। চাহনি দিয়েই জগমোহন ওকে বলে, 'অব মুঝে ছুটি কর দে ভৈয়া।' বুলাকি চোখ ফিরিয়ে নেয়। জগমোহনই এই অসম্ভব আনরিয়াল জগতে তার একমাত্র রিয়ালিটি। আনরিয়াল জগৎ। যে জগতে বুলাকি মাইনে না পেয়েও চরণদাসের বান্দা হয়ে ঘুরে ঘুরে বৃদ্ধ ও শীর্ণ হয়। অনাহারে শীর্ণ হাতির সাহচর্যের চেয়ে বেশি কিছু পায় না। মানুষের, সামান্য মানুষের মত স্বাভাবিক জীবন। সে জগৎ আনরিয়াল বই কি! রিয়ালিটি একমাত্র জগমোহন এবং জগমোহনের রুগ্ন নিশ্বাস। জগমোহন মরে গেলে বুলাকি কি করবে?

হতদরিদ্র পালামৌ ও চাইবাসাতেও ধনী রহীস আছে। মহাজন-জোতদার-বেনে-শুঁড়ি। তাদের বলে দেখেছে বুলাকি। কিন্তু জগমোহনকে নিয়ে তাদের কাছে থাকার প্রস্তাবে কেউ রাজী হয় না। জগমোহন যা খাবে, সেই বাঁশ ও বটপাতায় ওদের কোনো খরচ নেই। তবু ওরা রাজী হয় না। আজ বটপাতা খাবে, কাল যদি পাকা ধান খায়? 'নহী জী, এায়সান্ বেইমানী উ জান্তা নহী'—বলেও লাভ হয় না।

কোনো গ্রামে দুদিন থাকলে, তিন দিনের দিন চলে যেতে হয়। 'উ থোড়া আরাম মাংতা' বলেও লাভ হয় না। শোনে ন কেউ। বুলাকি জানে, আর পথ চলতে না হলে জগমোহন বাঁচে। কিন্তু তবু পথ চলতে হয়। গ্রাম। প্রান্তর। ধুলো। জঙ্গল। গ্রাম। 'হাঁতি চঢ়েগা? দশ দশ পয়সা!' কথাগুলি প্রায়শ জলে যায়। কেননা দরিদ্র আদিবাসীদের, আধুনিক ও গতিমান ভারতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বাউণ্ডুলে প্যাকিডার্মের সংগ্রামের মতই ভয়ানক ও হিংস্র। প্রতি মুহূর্তে

তারা এক্স্টিংশনের থ্রেটের মধ্যে বাঁচছে। বাড়তি দশ পয়সা বা হাঁথি চড়ার বাসনা ওদের থাকে না। কেন থাকে না, তা একটি সংলাপ থেকে বোঝা যাবে। সংলাপটি বুলাকি এবং যে কোন আদিবাসীর। আদিবাসীটি গাঁওবুড়োও হতে পারে, পহান্‌ অথবা যে কোনজন। আদিবাসীদের পুরুষ ও রমণীদের নাম, সাধারণত জন্ম বার মতে। ফলে পুরুষদের নাম এতোয়া, সোমাই বা সোম্‌না বা সোম্‌রা, মংলা, বুধনা, বিরসা, শুকিয়া বা শুকচর বা শুকদেও, শনিচর ইত্যাদির মধ্যে লিমিটেড। মেয়েদের বেলা তা এতোয়ারী, স্নুমি বা সোমনী, মুংলী, বুধনি, বিশি, শুকনি বা শুকচরী, শনিচরী। জন্মবার মতে নাম রাখা সাধারণ নিয়ম।

সংলাপটি এইভাবে শুরু হয়। বৃদ্ধ, অশক্ত, ক্লান্ত এবং উপবাসশীর্ণ জগমোহন কুঁচকোনো চামড়া, ঘোলাটে ও পিচুটি-কাটা চোখ, কুঞ্চিত ও শুষ্ক পুরুষাঙ্গ, ধুলো মাখা দেহ নিয়ে গ্রামে ঢোকে। সতৃষ্ণ চোখে জলাশয় খোঁজে। তারপর, বাঁশপাতা বা লবণের মত জলও পাবে না জেনে কোনো গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। সময়টি দুপুর।

এ সময়ে এবল্‌বডিড্‌ সকল নর-নারী ও বালক বালিকা পাথরকাটাই ছাগলচরাই, জোতদারের খেতচষাই জঙ্গলে ঠিকা কাজ, কোন-না-কোন কাজে বাইরে। খুব পরিচিত দৃশ্য হল, অশক্ত বুড়ো-বুড়ি ও অতি ছোট ছেলেমেয়েরা ধুলোমাখা পাথরের মত আদিম চেহারা নিয়ে চীনা ঘাসের দানা বের করছে। চোরকাঁটার চেয়ে একটু বড় ঘাসের মাথায় দানা। তা খোসা খুলে বের করা ওদের কাজ। সারাদিন পরিশ্রমে এক খুঁচি দানা মেলে কি না মেলে। তারপর তা জলে সেদ্ধ করে ঘাটো। জলীয়। লবণ মিললে গ্রেট লাকসারি।

বৃদ্ধ, অশক্ত, ক্লান্ত, উপবাস-শীর্ণ বুলাকি হাতি থেকে নামে ও এদের কাছে আসে। এই পরিবেশে, এমন দুপুরে, ঠিক এমনি লোকজনের কাছে সে বহুবার এসেছে। আসার পর, ছোট ছেলেপিলে ও বুড়ো-বুড়িরা হাতি দেখে আকৃষ্ট হবে কিনা, তা নির্ভর করে অন্যান্য জিনিসের ওপর। বস্তুত, এ পৃথিবীতে সব কিছুই এ-ওর ওপর নির্ভরশীল।

নাংলা গরিব গ্রামে হাতি ঢুকল। সবাই ছুটে এসে ভিড় করার কথা।

আগে করত। তখন বুলাকিরও খুব আনন্দ হত এবং হাতির পিঠ থেকেই ফ্লারিশ দিয়ে নামত। গ্রামটি চেনাজানা হলে সে চেঁচিয়ে বলত, 'আ রে এতোয়া। তোহার লালোয়া গৈয়া জঙ্গলে ঘুসেছে রে ' যেহেতু বুলাকিও ছেঁড় ধুতি পরা পাগলাখাঁচা সেহেতু এদের মধ্যে সে সহজ বোধ করত। ট্যাকে পয়সা থাকলে এদের সঙ্গে মোয়া খেত। কিছুদিন থেকে যেত। বিনে পয়সায় জগমোহনের পিঠে সকলকে চড়াত।

এরকম রিসেপশন সে তখনি পেত যখন পরপর কবছর 'কালে বর্ষতু, পর্জন্যং পালামৌ শস্যশালিনী' হয়েছে। বৃষ্টি হলে শস্য হয়। শস্য যায় জোতদার বা মহাজনের গোলায়। আদিবাসী খেতমজুররা মজুরী পায় না, কিছু পান—মাড়োয়া-ভুট্টা পায়। খেতের ধুলো ও ঝাড়াই-খামারের ধুলো জলে কেচে-ধুয়ে তারা কিছু শস্য পায়। তা ছাড়া, বৃষ্টি হলে জঙ্গলে ফল-কন্দ হয়, চীনা ঘাসে ঝাড় বাঁধে, জলে মাছ আসে। বৃষ্টিপাতের পর কোন ফরেস্টবেল্ট গ্রামে এলে, বুলাকি গ্রামবাসীর চোখে সোৎসাহ অভ্যর্থনা পেয়েছে। এই ওঁরাও, কোল, হো উপজাতির মানুষরা বহু কাল ধরেই জানে, তাদের চাষে অধিকার, ভূমিতে বা শস্যে নয়। শ্রমে অধিকার, পারিশ্রমিকে নয়। ফলে বর্ষা হলেই তারা খুশি। অন্তত চীনা দানা মিলবে। তখন বুলাকিকে বলা যায়, 'হাঁ, অনেক দিন বাদে এলে বটে। তিন সন আস নাই। শুনেছি রাঁচি জিলায় ঘুরতেছিলে। হাঁথিটো শুকায়ে গেছে, তোমার চেহারাতেও ভাল দেখি না। বল, কি দেখে এলে বল। বস। জিরাও। টুক্‌চে মদ খাও। ভাল দিনে এসেছ। আজই শজারু মারলাম তিনটা। কুণ্ডীতে নাহাও হাঁথিকে। লবণ ভি দিব ওকে।'

এই সানন্দ স্বাগতম্ পরিবেশে সঞ্চারিত হয় ও জগমোহন সানন্দে কুণ্ডীতে নেমে যায়, বটপাতা খায়, শুঁড়ে জড়িয়ে বাচ্চাদের পিঠে বসায়।

এখন, বহুকাল, বছর পাঁচেক বুলাকি আর সে অভ্যর্থনা পায় না, বৃষ্টির পরেও নয়। নকশাল ও জে পি আন্দোলন। দুই কারণে পুলিস

এই সব দূর দুর্গমও চষেছে। দিকু মহাজন—জোতদারের অত্যাচার চরমে উঠেছে। খরার প্রকোপে আকালও হয়েছে। আদিবাসী-উন্নয়ন আপিস শহরে। শহর অনেক দূর। সেখানে নিয়ন আলো ও ঘূরন্ত টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত অরণ্য গ্রামবাসী যেতে পারে না। যাবার কোন কারণও খুঁজে পায় না তারা। কেন না, আদিবাসী যখন দপ্তরের আপিসে যায়, তখনো কেন যেন তার, এবং ওই চেয়ারের মধ্যেকার দূরত্ব যোজন-যোজন থেকে যায়। ঘোচে না। মাঝে-মধ্যে ওদের কেউ কেউ, কোনো গ্রামীণ প্রাইমারী মাস্টার, বা ফরেস্ট বিট অফিসার, বা অন্য কোন অনুরূপ প্রশাসনে-বিশ্বাসী লোকের উপদেশে রাঁচি গিয়েছে। বিনা টিকিটে ট্রেনে মাণ্ডার, সেখান থেকে রাঁচি, রাঁচি বহুৎ দূর অস্ত, অরণ্য গ্রাম থেকে সাঁইত্রিশ মাইল নয়, সাঁইত্রিশ লক্ষ মাইল। সেখানে আদিবাসী উন্নয়ন আপিস।

—কিছু জানি নাই, কিছু করি নাই, গ্রামে পুলিস। পুলিসের খাইখরচ জুগাতে পারি না।

—পুলিস, মোদের বিটিছেলাদের ইজ্জত কেড়ে লিল। বললে কেউ মানে না।

—মহাজন বেঠবেগারী লেয়। আইন মানে না।

—মহাজন করজ কাটে, মাড়োয়া দেয় না।

—জঙ্গলে গাই চরাই, জ্বালানি কুড়ান, মোদের হক।

—জঙ্গলের মৌয়া গাছে মোদের হক। ফরেস্ গার্ড শুনে না, খেদায়ে পয়সা লেয়!

—মহাজন জল দেয় না। পঞ্চায়েতী কুয়া।

নালিশ। নালিশ। নালিশ। জানাতে জানাতে ভীরু চোখে আপিসঘর ও অফিসারকে দেখা। অদৃশ্য দেওয়ালে মাথা ঠোকা। ফিরে আসা। আসার সময়ে বহু শিল্প-কারখানার কারণে ঘ্যাভেল্ রিশ্ রাঁচি শহরটি দেখা। আলো এবং যানবাহন এবং সিনেমাহাউস এবং মদের বার এবং সুসজ্জিত নরনারী। মাংসল কণ্ঠে 'মেহবুবা। মেহবুবা।' গানের অশ্লীল আক্রমণ। হাটিয়ারের পথে বীরসা মুণ্ডার ব্রোঞ্জের

মূর্তি। মূর্তিটি সুউচ্চ বেদিকা থেকে ভাবলেশহীন চোখে অরণ্যের অধিকারে বঞ্চিত, দিকু-পুলিস-মহাজন-সরকার ও জুডিশিয়ারি পিষ্ট তার সন্তানদের দেখে ও ব্রোঞ্জের বোবা ভাষায় বলে. 'ঘর ফিরি যা বাপ সকল। উলগুলান না হলে তুরাদের দুঃখ যাবেক নাই।'

নিঃশব্দ কণ্ঠটি হতাশ। জীবিত বীরসা জানত, উলগুলান হবে। মূর্তিটি জানে, উলগুলান হবে না।

আজ পাঁচ বছর ধরে রাঁচি-পালামৌ-সিংভূমের আদিম সন্তানদের জীবন জ্বলছে। আদিবাসীদের জীবনটা প্রাণদণ্ডের আসামী। মহাজন, জোতদার, প্রশাসন, জুডিশিয়ারি সে জীবনের চার হাত-পা, চারটে ঘোড়ায় বেঁধে, ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে চারদিকে ছুটিয়ে দিয়েছে। জীবনের ধড়টা শেকল বাঁধা হয়ে পড়ে আছে। চার হাত-পা ছেঁড়া, উৎপাটিত। ধড়টি ব্লিডিং টু স্লো ডেথ।

অথচ এ রকম হবার কথা ছিল না। কেননা ভারতের সংবিধানে লেখা আছে এই সকল উপজাতি ও আদিবাসীর সংখ্যা ত্রিশ মিলিয়ন। ...দে শুড বি মেড টু এন্‌জয় দি প্রিভিলেজেস্‌ অফ্‌ সিটিজেনশিপ অ্যান্‌ড শুড বি এব্‌ল টু টেক পার্ট ইন্‌ দি মেকিং অ্যান্‌ড স্ট্রেংদেনিং দি ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটুশন্‌স ইন দি কানট্রি। দে শুড রিয়ালাইজ দি ফুল্‌ অ্যাডভানটেজ অফ অ্যাডাল্‌ট ফ্রানচাইজ। দে শুড এন্‌জয় দি ফ্রুটস্‌ অফ লিবার্টি, ইকুয়ালিটি অ্যান্‌ড ফ্রেটারনিটি।

কার্যকালে দশকের পর দশক ধরে শব্দগুলি সংবিধানের শোভা হয়ে থাকে এবং আদিবাসীদের দুঃখ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে হতাশা নিয়ে ফিরে এসে আদিবাসীরা স্টেশনে উবু হয়ে বসে থাকে, ট্রেন ধরে, সাঁইত্রিশ লক্ষ মাইল হেঁটে গ্রামে ফেরে এবং অপরচিত, হিংস্র আলোকোজ্জ্বল নয়া ভারত থেকে স্বীয় পরিবেশের অপরিমেয় অন্ধকারে ফিরে স্বস্তি পায়।

সে কারণেই ওরা বাইরের সব কিছুকে অবিশ্বাস করে। কিন্তু আদিবাসী অরণ্যজীবনে বহিরাগতের এনক্রোচমেন্ট অনিবার্য। ওরা জানে, দিকু, মহাজন, জোতদার, নকসালী বা জে, পি, পন্থী-সন্ধানী

পুলিস ওদের জীবনে ঢুকবে, ঢুকে গেছে। ওরা বিশ্বাস করতে পারে তাকেই, যে দারিদ্র্যে ও শোষণে ওদের সমগোত্রীয়। খাদ্যে বঞ্চিত মৃতপ্রায় হাতি এবং মাইনে-বঞ্চিত অর্ধমৃত বুলাকিকে ওরা সে জন্যেই বিশ্বাস করেছে।

এখন করে না। শক্তি নেই। এমার্জেন্সীতে জোতদার ও পুলিস ওদের নিঃশেষ করে ছেড়েছে। চোখে এনে দিয়েছে মৃতের নিষ্প্রাণতা। শিশুরা, ওদের শিশুরা, অপুষ্টিতে—অনাহারে রোগে সবচেয়ে বুড়ো হয়ে গেছে। বুলাকির এখন, আদিবাসী শিশু দেখলে ভয় হয়।

আদিবাসী গ্রামে ঢুকলে এক ধরনের হিংস্রতার কারেণ্টও বুলাকিকে চমকে দেয়। বুলাকির কাছে তার হাতি জগমোহন সবচেয়ে মূল্যবান। চরণদাস জগমোহনের মালিকানা ছাড়েনি, এবং সবরকম দায়িত্বে লাথ মেরেছে, তার বিষয়েও তাই করেছে। প্যাকিডার্ম এমনিতেই বিলোপের পথে। আদিবাসীদের মতই। একদিন তারাও যূথে-যূথে আরণ্য ভারত চংক্রমণ করে ফিরত। আজ তারা লুপ্তপ্রায়। কিন্তু বুলাকির মনে হয়, আদিবাসীদের বক্তব্য হল, 'আমরাও মুছে যাচ্ছি ভারতের ম্যাপ থেকে। স্ব-পরিচয়ে বাঁচতে পারছি না। চা-বাগান বা কয়লা খনির মজুর হলে আমরা আদিবাসী থাকছি না। মজুর হয়ে যাচ্ছি। মানুষের বিলুপ্তির মুখে একটি হাতির বিলুপ্তি কতটা মূল্যবান মনে হতে পারে? ওর এবং আমাদের মৃত্যুই কাম্য। সকলের কাছে। জোতদার ও মহাজন, প্রচুর বাঁশপাতা, ধান, কলাগাছ দিয়ে ওকে বাঁচাতে পারে। আমাদের বাঁচাতে পারে ঋণ ও বেঠবেগারির থাবা তুলে নিয়ে। উপোস করিয়ে মারাই ক্ষমতাশালীর কাম্য। আমরা তা জানি। মেনে নিয়েছি। স্ব-অস্তিত্ব সঙ্কুচিত করতে করতে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছি। তুমি এবং তোমার ওই 'হাতি' নামের অ্যাপোলজি, জীবনের এই হিংস্র নিয়ম যত তাড়াতাড়ি বোঝ, ততই ভাল। তোমাদের পক্ষে।'

এই নির্মম ঔদাসীন্য ও হিংস্র বিদ্বেষ আজকাল বুলাকিকে ঘাবড়ে দেয়। চরণদাস তাকে ও জগমোহনকে রিজেক্ট করবে তা সে বোঝে। কিন্তু এরাও? সে তো কিছু চায় না? জল—বাঁশপাতা-বটপাতা। কিছুই

পয়সার জিনিস নয়। লবণ। হ্যাঁ, তৃণভোজী প্রাণীর লবণ দরকার। জগমোহন বন্যহাতি নয়, যে স্যাচারেল সল্ট লিক্ থেকে লবণ পাবে। জঙ্গলের সংরক্ষিত হাতি নয় যে ফরেস্ট ডিপার্ট তাকে লবণ দেবে। বুলাকি লবণ তো কিনে নিতেই চায়। অরণ্য আদিবাসীর জীবনে লবণ এত দামী জিনিস, যে বুলাকি তাদের কাছে তা চায় না। নিজে থেকে দিলে, ভাল। না দিলে? কোই হর্জা নেই, কিনে নেব। কিন্তু চোখে একটু স্বাগত জানাও। অমন করে রিজেক্ট কোর না। রিজেক্ট যদি তোমরাও করো, আমার বুকে বড় বাজে। বহুদিন ধরে আমি ও জগমোহন, সব মৌল অধিকার থেকে রিজেক্টেড। আমাদের পুরুষত্বও রিজেক্টেড। তাই তো আমি তোমাদের গ্রামে গ্রামেই ঘুরি। তোমাদের সঙ্গেই আমি সমান-সহজ-স্বচ্ছন্দ বোধ করি। স্ব-অস্তিত্বের জন্য সংকোচ হয় না। এখন রিজেক্ট করছ কেন? আমি খোঁচোড় নই। আমার হাতি তোমাদের ঘর ভাঙে না। আমি আদিবাসী নই, কিন্তু অবাঞ্ছিত দিকুও নই, আমি তোমাদের জীবনে মহাজন ও পুলিস ঢোকাই নি।

এই ব্যাক গ্রাউণ্ডে বুলাকি গ্রামে ঢোকে। এই সংলাপ থেকে তার অস্তিত্ব কত বিপন্ন, তা বোঝা যাবে।

সংলাপ। বুলাকি ও যে কোন গ্রামবাসী। সময় দুপুর। ধুলিধূসর মনোলিথগুলি চীনা ঘাসের দানা বাছছে। বুলাকি নামে, জগমোহন তার দিকে চায়। রিসেপ্শন ও সংলাপ কি হবে, জগমোহন তা জানে। ও জানে বুলাকি মুখে নুনঘষা খাবে এবং গভীর সমবেদনায় ও ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে মমতা ঢেলে বুলাকিকে স্নান করায়। তারপর সরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে নিয়ে আরো সরে যেতে পারলে ও স্বস্তি পেত। কিন্তু প্যাকিডার্ম পিঁপড়ে নয়। স্ব-অস্তিত্ব চোখের আড়াল করা তার সাধ্যি নয়। স্ব-অস্তিত্ব এখন খুব অবাঞ্ছিত এবং সকলের চোখে পীড়াদায়ক, তা জগমোহন শুঁড়ের রেডার চালিয়ে বাতাস থেকেই বুঝে গেছে। জগমোহন, স্থির হয়ে থাকে, যেন বিবর্ণ পাথরের হাতি, যাকে সবাই ভুলে গেছে।

বুলাকি এগিয়ে আসে। মনোলিথগুলি চীনার দানা বেছে চলে, মুখ তোলে না। অপুষ্ট, ক্রিমি, প্লীহা ও রক্তাল্পতা আক্রান্ত শিশুগুলি যার যা করার, তাই করে। এরা সকলেই উলঙ্গ। প্রায় সকলেরই পেট বা গলায় ঘুনসি। পাঁচ বছর থেকে আট বছর যাদের বয়স. তারা চীনার দানা বাছে। চার বছরের শিশুরা তিন ও দু বছরের শিশুদের আগলায়। এক বছর ও তার কম বয়সী শিশুরা মায়েদের শীর্ণ. কুঞ্চিত চামড়ায় এঁটুলির মত লেগে থাকে। কমন মিটিং পয়েন্ট, প্রতি শিশুরই চোখ নিরুত্তর ও মৃত। আট বছরের ওপর বয়েস যাদের তারা ফিট্ টু বি আর্নিং মেম্বর্স্। আজ দুপুর রোদে সবাই গেছে বনে। উদ্দেশ্য ছাগল বা গাই চরানো, জ্বালানি আনা, আলু জাতীয় কন্দ, বা সরস মূল সন্ধান। শেষোক্ত উদ্দেশ্য দুটি প্রায়শ ব্যর্থ হয়। তখন এরা তেঁতুল পাতা নিয়ে ফেরে। বুনো রামনাথের মতই এরা তেঁতুলপাতার মহান কার্যকারিতা জানে। ঘাটোতে লবণ ও তেঁতুলপাতা মিশালে ঘাটো স্বাদু হয়।

বুলাকি কর্মরত মনোলিথগুলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ছায়া মানুষগুলির ওপরে পড়ে। সময় যায়। ছায়া প্রলম্বিত হয়।

ছায়া প্রলম্বিত হবার সময়টি বড় করুণ। দুপুরও নয়, বিকেলও নয়, সূর্য পশ্চিমে সরতে যাচ্ছে। আরণ্য গ্রাম। সব নিঃশব্দ, ক্লান্ত রোদে পোড়া মাটি তাপ বিকীরণ করছে। এ সময়ে গাঁওবুড়ো বা পহানেরও চুপ করে থেকে বুলাকিকে উপেক্ষা করায় ক্লান্তি আসে। সে কথা বলে। বহিরাগতকে উপেক্ষা করবে, আদিবাসীর সাধ্য কি? হাতিটাও তো বাইরে থেকেই গ্রামে এল? বহিরাগতকে স্বীকার করে নেওয়াই ভারতের আদিবাসীর নিয়তি।

—কি চাও?

—তুমি পহান্?

—হোথা চল।

বৃদ্ধটি বুলাকিকে নিয়ে সরে আসে কপনি পরা শীর্ণ দেহে উপযুক্ত মর্যাদা আনতে চেষ্টা করে। চেষ্টাটি ভাবতভূমে একজনের বেলাই সত্যক

হয়েছিল। জাতির জনকের বেলা। ওঁরাও বা হো, বা মুণ্ডা গাঁওবুড়োর সাধ্য কি তাঁর মত এ কাজে সফল হয়? জনশ্রুতি, কৌতুকময়ী ও মাতৃকাভাবে পরিপূর্ণ শ্রীমতী নাইডু স্নেহভরে জাতির জনককে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ওঁর গরিবীয়ানা রেখে চলতে আমাদের কত খরচ হয় তা যদি উনি জানতেন।' উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকের নিরাপত্তা বাহিনীর খরচ-খরচার কথাই বলেছিলেন। আমাদের কথার বিশেষ অর্থ হল, শেষ অব্দি সব খরচ-খরচা, ট্যাকসোদান, জনতার ঘাড় ভেঙেই আদায় হয়।

বুলাকির সঙ্গে সংলাপরত গাঁওবুড়োর কপনি-সম্বল দারিদ্র্য রেখে চলতে স্বাধীন ভারত সরকারের খরচও কম হয় না। আইন প্রণয়ন করার জন্য সংসদীয় নির্বাচনের খরচ, জুডিশিয়রির খরচ, মহাজনকে ধনী ও জোতদারকে সর্বশক্তিমান রাখার খরচ, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর রাখার খরচ, এদেরকে ঠ্যাঙাতে পুলিস ও সেনাবাহিনী রাখার খরচ—এত খরচ করে তবে এদের যে গরিব, সেই গরিব রাখা চলে। এর চেয়ে এদের ধনী করে দিলে খরচ কম হত। কিন্তু, সে রকম ঐতিহ্যবিরোধী কাণ্ড ঐতিহ্যপ্রেমী ভারতের কাছে আশা করা যায় না। অধিকাংশ লোককে নিরন্ন ও নেংটে রাখতে গিয়েই শত-শত কোটি টাকা বিদেশে ঋণ।

—হোথা চল—বলে বুড়োটি বুলাকিকে নিয়ে সরে যায়। কারণটি মহৎ। মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানো। বাইরে থেকে মানুষ আদিবাসী জীবনে ঢুকলে, সাধারণত আদিবাসী মেয়েদের ইজ্জত হরণ করে ফুটে যায়। অভ্যাস। জন্মাধিকার গোছের। আদিবাসী মেয়েরা যখন আছে, এবং ওদের শরীরও আছে, তখন তা বহিরাগতের ভোগের জন্য।

বুলাকি বহুকাল আগেই পুরুষত্ব শরীরে অ্যাসার্ট করতে ভুলে গেছে এবং তা গাঁওবুড়ো জানে না।

বুলাকি ও বৃদ্ধ কোনো গাছের নিচে বসে। বুলাকি বিড়ি দেয়, বৃদ্ধটি নেয় না। নিজের ট্যাক থেকে চুটি পত্র নেয় ও চকমকি ঠুকে জ্বালায়।

—তুমি কে?

—বুলাকি।

হাঁথি নিয়ে হেথা কেন ?

- ওরে একটু পাতা-উতা খাওয়াব। লবণ কিনব একটু।

—নাই।

—কি ?

—লবণ।

–দোকানে নাই ?

-- গ্রামে দোকান নাই।

—হাটে ?

—মোদের বিকে না।

- কেন ?

—কোথা বন্দুক ছিনতাই, জোতদারের গোলায় আগুন, পুলিসরে বোম মারে কারা। জঙ্গলে লুকায় কারা। পুলিস মোদেক মন্দ করে। তাতেই লবণ বি চ না। শাস্তি দেয়।

—লবণ বেচে না ?

—দুই হাট, তিন হাট বিচে না, একবার বিচে। আবার জব্দ করে।

বিদ্রোহী পলাতকদের সহায়তা সন্দেহে লবণ না-বেচে জব্দ করবার মানে যে অত্যন্ত সফিস্টিকেড টরচার, তা বুঝে বুলাকি তাজ্জব হনে যায়।

— কে বেচে না ? পুলিস হুকুম দিয়াছে ?

—না। মহাজন, জোতদার, সবে মনে করে মোরা ওরাদের উচ্ছেদ করতে মদত দেই। তাতেই মোদের লবণ বিচে না।

—হাট ?

—হাট জোতদার কন্টোল করে।

—আমি ভাবলাম··· ।

—কি ?

—হেথা তিনদিন জিরাব।

—না।

—কেন ?

—কাঁড় মেরে মেরে ফেলাবে।

—কে ?

—মোদের ছেলেরা।

—কেন ?

—রিজার্ভ ফরেসে হাঁথিবে, হরিণকে লবণ মাটি দেয়। ওরা মাটি চুরি করে। তুমি বাহারের লোক। তোমা হতে কথা ছড়াবে, তাতে মেরে ফেলাবে।

—আমি কারে বলব না। বহুতদিন ঘুমতেছি। হাঁথিটো বুঢ়া। থকে গেল বহুত। একটু জিরাতাম।

—না।

—তুমি ত গাঁওবুড়ো।

—না। হাঁথি জল খাবে, তুমি নাহাবে। জল কোথা ? কুণ্ডীতে টুনি জল। হাঁথি শুষে লিবে।

—কোথা যাই ?

—ফরেসে যাও, কোমাণ্ডি যাও, সরভুজা যাও, হেথা হতে যাও।

অন্ধকার বনচ্ছায়ে শুষ্ক চোটি নদী তীরে চলে যায় বুলাকি। বহু খুঁজে জগমোহনের রেডার সদৃশ শুঁড় একটি কর্দমাক্ত জলের দহ আবিষ্কার করে ও সেখানে নেমে যায়। বুলাকি চাটাল পাথরে শুয়ে জগমোহনের ফোঁসফোঁস লম্বা নিশ্বাস শোনে, কতকাল এভাবে হাঁটবে তাই ভাবে, এবং এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নদীর শুকনো বুকে বাতাসের ঝাপটায় বালির কণা ছুটে বেড়ায়। বালির ঝাপটায় জগমোহনের চামড়া বেঁধে ও সে নড়েচড়ে। এভাবে শুয়ে থাকা খুবই অস্বস্তিজনক। তবু হস্টাইল আদিবাসী গ্রামের চেয়ে এখানে শুয়ে বুলাকি স্বস্তি পায়।

সকালে আবার শুরু ক্লান্ত, ক্লান্ত যাত্রা। জগমোহনের সঙ্গে থেকে, বুলাকি নিজেও আধা-জগমোহন হয়ে গেছে। জগমোহনকে উৎসাহ দেবার জন্যে সে কোন প্রচলিত মাহুতীয় শব্দ ব্যবহার করে না। জল-

ত্যাগী যে কারণে দলের এমব্লেম-ব্যাজ-পতাকা ব্যবহার করে না। সেই কারণেই।

জগমোহন ও সে, হাতি ও মাহুত নেই আর। ফোর্সড রেনিগেড তারা। জগমোহন আরণ্য হাতি নয়। তার আদিম চরিত্র খোয়া গেছে চরণদাসের বান্দা হবার পর। আরণ্য হাতি হলে সে আরণ্য প্যাকিডার্মের নিয়মে পুত্র-স্বামী-পিতা হত। যূথপতি হয়ে ফিরত। সম্মানের সঙ্গে মরত এন্তেকাল ফরমাইলে। সে প্রপার আরণ্য হাতি নয়।

সে প্রপার মানুষে-পোষা হাতি নয়। তেমন হাতিরা ব্যক্তিগত পিলখানায় বা সার্কাসের তাঁবুতে বা চিড়িয়াখানার বেষ্টনীতে খেয়েদেয়ে, সন্তুষ্ট চেহারায় বিরাজ করে। মানুষের সঙ্গে তার কামারাদোরি হয়।

জগমোহন হাতি হিসেবে ইম্প্রপার। বুলাকি ছাড়া অন্য কোন মানুষকে সে বিশ্বাস করে না। বুনো হাতি দেখলে সভয়ে পালায়। গেঁয়ো কুকুর ডাকলেও সে ভয় পায়। সেই জন্যেই জোতদার একে খরিদ করেনি। হাতি স্টেটাস সিম্বল নিশ্চয়। বিয়ে-সাদীতে হাতি চড়া যায়। কিন্তু হাতি মানে প্রয়োজনও। প্রজা বা খাতক-এর ঘর ও ধানের টাল মাড়াতে-গুঁড়োতে, গ্রাম তছনছ করতে হাতি বড় কাজে লাগে। জগমোহনকে দেখেই জোতদার-জাতীয় প্রস্পেকটিভ বায়ার বুঝে ফেলে জগমোহনকে দিয়ে ইত্যকার প্রয়োজনীয় কাজগুলি হবার নয়। চরণদাস কর্তৃক মেলনেস ডিনায়েড হবার ফলে জগমোহনের এই না-মরদ হাল। নিরীহ খাতকের ঘর ও টাল গুঁড়োতে-মাড়াতে পৌরুষ দরকার। এ পৃথিবীতে। কেননা ডিফেনসলেসকে অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট করার কাজেই সকল সুপিরিয়র শক্তি পৌরুষের চূড়ান্ত পরিচয় ব্যয় করে থাকে। উন্নত দেশে মানুষের পৌরুষের সহায়ক উন্নত অস্ত্র। প্রাক্-কলোনিয়াল ভারতভূমে গ্রামবাসীকে ত্রাসাতে হাতি খুবই সহায়ক। জগমোহন হাতি হিসেবে ফেলিওর।

মেলনেসে ডিনায়েড বুলাকিও মাহুত হিসেবে ফেলিওর। চিড়িয়াখানা বা সার্কাস বা সংরক্ষিত জঙ্গল-ঘোরানো পোষা হাতির মাহুত

নয় সে। ব্যক্তি মালিকের মাহুত, হয়েও নয়। সে সব মাহুতের জীবনে থিতু থাকে। বাঁধা মাইনে ও ফুলফিল্ড মেলনেসের ফলে চেহারায় আত্মবিশ্বাস থাকে। সে সকল মাহুত জানে, ম্যানগ্রাকে তারা কোথায় বিলং করে। বুলাকিকে দেখেই বোঝা যায় ও ভিতুর ডিম, স্বঅস্তিত্বের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এবং ও কোথাও বিলং করে না।

কোন্ বিশ্বাসে, বিকল এগিয়ে চলাব সময়ে বুলাকি মাহুতীর বোল্ বলবে? ও মাহুত হয়েও মাহুত নয়। জগমোহন হাতি হয়েও হাতি নয়। অতএব বুলাকি কয়েকটি অদ্ভুত শব্দ বলে যায়—কোমাণ্ডি কোমাণ্ডি জগমোহন। হেহেগড়া মেরে লাল। জুজুভাতু জুজু ভাতু মেরে ইয়ার!

ম্যানগ্রাফ থেকে বুলাকি কতখানি বেরিয়ে গেছে, উল্লেখিত শব্দাবলীই তার প্রমাণ। কোমাণ্ডি-ভুরকুণ্ডা—হেহেগড়া-জুজুভাতু কয়েকটি জায়গার নাম। এইসব বিকট নামে সে হাতিকে চালায়। একই সঙ্গে হাতিকে সন্তান-বাচক 'লাল' ও 'দুলার' বলে। আবার বন্ধু-বাচক 'ইয়ার'ও বলে। লাল ও দুলার বলাটা ওর পাগলাখ্যাচামির পরিচয়। কেন না ও এবং জগমোহন একই বয়সী। সমবয়সী কোন বুড়োকে ও মদের ঠেল-এ বসে ইয়ার্কি মেরে চিবুক ধরে 'দুলার' ও 'লাল' বললে তা বেমানান হত না। মৌয়ার নেশায় মানুষ বোতলটিকেও 'পিয়ারী' বলে চুমু খায়। নির্জন পথে, মৃতপ্রায় সমবয়সী হাতিকে চালাবার জন্য 'দুলার' ও 'লাল' বলা খুবই দ্যোতক। সম্বোধনটি শোনে শুধু আকাশ, গাছ, পথ। জগমোহন হাপরের মত ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পথ চলে।

বড়হাই রেল স্টেশন। কুলী বস্তি। বটগাছ। থোড়া পানি মিলে ভাইয়া? থোড়া পানি? হাঁথিকে লিয়ে?

—ইঞ্জিন কা পানি লো।

—গরম হ্যায়?

—নেহি। লেকিন—

মেটালিক স্বাদের বিস্বাদ জল। চৌবাচ্চায়। স্টেশনে আগুন লাগলে নিভানোর জন্য। জগমোহন জল খায়।

—হিঁয়া কি ধার কুণ্ডী ছে ?

—কাঁহা ? পানি মিলত্ নই।

—কি ধার ভি নেহি ?

—পাত্রা মেঁ দেখো।

— য়ে পিপল পেঁড কিস্ কা ?

—টিশন কা জমি মেঁ।

জগমোহনের লাঞ্চটি বচহাইতে বটপাতায় হয়। চার মাইল দূরে পাত্রার নালাতে স্নান। ডিনারের জন্যে বচহাই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনের সিটিতে জগমোহনের আতঙ্ক। আবার পথ চলা। টাহাড়া-নালিগাতু-জোঝোরা-শাগু-মোচরা— জায়গার পর জায়গা।

এইভাবে পথ চলতে চলতেই একদিন হঠাৎ আর কোনো পথ থাকবে না সব পথ ফুরিয়ে যাবে কেন না জগমোহন মরে যাবে। তা বুলাকি জানে। সেই ভয় ওকে ইদানীং বিবশ করে রাখে। সে মৃত্যুও খুব নিঃশব্দ হবে। প্রায় মুছে যাওয়া তুটি বিন্দুর একটির ফাইনাল বিলুপ্তি। ভয়। তারপর ? শূন্যতা, শূন্যতা, শূন্যতা। চলো জগমোহন, মেরে লাল, মেরে ইয়ার। হেহেগড়া হেহেগড়া জগমোহন—কোমাণ্ডি কোমাণ্ডি।

বুলাকি জানতেও পারে না। জগমোহন সহসা কি কি ঘটনাবলী ট্রিগার করবে। এবং বুরুডিহা নামক গ্রামের সন্নিকটে জঙ্গলে ঢোকে সাত্তাত্তরের অক্টোবরে।

তুই

বুরুডিহা গ্রামের ম্যানগ্রাফ ও টোপোগ্রাফি এ কাহিনীতে খুব প্রয়োজনীয়।

গ্রামটির নামেই প্রমাণ হচ্ছে, নামটি আদিবাসী। একদা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামটির ম্যানগ্রাফে আবশ্যিক পরিবর্তন বহুকাল আগে ঘটে গেছে। গ্রামটিতে বসবাসী আদিবাসীদের জমিতে দখল প্রায় নিঃস্ব।

গ্রামে সাতশো লোক বাস করে। একশো চারটি পরিবার। অধিকাংশ পরিবার গঞ্জু জাতির লোকের। গ্রামটি আদতে গঞ্জুদের ছিল। তারপর পারশনাথ ও বারাণসীদাস দুই লালা এসে জোটে। ক্রমে আরো কিছু লালা এসে বসবাস করে। কিছু রবিদাস। ধোপা দু ঘর ও হাজাম। লালারা স্বভাবতই গঞ্জুদের জমিজমা হাত করে এবং গ্রামটিকে তাদের ওপর নির্ভরশীল করে ছাড়ে। গ্রামে তাদের মহাজনী কারবার এবং সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত তাড়িখানাও তাদের। দুটি দোকান। কাপড় ও বেনেতি জিনিসের।

দোকান চলার মত সঙ্গতিপূর্ণ গ্রাম বুরুডিহা নয়। কিন্তু বুরুডিহা হল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হাটের জায়গা। এখানে সোম ও শুক্র-বারে এক বিরাট হাট বসে। লঙ্কা, পেঁয়াজ, ধনে বিক্রি হয়। সময়ের শাক-সবজি ও ফল। বুরুডিহার অনতিদূরে, মাত্র এক মাইল দূরে ভালাতোড়। গঞ্জ জায়গা। সেখানে আছে বৈষ্ণব-মণ্ডলী পরিচালিত মঠ ও হাসপাতাল। আদিবাসী উন্নয়ন শাখা অফিস এবং পুলিস স্টেশন। বুরুডিহা, ভালাতোড় এসব জায়গা রোডওয়েতে কানেক্টেড, রেলওয়েতে নয়।

এই লালারা মিশ্রকে এনে জমি দিয়ে বসত করায়। কালে হনুমান মিশ্র আশপাশে জোতজমা ও ফলবাগিচা খরিদ করে প্রভূত ধনী হয়। বস্তুত এ জংলী জায়গায় হনুমান মিশ্রের মত কাস্ট বামুনের আগমন ও বসতি স্থাপন ব্যাপারটি কতখানি বহুমুখী, তা কলকাতার লোকজন কিছুতে বুঝবেন না। শহর কলকাতায় দীপক ও আয়েশায় প্রেম হয় বলে, রুইদাস গিয়ে চাটুজ্জে বাড়ি ভাত রাঁধে বলে, শহুরে আঁতেল ভাবেন, ভারত থেকে জাতপাঁতের সমস্যা ঘুচে গেছে। শহুরে বা শিক্ষিত বিপ্লবীও এ হেন ভুল করেন। তাঁদের সততায় কোন সন্দেহ নেই, নিহত-হওনই সততার ডকুমেন্ট! কিন্তু তাঁরাও যখন গাঁ-গেরামে গেছেন, জাত-পাঁত, ছোঁয়াছুঁয়ি ও ধর্মের ত্রয়ী প্রতিরোধ তুচ্ছ করে পরের বাস-স্টপ থেকে কাজ করেছেন।

সেটি ভুল। এ ভারতভূমে স্যাড়া-স্যাংটোদের লড়াকু করতে হলে,

কুরুক্ষেত্রে নামার আগে জেনে নিতে হবে, প্রয়োজনে গঞ্জু ও দোসাদরা গোলবদন সাহুকে ক্ষেত্রপাল দেবতা ও সূর্যদেবের উদ্দেশে উচ্ছুগ্‌গু করে কেনান্‌দ্রাপাহাড় থেকে নিচে আছড়ে ফেলে মারতে পারে। কিন্তু হনুমান মিশ্রের মন্দির-সংলগ্ন কুয়ো থেকে জল নিতে তাদের হাত উঠবে না।

তাঁদের জানতে হবে, অর্থনীতিক শোষণ যেমন একটা টার্গেট, তেমনি আর-আর টার্গেট হল জাত-পাঁত ছুঁয়াছুত ও ধর্ম। এ ত্রিমূর্তি, ত্রিমূর্তি ভবনের মতই ভারতীয়ের হৃদয়ে পাকা হয়ে আছে। ভবন থাকলেই মন তাতে চেনা মূর্তি বসাতে চাইবে।

যাঁরা তা বিশ্বাস করেন না তাঁদের পক্ষে বুরুডিহা দর্শন আবশ্যিক। বুরুডিহা এক আণবিক ভারত-কসমস। রবিদাস-ধোবি-গঞ্জু-দোসাদ এরা কে কার চেয়ে ছোট বা বড়, তা এরা ঠিক করেনি। একদা বামুনরাই সৎকর্মটি করে থাকবে। নিশ্চয় তারা সকল ব্রাত্য জাতিকে ডিভাইড করে রুল করতে চেয়েছিল। তার জন্যই বুরুডিহার এই জাতিগুলির রক্তে রক্তে বিশ্বাসটি বসে গেছে।

বিশ্বাসগুলি এরকম—এ-ওর সঙ্গে ভাত খেতে পারে, জল খেতে পারে না। শুঁড়িখানায় বসে মাল খেতে খেতে এ,ওর কাছ থেকে ঝাল চানা খেতে পারে, তেলেভাজা খেতে পারে না। সে তার সঙ্গে চা খেতে পারে, মুড়ি খেতে পারে না।

মানুষগুলি অত্যন্ত সরল, ভিতু, ব্রহ্মণ্যতা ও উচ্চবর্ণের সর্বময়তায় বিশ্বাসী। ফলে ছুঁয়াছুতের গণ্ডগোল করে ফেললে জাত গেল পাঁত গেল বলে তারা হনুমান মিশ্রজীর কাছেই ছোটে।

হনুমান মিশ্র মহাপাপটির কথা শুনে কানে আঙুল দেন, কাঁদেন। বুক চাপড়ান, ঘন ঘন মন্দিরের দিকে চান। তারপর বিধান দেন। পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, মাথা মুড়োনো, জাতভাইদের অন্নদান। ফলে আবার ধার নিতে হয়। ধর্মীয় বিচ্যুতির দরুন প্রায়শ্চিত্ত কাজে যে টাকা লাগে, তা হনুমান নিজেই ধার দেন।

ওঁরাও, মুণ্ডা বা হো, এরা হনুমান মিশ্রের চক্ষুশূল! যাদের সৃজন-কার্যে ব্রহ্মার কোন হাত ছিল না, কোথাকার কোন সিংবোঙা বা

হড়ামদেও সৃজন করে ছিলেন, তাদের অস্তিত্ব তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন। ওরা এত পতিত, যে জাত-পাঁত বা ছুঁয়াছুত বোঝে না। আগেই বলেছি, এই হনুমান মিশ্রের বুরুডিহা অবস্থান ব্যাপারটি গভীর তাৎপর্যময়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বুরুডিহাতে এক অশান্তির ঘটনা ঘটে। বুরুডিহাতে জঙ্গলের উপকণ্ঠে ছিল কয়েক ঘর ওঁরাও। এতোয়া ওঁরাওয়ের বউ বিখনি লালাবাবুদের বাড়ি মজুরনী ছিল। কুয়ো থেকে জল তুলে অন্দরে মেয়েদের স্নানের চৌবাচ্চা ভরত, খামার সাফ করত, রান্নার কাঠ চালা করত। এক বেলা জলখাই ও মাসে চার টাকা মাইনে। এর চেয়ে বেশি টাকা তখন বুরুডিহার কেউ দিত না। আজও ও অঞ্চলে বাঁধা মাইনের আদিবাসী মাসে পনেরো-বিশ টাকা ও একবেলা জলখাই পেলে বর্তে যায়। জলখাই বলতে মাড়োয়ার ছাতু বা ঘাটো। তাতেও বিখনির অসংগত রকম উগ্র দেহ ছিল। এতোয়া সে বিষয়ে খুবই সজাগ ছিল, এবং বিখনিকে বিয়ে সংক্রান্ত ভোজ দিতে লালাদের কাছেই ঋণগ্রস্ত না হলে সে বিখনিকে কাজ করতে দিত না।

মাসে মাসে সে হিসেব করত, বিখনির মাইনে লালারা কেটে নিলে মূল ঋণের কত শোধ হয়। স্বভাবতই আসলে ও সুদে হিসেবটি জটিল হয়ে পড়ে এবং জটিল হিসেব কোনো আদিবাসীদের বোধাতীত। এতোয়ার মনে হতে থাকে, সে দিয়ে চলেছে কিন্তু ধার শোধ হচ্ছে না। ফলে তার মনে লালাদের ওপর বিদ্বেষ জমতে থাকে।

একদিন সে গিয়ে লালাদের বড় ছেলেকে চেপে ধরে, কত টাকা গেল, কত বাকি আছে, বুঝিয়ে বল্। বউটা আর কতদিন খাটলে ধার শোধ হবে?

উত্তরটি তার মনোমত হয় না। সে বলে, তু নিশ্চয় ঝুটা হিসাব দেখাইচিস। ই হয় না।

গাল দিয়ে সে উঠে আসে এবং মনোদুঃখ ভুলতে হাটে লঙ্কা বেচতে গিয়ে মৌয়া খেতে বসে। তখন মৌয়ামত্ত আরেক ওঁরাও তাকে বুঝিয়ে বলে, তুর ধার শোধ হবার লয়। ই জন্মে লয়।

কেনে?

দিকু হতে ওঁরাও ধার লিলে শোধ যয় না। কারো যায় নাই। আর·····

আর কি?

শনিচরীরে শুধা।

শনিচরী একপাশে বসে মৌয়া খাচ্ছিল ও জিভে ভাজা লঙ্কা ঠেকাচ্ছিল। সে মদটুকু খেয়ে ঠোঁট মোছে ও যা বলে, তার সারাংশ এই: বিখনির দেহে যৌবন থাকতে ও ধার শোধ হবার নয়। শনিচরীর বর লালাদের কাছে ধার নেয় বিশ টাকা। মাস দু টাকা মাইনে ও জলখাইতে বর্তমান লালার পিতার কাছে যুবতী শনিচরী নিযুক্ত হয়। সে পঁচিশ বছর আগে। দশ বছর কাজ করেও সে ধার শোধ হয়নি। শনিচরীর বর উক্ত ঋণের দু বছরের মধ্যে টেঁসে যায়। ফলে শনিচরীকে বাঁচাতে কেউ থাকে না। তার যৌবনও বহুকাল থাকে। যত দিন থাকে, ততদিন শনিচরী বৃদ্ধ লালাকে শরীর ও লালা পরিবারকে শ্রম দিয়ে ধার শোধ করার চেষ্টা করে। তার যৌবন ও বৃদ্ধ লালার পরমায়ু একদিন শেষ হয়েছে। ধার আজও শোধ হয়নি। শনিচরী আর খাটতে যায় না, এবং সে ডিক্লেয়ার করে রেখেছে, আর খাটব নাই। জেহেলে দিবি ত দে।

এরপর শনিচরী মৌয়া-জনিত আবেগাকুল হৃদয়ে এতোয়াকে বলে, বিখনিকে লিয়ে ভাগি যা। লালার ছোট ছেলেটা শয়তান। উ বিখনিরে ছাড়বেক নাই।

এতোয়া জানতে চায়, বিখনি নিজে কি হারামি করেছে?

শনিচরী সংসারী দার্শনিকতায় বলে, আজ করে নাই, কাল করবে।

কথাগুলির ফল ভাল হয় না। কেননা মদ খেয়ে এতোয়া লালার ছোট ছেলেকে কেটে ফেলে এবং ভালাতোড়ে গিয়ে থানার দারোগাকে বলে বুরুডিহার গোবিন লালাকে কেটে ফেললাম। কি করবি কর্।

উক্ত হত্যাকাণ্ডে আসামী স্বয়ং স্বীকার গেলেও দারোগাকে সুরতহালে আসতে হয়। এসে তিন দিন বুরুডিহা থাকতে হয়।

দারোগার পদবী পাঁড়ে। তিনি সদাচারী মৈথিলী বামুন এবং বুরুডিহাতে তিন দিন অবস্থানকালে তিনি অন্নজল খান না লালাদের ঘরে। পুত্রশোকের ওপর ব্রাহ্মণের অনাহারী থাকার শোকে লালা-জননীর বুক ফেটে যায়। ফল সুদূরপ্রসারী হয়। এতোয়া পরিণামে পুলিপোলাও হয় এবং জেলেই মরে যায়। বিখনিকে মৃত গোবিন্দের দাদা জবরদখল করে। লালরা ভালাতোড় বৈষ্ণব সমাজগুরুর সহায়তায় হনুমান প্রসাদ মিশ্রকে এনে গ্রামে বসত করায়। আদিবাসী ও অন্ত্যজ বেল্ট-গ্রামসমূহের শান্তিরক্ষার কাজে কাস্ট হিন্দু নিয়োগ করা প্রশাসনের ইচ্ছে নয়। তাতে আদিবাসীরা ও অন্ত্যজরা সুবিচার পায় না। কিন্তু কাযকালে উক্ত ডেফিনিশনের গ্রাম সকলের রক্ষক থানায় পাণ্ডে-ঠাকুর-মিশিররা অ্যাপয়েন্টড হন, এবং বুরুডিহার আশপাশের যে কোন গ্রামে সুরতহালে বা তদন্তে এলে তাঁরা হনুমান মিশ্রের বাড়িতে বৈষ্ণব ভোজন করে থাকেন।

গুটি দশেক গঞ্জু পরিবারের জমি অধিকার করে লালারা মিশ্রজীকে দেয়। হনুমান মিশ্র লালাদের ভাতে হাত না দিয়েই স্বীয় বৈভব বাড়াতে থাকেন। অঞ্চলটি চোটি. তিরুহি. কুইলা ও ঝিঠ্রি নদী চতুষ্টয় বেষ্টিত, বনসমৃদ্ধ, মাটি সরস। ভালাহাতুর জমিদার বংশের অধিকারভুক্ত গ্রামগুলিতে জমিদারদের ফলবাগিচা বিস্তর। পেয়ারা, আতা, আম, লিচু, পেঁপে ও জাম গাছ প্রচুর। কুঞ্জরা বা হোলসেল খদ্দেররা বাগিচার ফলের প্রসপেক্ট আঁচ করে ফরোআর্ড ট্রেডিং করে, বাগিচা মালিককে আগাম থোক টাকা দিয়ে ভবিষ্যতে যে ফল ফলবে, তা কিনে নেয়।

হনুমান মিশ্র লালাদের ভাতে হাতটি দেন না। বাগিচার পর বাগিচা খরিদ করেন, প্রতি বাগানে মিশ্র বংশের কোন বেকার পুরুষকে বসান। কুঞ্জরাদের সঙ্গে কথা হয় প্রতি বাগিচা থেকে গৃহ-সদস্যদের খাবার ফল দিতে হবে। এইভাবে ফল-বাগিচা কেনা হয়। বস্তুত মিশ্রজী বহুদূর ছাড়িয়ে জগৎবেড় ফেলেন। অঞ্চলটি এমন অদ্ভুত, যে এখানকার প্রাকৃতিক ভূগোলও বদখেয়ালী। বুরুডিহা, পালানি, টাহাড়

ইত্যাদি জায়গায় বাস দাঁড়ালে ফলে ফলাক্কার। দু মাইল দূরে বাস স্টেশনে খাদ্য বলতে ভিজে চানা ও পেঁয়াজ। মিশ্রজীর লোকরা অন্যান্য বাস স্টেশনের ফল-বিক্রেতাদের মারদাঙ্গা করে হটিয়ে দিয়ে নিজেরা বিক্রি করতে থাকে। ভালাতোড় থানাতে তিনি এত ফল সম্বৎসর পাঠান যে ফলাপ্লুত থানায় অ্যান্টি-মিশ্রজী কোনো রিপোর্ট আমল পায় না। তাঁর লোকরা মেয়েমানুষ, বুড়ো-বুড়ি বালক নির্বিশেষে ঠ্যাঙায় ও একটি রেইন অফ টেবর স্থাপনে সক্ষম হয়। ব্রাহ্মন লোক দেওতা লোক, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো নালিশই সোচ্চার হতে পায় না।

আশপাশে কোন ল্যাণ্ড ডিসপুটেড সে খবর তিনি ভালাতোড়ের থানা ও পাটুলিহার আদালত থেকে পেয়ে যান এবং জোতজমা খরিদ করতে থাকেন। মিশ্র পরিবারে পরিবার-পরিকল্পনা নেই। ফলে উক্ত জোতজমা সমূহে মিশ্ররা ঢুকে পড়ে। এতে স্থানীয় কংগ্রেসী পঞ্চায়েত-প্রধান, ব্রিজভূষণ ছত্রীর টনক নড়ে। সে নিজেই এসে মিশ্রজীর সঙ্গে দেখা করে এবং বলে, যো আপ কিয়া, এহি হ্যায় দেশমাতা কি সেওয়া।

কৈসে ?

ব্রিজভূষণ ছত্রী প্রবল প্রতাপী ও দুঁদে লোক। তার শাসনে পঞ্চায়েতী কুয়ো ও প্রাইমারি স্কুল বর্ণহিন্দুর অধিকারে। সে বলে, ব্রাহ্মণ সামনে থাকলে হিন্দুরা বুকে বল পায়। মিশ্রজীর দূরদর্শিতার ফলে অঞ্চলটিতে সর্বত্র ব্রাহ্মণ নিউক্লিয়াস গড়ে উঠছে। ছত্রী, ভুঁইহার, লালা এদের কাছে ব্রাহ্মণ সব চেয়ে বড় দেওতা। অঞ্চলটিতে দোসাদ-রবিদাস-গঞ্জু-আদিবাসী ইত্যাদির প্রাধান্য বড় বেশি। এদের দাবিয়ে রাখা খুবই দরকার।

মিশ্রজী সুপরিসর হেসে বলেন, কিন্তু এদের দেখ্ভাল্ করার জন্যে সরকার খুব মদত ভি দিচ্ছে, ঔর ইন্দিরাজী ভি তাই চান।

দেওতা, তা চাইলে পরে এদের নাসবন্দী করাচ্ছে কেন ? এদের সংখ্যা যাতে না বাড়ে সে জন্যে। সরকারী দপ্তর ? আমলা ? আইন যা বলুক, আদালত পঞ্চায়েতী আপিস, বি ডি আপিস, থানা, সবাই আমাদের মদত দেয়। আমি একলা লড়ছিলাম, এখন দেওতাদের

সামনে পেয়ে গেলাম। কি করে এদের জব্দ রাখা যায়, দেখিয়ে দেব।

আপনি যা বলছেন, এ ঠিক নয় ছত্রীজী। আপনি আমি শিক্ষিত লোক। আমরা দোনো ভারতীয় য়ে সমঝনা চাহিয়ে। আপনি জানেন, অছুত ঔর আদিবাসীদের জন্যে সরকার কত আইন করেছে?

আইনে কি হয় দেওতো আইন ত কাগজ পর সোয়াহীসে লিখাই। আইনকে বলবৎ করে মানুষ। শিক্ষিত মানুষ। আমি কি বলেছি? ওদের জানে মারব? নহী নহী। কিন্তু জুতির নিচে আপনি যে মাটি মাখেন, উস্‌সে তো ভাল মেঁ তিলক পরেন না? য়ে ভি ঠিক নহী। জুতির নিচের মাটিকে একথা বলা ঠিক নয়, যে তুমি তিলক মাটি হতে পার।

য়ে ঠিক বাত্‌ হ্যায়।

আমার পঞ্চায়েতী মেঁ এক হি নীতি। সরকার ইস্কুল ভি করেছে। কিন্তু আমি বলে দিই, লিখাই-পড়াই করে তোমাদের কোন লাভ নেই। কে মরা জানোয়ারের চামড়া ছুলবে, কে জুতো বানাবে, কে কুলি-কাম করবে, সব ভগবান ঠিক করে তবে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। পড়াই করে তোমরা করবে কি? তোমরা পড়তে এলে উঁচু জাতের মাস্টার পড়াবে না, ছাত্রও পড়বে না। দেওতা! এসব জায়গা জংলা জায়গা। শহরের বাতাস এখানে আসে না। রাজার মত থেকে যান, কিছু চিন্তা করবেন না।

কথাগুলি বলার সময়ে ব্রিজভূষণের চোখ ও মুখ পবিত্র দীপ্তিতে জ্বলে। হনুমান মিশ্রের বুঝতে বাকি থাকে না ব্রিজভূষণ জনৈক ফ্যানাটিক। খুবই আনন্দ হয় তাঁর। ফ্যানাটিক ও ফ্যানাটিসিজম বড় ভাল জিনিস। তা যদি অছুত-আদিবাসীকে দাবিয়ে রাখা বিষয়ক হয়, আরো ভাল। কেননা, তিনি ফলবাগিচা, জোতজমা, এবং আর যে যে পার্থিব সম্পত্তি বাড়াতে চান, তাতে খাটাখাটনির জন্য উক্ত হতভাগাদের দরকার। তারা যদি লিখি-পড়ি হয়, স্ব-অধিকার বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়, তাহলে হাওয়া বিগড়ে যায়। বস্তুত পাটনা রাঁচি-

গয়া-আরা-ছাপরায় ছোট জাতের রিকশাওলা যেভাবে বলে, ঠিকসে বাত বলিয়ে—তাতে বামুনের রক্তে আগুন জ্বলে।

হনুমান মিশ্র বোঝেন, ব্রিজভূষণ ছত্রী তাঁকে যথাসাধ্য মদত দেবেন। তিনি খুব আনন্দ পান ও বলেন, আজকাল আপনার মত মানুষ হয় বলে জানতাম না।

ব্রিজভূষণ ছত্রীও মহোৎসাহে ফিরে যায় নিজের গ্রামে। এরপর অঞ্চলটিতে কয়েকটি সিংগুলারলি সিগনিফিকেন্ট ঘটনা ঘটে।

খুবই আশ্চর্য কথা, বুলাকি বা জগমোহন কিছুই না জেনেও প্রতিটি সিগনিফিকেন্ট ঘটনার সময়ে কোন না কোন ভাবে ঘটনাগুলির বলয়ের মধ্যে থাকে।

স্বগ্রামে ফিরে যাবার পর ব্রিজভূষণ ছত্রী নিজের ছেলেকে বিয়ে দেয় এবং ছেলে ও বউকে হাতির পিঠে বসিয়ে শোভাযাত্রা করে হনুমান মিশ্রের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেওতার আশীর্বাদ নেবে বলে স্থির করে। প্রস্তাবটি সকলেরি মনোমত হয় এবং এই সময়ে নিয়তি দারুণ যোগাযোগের খেল দেখায়। গ্রামে যেহেতু সকলেই ক্ষেতে গিয়ে মল-ত্যাগ করে ও 'ঘর কা নজদিগ সনডাশ বনাতা নই'—সেহেতু শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত ব্রিজভূষণও যবক্ষেত্র উর্বর করতে যায়—হিউম্যান ওয়েস্ট ভেরি গুড ফার্টিলাইজার—এবং সহসা দেখে যবক্ষেতের মাঝের পথ ধরে এক নো-গুড হাতি এবং নো-গুড মাহুত আসছে। ব্রিজভূষণের ব্যক্তিত্ব প্রবল। তাই মলত্যাগ করতে করতেই সে প্রশ্নগুলি করে নেয়।

—কিসকা হাঁথি?

—মোহান্ত্ কা।

—মোহান্ত্ কোথায়?

—বনারসে।

—এখানে হাতি নিয়ে ঘুরছ কেন?

—হুজুর…

—যব খেয়ে দেয় যদি?

—না হুজুর।

—কি করছ এখানে?

—ভাড়া মিললে, সোয়ারি নিলে৷ অমনি করেই হাতির খোরাক চালাই হুজুর।

—দাঁড়াও, আসছি।

ব্রিজভূষণ দরকারী কাজটি সারে এবং তারপর বুলাকির সঙ্গে দর-দস্তুর হয়। শেষ অবধি হাতির খোরাক ও দশ টাকায় রফা হয়। বুলাকির জলখাই।

মহানন্দে বুলাকি জগমোহনকে স্নান করায় এবং বটপাতা খাওয়ায়। অতঃপর গোলা রং দিয়ে জগমোহনের কপালে ও শুঁড়ে আলপনা আঁকে। নিজেও ভরপেট ছাতু, জোলো দই ও ভেলি গুড় খায়।

কিন্তু কপালের ফের। সংবাদ আসে দেওতা চলে গেছেন ধানবাদ। দশ দিন না গেলে ফিরবেন না। দশদিন বাদে কোনো শুভদিন পঞ্জিকায় মেলে না। অতএব ব্রিজভূষণ বুলাকিকে বিদায় দেয়। জগমোহনকেও। বুলাকি চলে যায় ঝুঝারের দিকে। বুরুডিহা যেতে যেতে যাওয়া হয় না।

এবার ও তল্লাটে একে একে সিগনিফিকেণ্ট ঘটনাবলী ঘটতে থাকে।

(এক) ঝুঝার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার বালকৃষ্ণ সিং সোসালিস্ট পার্টির লোক। সে এসেই ব্রিজভূষণ ছত্রীর ক্যানাটিক বর্ণ-বিদ্বেষ ধরে ফেলে, এবং ব্রিজভূষণের প্রতিটি পাবলিক অ্যাক্টের পেছনে উক্ত মানসিকতা দেখতে পায়। কেন যেন তার ধারণা হয়, তার খুঁটির জোর আছে। মনে হয় রাঁচিতে লোকজন আছে ম্যাও ধরাবার। কিন্তু বনবিভাগের জঙ্গল, জোতদারের জমি ও বন্ধ্যা পাথুরে প্রান্তর দ্বারা বিচ্ছিন্ন এই আদিবাসী গ্রামগুলি যে আসলে রাঁচি থেকে শত লক্ষ যোজন দূরে, তা সে বোঝে না। বাস রুটের দূরত্ব নয়, এ অন্য দূরত্ব। রাঁচি নয়া ভারত। গ্রামগুলিতে নিয়ানডারথাল যুগ চলছে। জল নেই, মহুয়া তেলে জ্বলে আলো একমাত্র বাতি, মাড়োয়া বা ভুট্টা বা চীনাদানার ঘাটো একমাত্র স্টেপল ফুড, লবণ বিলাসিতা। যোগে-

দু'খে নয়া ভারতে ঘৃণ্য মিশনারী একমাত্র ভরসা; সারা বছর ধারকর্জ নিতে জোতদার বা মহাজন একমাত্র সহায়। এরা এমন তুচ্ছ ও এক্সপেনডেবল, যে ভোটের সময়ে এদের কেউ এক টাকা মাথাপিছু দিয়েও ভোট দেয়ায় না। মহাজন বা জোতদার বা ব্রিজভূষণ চোখ রাঙিয়ে যাকে ভোট দিতে বলে, এরা তাকেই ভোট দিয়ে আসে।

অবোধ বালকৃষ্ণ সিংয়ের মনে হয়, এদের প্রতি অবিচার হচ্ছে। সে মাঝে-মধ্যে ভালাতোড় থানায় রিপোর্টও করে। ব্রিজভূষণ বোঝে এ ছোকরাকে টাইট দিতে হবে।

ইস্যুর অভাব হয় না। কলেরার মড়কে ইঞ্জেকশান দিতে এসে সরকারী জীপ ঝুঝার গ্রামটি উপেক্ষা করে চলে যায়। কারণটি জানতে চাইলে ব্রিজভূষণ সদর্পে বলে, যে সূঁচে বর্ণহিন্দুকে ইঞ্জেকশন দেবে, সেই একই সূঁচে অছুত ও আদিবাসীকে?

নহীঁ নহীঁ মাস্টারবাবু। য়ে হো নহীঁ সকতা। পোড়া স্বাধীনতার পর বর্ণ হিন্দু এই অছুত ও আদিবাসীর চাপে লোপ পেতে বসেছে। থাকার মধ্যে আছে ওই রক্তের পবিত্রতাটুকু। দেহে রক্ত থাকতে তা নষ্ট হতে দেবে না ব্রিজভূষণ।

বালকৃষ্ণ সিং গলায় সাধ্যমত সারকাজম এনে বলে, এদের কলেরা হলে কে দেখবে?

ব্রিজভূষণ ছত্রী কঠোর গাম্ভীর্যে বলে, বুরুডিহাতে জীবন্ত দেওতা আছেন। হনুমান মিশ্র। তিনি ভগবানকে ডাকবেন। জীবন আর মৃত্যু লিখাই-পড়াই দিয়ে মাপার জিনিস নয়। যখন ইঞ্জেকশানের ব্যবস্থা ছিল না, তখন কি সবাই কলেরায় মরে যেত?

বালকৃষ্ণ সিং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটোছুটি করেও ফল পায় না। এবং বোঝে, ব্রিজভূষণ ও হনুমান মিশ্রকে চটিয়ে সরকারী আমলাও কিছু করতে রাজী নয়। ব্রিজভূষণ শুধু সামান্য পঞ্চায়েত-প্রধান নয়। এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রতাপ ও প্রভাবশালী লোক।

বালকৃষ্ণ সিংয়েরও অহেতুক জেদ চাপে! কলেরা ছড়াতে থাকে। আশপাশের গ্রামে মানুষ মরে। অতঃপর সে ঝুঝার গ্রামে মানুষ মরে।

অতঃপর সে বুঝায় এবং বলে, আমি ঝুঝারে হায়জার সুঁই দেওয়াব। রাঁচি যাচ্ছি। রাঁচি থেকে ডাক্তারের গাড়ি এনে সুঁই-ইলাজ।

কেন ?

গাঁওবুড়ো তার সহিষ্ণু, শান্ত ও হলদেটে চোখ দুটি তুলে বালকৃষ্ণের দিকে চাইল। বলল, কিছু হবে না রে।

কেন ?

হায়জা ঝুঝারে আসছে।

কে বলল ?

মিশ্রজী বলেছে।

কাকে বলেছে ?

ছত্রীজীকে।

কবে বলল ?

রোজ বলছে।

না, না, ভয় দেখিয়েছে।

বলেছে, সুঁই নিলে মরদরা খাঁসী হয়ে যাবে। সরকার নাসবন্দী করাতে চায়। মরদরা খাঁসী হবে বলে ভয়ে নাসবন্দী করে না। তাই হায়জার সুঁই দিচ্ছে বলে মরদদের খাঁসী, আওরতদের বাঁজা করে দিচ্ছে। তাই বলছে।

তা যদি হবে, তাহলে ছত্রীজী, মিশ্রজী নিজেরা সুঁই নিল কেন ? শোনো, এ ওদের কৌশল। তোমাদের হায়জা হলে তোমরা মরবে। ওরা নিজেরা ভাল থাকবে। তারপর দেখো, কোনো মরদ মরলে তার জমি বেহাত হয় কিনা ?

সে তো হায়জায় না মরলেও জমি চলে যায়। এক সময়ে আমরা জানি নি জমি ছত্রীজী নিয়ে নেবে, আমরা হব তার চাকর। তাই তো হল।

শোনো, সুঁইদার এলে আমি আগে সুঁই নেব। তোমরা দেখো, কিছু হয় কি না।

তোরে মেরে দিবে।

কে?

ছত্রীজী।

মেরে দেওয়া অত সোজা?

তোর লেগে ডর ই। তুই হেথা থাকিস। মোদের তরে ভাবিস।

বালকৃষ্ণ বলে এবার শহর থেকে আমার বউ-বাচ্চাকেও নিয়ে আসব। তোমাদের দেখাব।

তোর বউ সুঁই নেবে?

বউ নেবে। বাচ্চা নেবে।

সকালে এ মিটিং হয়। বিকেলে ব্রিজভূষণ ছত্রী সাইকেল চেপে চলে আসে ঝুঝার। বালকৃষ্ণকে বলে, হাঁ থেকে দশ কিলো চাল আর দু কিলো গুড় দিতে হবে।

কেন?

হায়জার মড়ক চলছে জানেন না?

কেমন করে জানব?

এ আপনার রাগের কথা। সুঁইদার চলে গেল। তাতে রাগ করেছেন।

চাল আর গুড় কি হবে?

হায়জা শান্তি করতে যজ্ঞ হবে। মিশ্রজী নিজে যজ্ঞ করবেন। সব গ্রাম থেকে চাল আর গুড় নিচ্ছি। সুঁই ইলাজ কি করে মাস্টারবাবু? আপনি মাস্টার মানুষ, ব্রাহ্মণ দেওতার পর বিশ্বাস নেই আপনার?

ঝুঝার আপনার রাজ্য হতে পারে রাঁচি নয়। রাঁচি গিয়ে আমি সুঁই-গাড়ি-ওষুধ আনব।

সে তো খুব ভাল কথা। এখন যে আসবে, সে ওদের সুঁই দিক। সরকারী বন্দোবস্ত, আমি পঞ্চায়েত প্রধান, কি 'না' বলতে যাব? এখন চাল আর গুড়ের কথাটা বলে দিন।

আপনি বলুন।

ব্রিজভূষণ ছত্রী সরাসরি গাঁবুড়োকে ডাকে। বলে, দশ কিলো চাল দিবি, দু কিলো গুড়, বুরুডিহা নিয়ে যাবি। মিশ্রজী তোদের জন্যে হায়জা তাড়াতে যজ্ঞ করছে।

কোথা পাব? চাল কার ঘরে আছে?

তা আমি জানি?

মাস্টারবাবু বলে সুঁই নিলে হায়জা যাবে। যাগযগ করলে মোদের কি? মোদের কি খেতে দিবে? মিশ্রজীর যাগযগে চাল আর বেগারী ত কতবার দিলাম। এবার খুব আকাল।

না দিলে না দিবি।

ব্রিজভূষণ সহাস্যে চলে যায়। গ্রাম থেকে যাবার আগে বালকৃষ্ণকে টাকা দিয়ে ওর রেডিওর ব্যাটারি আনতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে যায়। বলে যায়, দেখে বড় ভাল লাগল মাস্টারবাবু। ওরা আপনার কথায় খুব ভক্তি করে।

বালকৃষ্ণ এর পর সকালের বাসে রাঁচি চলে যায়। কর্তৃপক্ষকে জানাতে ও ব্যবস্থা করতে ওর দু দিন লেগে যায়। দু দিন ঝুঝারের লোকেরা সভয়ে দূরে দূরে কলেরায় মৃতদের চিতাগ্নি দেখে, মাস্টারে আস্থা রেখে ব্রিজভূষণকে চাল না দেওয়া অবিমৃষ্যকারিতা হল কি না, তা ভাবে। এর মধ্যে মিশ্রজীর ওখানে মহাযজ্ঞ লেগে যায়। সে যজ্ঞে অন্যান্য ব্রাত্যরা প্রসাদ পাবে না জেনেও চাল ও বেগারী দিচ্ছে, তারা শুধু বাকি রইল। এ কেমন হল, তা নিয়ে ভেবে চিন্তাকুল হয়।

কার্যকালে দেখা যায় যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন, সেই খানেতে 'তাঁর' চরণ ফেলার কোনো ইচ্ছেই নেই। ওটি বিশ্বাসী ও সৎ কবির ইচ্ছা মাত্র। কেন না সেই 'তিনি' মিশ্রজীর যজ্ঞে পূজা নিতে থাকেন। অফিসিয়ালি সকল মস্তান যজ্ঞের জায়গায় থাকলেও মাস্টারের জনহীন ঘর ও স্কুলচালা পুড়ে যায়। ঝুঝারের একমাত্র জল-উৎস পঞ্চায়েত দীঘিতে জনৈক কলেরায় মৃতের দেহ ভাসে এবং দু পাশের গ্রামবাসীরা মড়াটিকে ডিনাই করে, ঝুঝারবাসীদের 'অবিশ্বাসী, হারামী' বলে গাল পেড়ে জল নিতে দেয় না নিজেদের কুয়ো থেকে। মড়াটি টেনে তুলে দূরে ফেলে ঝুঝারবাসীরা সেই জলই পান করে। ফলে ঝুঝারে কলেরার মড়ক লাগে।

মাস্টার কখনোই এসে ঝুঝারে পৌঁছয় না, ফলে ঝুঝারবাসী আতঙ্কে

বিশ্বাস হারায়, ব্রিজভূষণের কাছে ছোটে এবং চাটিমাটি বেচে প্রায়শ্চিত্ত পূজা পাঠাতে চায় মিশ্রজীকে। ব্রিজভূষণ বলে, না না, ব্রাহ্মণ দেওতাকে তোরা অপমান করেছিস। তোদের পুজো তিনি নেবেন না।

মিশ্রজী ক্ষমাসুন্দর হেসে স্বয়ং চলে আসেন ঝুঝার। সকলকে প্রসাদী পেঁড়া ও পচা পেঁপে দেন। বলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষমা করতেও জানে রে।

ফলে ব্রাহ্মণত্ব যে সুপ্রীম ফোর্স তা ঝুঝারবাসীর ও অন্যান্য গ্রামীণদের মনে প্রতিষ্ঠা পায়।

মাস্টার আসে না বলেই হেলথ্ ডিপার্ট গাড়ি পাঠায় না। পরে হাটিয়ারের পথে মাস্টারের গাড়ি-চাপা শব পাওয়া যায়। তার মৃত্যুর সদুত্তর শহরে মেলে না। কিন্তু জঙ্গলে মহাজন পদাশ্রয়ী গ্রামগুলিতে এই মৃত্যু প্রতীকী ডাইমেনশন লাভ করে। ভালাতোড় থানার অফিসার গোপন রিপোর্টে লেখেন, 'লোকটি এজিটেটর ছিল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তার মেলামেশা দেখে বোঝা যেত ও আসলে কম্যুনিস বা সোশালিস।

এর পরে পরে যে ঘটনা ঘটে, তা খুবই দ্যোতক। সময়, অর্থাৎ কাল দশকে দশকে এগোতে থাকে এবং অঞ্চলে কোথাও থার্মাল পাওয়ার স্টেশন উদ্বোধন করতে এসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রেস মারফত ভারত ও বহির্ভারতকে জানান, 'উই রীচ দা মডার্ন টাইমস্।' ফলে রাঁচি ও অন্যান্য শহরে উক্তিটি প্রচুর প্রচারলাভ করে।

মডার্ন টাইমসে অঞ্চলটি পদক্ষেপ করার পর যে ঘটনাটি ঘটে, ষাটের দশকের শেষ বছরে, সেটি শিক্ষককেন্দ্রিক নয়, ছাত্র-কেন্দ্রিক। টাহাড় গ্রামটি ফল বাগিচার জন্য বিখ্যাত। সেখানকার আমরুদ, সরিফা, জামুন, লিচু, পাপাইয়া ও আম দেখার মত অতিকায়। গ্রামটি ওরিজিনালি ভালাতোড় এস্টেটের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে, মিশ্রজীর চাচেরা ভাইয়ের, কুন্দনজীর দখলে। কুন্দনজীর বয়স বছর চল্লিশ। সে অতীব বলিষ্ঠ, এবং সাইকেলের চেন দিয়ে দুষ্কৃতকারীদের পেটানোতে দক্ষ। মিশ্রজীর ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং ব্রিজভূষণের মিশ্র-ভক্তি দুই কুন্দনের

মধ্যে মূর্ত হয়েছে। টাহাড় গ্রামের স্কুলটি ভালো। মিশ্রপরিবারের পাকা বাড়িতে। ফলে গ্রামের বর্ণেতির জাতির ছেলেরা পড়তে হলে পালানি গ্রামের স্কুলে যায়। যায় না বলাই সত্য হবে। কেন না, আট বছবের ছেলে স্কুলে গেলে এদের চলে না। এদের হিসেবে আট বছরের ছেলে সাবালক। গাইচরী বা অন্য কাজ করে সংসারে সে সাহায্য করে থাকে। ইত্যাকার কারণে টাহাড় গ্রামের ছেলেরা কখনো স্কুলে যায় না। পালানি গ্রাম ও টাহাড় গ্রামের মাঝে একটি বোলডার আচ্ছন্ন আন্দোলিত রুক্ষ প্রান্তর। কোনো কোনো বোলডার মনোলিথ্ সদৃশ। ফলে চাঁদনি বাতে প্রান্তরটির দিকে চাইলে হঠাৎ মনে হয়, বিভিন্ন মাপেব ও দৈর্ঘ্যের বহু মানুষ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। একটি বিশেষ পাথব খুবই অদ্ভুত। লম্বা, চৌকো, মোটা। পাথরটি সম্পর্কে প্রবাদ আছে, ওটি জীয়ন্ত হয় এবং প্রত্যহ একটু করে জায়গা বদল করে। ওটি পাথর নয়, প্রেতাত্মা, এবং ওটির কোন উদ্দেশ্য আছে। প্রবাদটির সত্যতা কেউ যাচাই করতে যায়নি। কিন্তু নির্জন সময়ে পাথরটির কাছ দিয়ে কেউ একা যায় না। কুন্দন মিশ্র একদিন ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ দেখল একটা বছর দশেকের ছেলে পাথরটির নিচ থেকে কি নিয়ে লুকিয়ে পড়ল। কুন্দন সভয়ে চোখ ফিরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিছুদূর এসে শোনে কে তাকে ডাকছে, হুজুর! হুজুর সাহেব! আমি!

কুন্দনের কিষাণ সুখিয়া গঞ্জুর ছেলে এতোয়া। সুখিয়া বছর ছয়েক জেল খাটছে কুন্দনের জমি নিয়ে দাঙ্গায়। কুন্দনই ওকে ভরসা দিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। এতোয়ার বউ ঝালো অত্যন্ত দলমলে মেয়েমানুষ। কুন্দনের সে কৃপাভাজন। সুখিয়া জেলে যাবার অনেক আগে থেকেই। ঝালোকে কুন্দন কাঁচা ইটের পোক্ত বাড়ি করে দিয়েছে। এ অঞ্চলে কাঁচা ইট রোদে পুড়িয়ে নিলে তা দিয়ে, খাপরার চাল দিয়ে বাড়ি করলে তা বহুকাল টেকে এবং কোনো গঞ্জু পরিবার ওরকম ঘরবাসী হলে জাতের চোখে জাতে ওঠে।

ঝালো যে ওরকম ঘরে থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। কুন্দন যে

ঘরে আসে যায়, সে ঘর ভাল হতেই হবে। কুন্দনের যাওয়া আসা সুখিয়ার বা ঝালোর অনুমোদিত কি না, এ প্রশ্ন কেউই তোলে নি। ঝালো'দের সুমুখের ও পিছনের প্রোজেকশন অসংগত রকম উঁচু ও নৃত্যশীল হলে কুন্দন মিশ্ররা পর গোয়ালে জাবনা খাবে, মুনি বাক্য।

ঝালোর বড় ছেলে এতোয়ার চেহারা কুন্দনের মত, সেটি ঝালোর পক্ষে খুবই পয়মন্ত হয়েছে। কুন্দনের ঘরওয়ালীর গর্ভজাত সন্তানরা বাপের কুপুত্তুর। যেমন চেহারা, তেমনি রুগ্ন। স্কুলে পড়ছে তো পড়ছেই, ঘষছে তো ঘষছেই, বুদ্ধির ছিটেফোঁটা নেই।

এতোয়া অফিসিয়ালি সুখিয়ার ছেলে। সে কুন্দনের অতি প্রিয়। কুন্দন তাকে দিয়ে ঘোড়ার পরিচর্যা করায়। ওকে ঘোড়া চড়তেও দেয়, সাইকেল চালাতেও।

এত পেয়ার দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। গরিব-দুঃখীব ছেলে।—ঝালো বলে।

এতোয়াকে তুই কিছু বলবি না। ওকে আমি পবে বাগিচা দেখাব কাজে দেব।

লিখাই-পড়াই জানে না।

পালানিতে যাক না স্কুল।

কুন্দন ব্যাপারটিকে সম্যক গুরুত্ব দেয়নি। এতোয়ার বিষয়ে ওর মনে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। এরকম একটা ছেলেও ওর ঘরওয়ালীর পেটে হয়নি। এত বুদ্ধি, এত সজীবতা আর দুঃসাহস। মরদ বাচ্চা যাকে বলে।

এখন এতোয়াকে আসতে দেখে ও খুবই অবাক হল ও ঘোড়া থামাল। সস্নেহে ওর চুল নেড়ে দিয়ে বলল, দুপুরে এখানে কি করছিস?

হুজুরের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

কেন?

মাস্টার এই চিঠি দিয়েছে।

মাস্টার? চিঠি।

হাঁ হুজুর। আমি পাস হয়ে গেলাম।

পাস হলি?

হাঁ হুজুর। পাঁচ ক্লাস হল। ভালাতোড়ে গিয়ে পড়তে হবে, আর আমি বৃত্তিও পাব।

কিসের?

গঞ্জু লোকের বৃত্তি মেলে।

বৃত্তি মেলে?

হাঁ হুজুর, অছুতের বৃত্তি মেলে।

এ পর্যন্ত কুন্দন এতোয়ার কথাগুলি খুব মন দিয়ে শোনে নি। 'অছুত' শব্দটি ওর কানে বাজে, এবং তখনি মনে হয়, ওর ঔরসে জন্মালেও এতোয়া 'অছুত'। এতোয়া ওর ছেলে, তা সবাই যখন জানে ও নিজেও জানে নিশ্চয় কিন্তু কখনোই ওকে 'হুজুর' ছাড়া সম্বোধন করে না। কুন্দনের অবৈধ ছেলে হিসেবে টোলিতে ও যথেষ্ট খাতির পায়। ছেলেটা ভাল। কুন্দনকে লজ্জায় ফেলে না। গ্রামে ও দূরত্ব রেখেই চলে। কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে আবদার করে একটু কাছে আসে। এসেও নিচেই থাকে। এখন যেমন। কুন্দন চলেছে ঘোড়ার পিঠে। ও হাঁটছে। মার আদরে ও যত্নে ওর চেহারাও বাড়ন্ত। যারা কুন্দন মিশ্রের বংশ বজায় রাখবে, তারা দুধে ঘিয়ে ডুবে থেকেও কি অপুষ্ট আর রুগ্ন।

আমাকে কি করতে হবে?

ভালাতোড়ে থাকব, একটু বলে দেবেন।

দেখা যাবে।

গ্রাম চোখে পড়তেই কুন্দন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

এতোয়া হেঁটে হেঁটে চলল।

পালানির স্কুলে এতোয়ার পাস করা ও বৃত্তি পাবার ব্যাপারটির রিপারকেশন বহুদূর গড়াল। এতদূর গড়াবে, তা কুন্দনও বোঝে নি।

রাত না হলে কুন্দন বাড়ির অন্দরে ঢোকে না। বাইরের মহলেই তার বাস। রাতে একবার অন্দরে খেতে যায় মাত্র। সে সময়েই

তার সঙ্গে ঘরওয়ালীর যত কথাবার্তা। এ ব্যবস্থায় ঘরওয়ালীও খুশি। সরু পাছা, চ্যাপ্টা বুক ও অপুষ্ট শরীর নিয়ে পাঁচবার আঁতুড়ে গিয়ে তার পুরুষ বিষয়ে ভীতি জন্মেছে। উর্বরা মেয়েছেলে সে দেখতে পারে না। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা কয়েকটি বুড়ি দাই ও চাকর করে। সে থাকে ঠাকুরঘরে। বড় জোতদারের মেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে সে যথেষ্ট দাপটে কথা বলে। হনুমান মিশ্র এ পরিবারের কর্তা। তিনি ওকে 'স্বয়ম লছমী' বলে থাকেন।

কুন্দন ঘরওয়ালীর কথা এতোয়ার পাস সম্পর্কে মনেই রাখে না। উলঙ্গ হয়ে যুবতী দাইয়ের কাছে তেল মেখে স্নান করে ঘুমিয়ে সে সন্ধ্যায় ঝালোর ঘরে গেল। ঝালোকে একটি আটাভাঙা কল কিনে দিয়ে বাসকটের গ্রাম তিজিহাটে বসত করাবে, এ কথা বলতে এবং তার প্রাপ্য সুখ পেতে।

হুজুরকে আসতে দেখে ঝালোর ছেলেরা দিদিমার ঘরে চলে গেল। কুন্দন কিছুক্ষণ ঝালোর শরীরে চাষ দিল। তারপর আটাভাঙা কলের খবরটি দিল।

ঝালো বলল, কথা ছিল একটা।

কি?

এতোয়া।

কি?

ও পড়াই করতে চায়।

পড়াই করবে? তা অনেক পড়াই তো করল। যা শিখেছে, হিসাব রাখতে পারবে।

ও পড়াই করতে চায়।

আরে ছোটজাতের ছেলে, পড়াই করে করবে কি? এতোয়া বলে আমি ওকে পালানির স্কুলে যেতে দিলাম। এর আগে কোন্ গঞ্জু কোন্ দোসাদ কোন্ ধোবির ছেলেকে স্কুলে যেতে দিয়েছি?

মাস্টার বলে, ওর দিমাক খুব।

কাকে বলে? তোকে?

হাঁ। ওকে বলে দিল বাবাকে ডাকতে। তো ও বলল, বাবা হাজতে। মাস্টার বলল, তবে মাকে ডাকো।

তুই গেলি ?

হাঁ।

কবে গেলি ?

কাল।

না না। আর বলিস না। এ মাস্টারকেও তাড়াতে হচ্ছে। গঞ্জু-দোসাদ সবাই পড়াই করবে, তো ফল বাগিচা, খেতী-জমি, কাজ করবে কে ?

সরকার। আমি আপনার কাছে কুছ্ মাগি না। না মাঙতে আপনি সব কুছ্ দেন। এবার আমি এই ভিখ মাঙছি। আমিও ওকে অনেক বুঝিয়েছি, বলেছি। ও মানতা নহী। খুব জিদ্দি। আপনি জানেন ও কি রকম আর কেন এরকম করে। আদর দিয়ে আপ্ উস্‌কো আশা বাড়িয়ে দিলেন।

যা যা, আমি ওকে একটা সাইকেল কিনে দেব পরে। এখন সময় খুব খারাপ। আরে জানিস না ? যে মাস্টার এরকম গঞ্জু-দোসাদকে পড়াইমেঁ উশকানি দেয়, সে নিশ্চয় নকসাল লোক। পুলিসকে ভি পাত্তা দিয়ে দেব।

ঝালো চুপ করে রইল। তারপর বলল, তাই বলব। গঞ্জু-ছেলে, পড়াই করে উ ভি মাস্টার হবে, অনেক কথা বলছে।

না, না, এ ঠিক নয়। এরকম দিমাক বিগড়াবে জানলে আমি ওকে থোড়াই স্কুলে যেতে দিতাম ? তা ছাড়া, এখানে সবাই জানে ও কার ছেলে, আমার ভয়ে মুখ খোলে না। ভালাতোড়ে ওকে পড়তে দিলে সবাই বলবে কুন্দন মিশ্র তার গঞ্জু ছেলেকে পড়িয়ে উপরে উঠাতে চায়। সেখানে সবাই হাঁস উঠাবে। ইধর-উধর আমার যত দুশমন আছে, সবাই হাতে তুরুপের তাস পেয়ে যাবে। উ ছত্রী, বহোৎ খচড়াই, আমাকে .... !

ব্রিজভূষণ ছত্রী কুন্দনের প্রতিপক্ষ। যে হনুমান মিশ্র হতে অঞ্চলে

ব্রাহ্মণ্য ধর্মে শ্রেষ্ঠতা প্রচার পাচ্ছে, তাঁরই চাচেরা ভাই কুন্দন। ঝালোদের গর্ভে কুন্দনদের সন্তান উৎপাদনে কুন্দনদের অধিকার আছে। সে সন্তানকে স্কুলে পড়িয়ে মাথায় তোলার অধিকার নেই। ব্রিজভূষণ, কুন্দনকে হেয় করার সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবে না। কুন্দনের কপাল এমন হনুমান মিশ্র তার কথার চেয়ে ব্রিজভূষণের কথায় আস্থা রাখেন বেশি। এতোয়া'কে কোন মতেই ভালাতোড গিয়ে উঁচু ক্লাসে পড়তে দেবে না, সে বিষয়ে কুন্দনের মন অনড। কিন্তু এতোয়া বিষয়ক কনভারসেশন চালাতে চালাতে কুন্দনের মনে কয়েকটি উপলব্ধি অসংলগ্নভাবে খেলা করে জলে আঁকা ছবির মত মিলিয়ে গেল। যেমন :—

এতোয়াকে সে অসম্ভব ভালবাসে। শুধু জবরদস্তি বা জোর খাটানো নয়, তার সঙ্গেই সন্তানের প্রতি তীব্র স্নেহ ও মমতা। সম্ভব হলে সে এতোয়াকে হয়তো পড়তে দিত। কিন্তু তা কি সম্ভব?

ঝালো খুবই প্রয়োজনীয় তার কাছে এবং ঝালোর চুপ করে যাওয়ার মধ্যে, কুন্দনের হুকুম মেনে নেওয়ার মধ্যে এই ভাবটা স্পষ্ট ঝালো খুব প্রসন্ন মনে মেনে নিচ্ছে না হুজুর সরকারের হুকুম। স্বগত চিন্তাতেও ঝালো তার বিরুদ্ধে যেতে পারে? চিন্তাতেও অসহ এবং নিষ্ফল ক্রোধ। ঝালোকেও সে ভালবাসে খুব ভালবাসে।

এতোয়ার পড়তে চাওয়া ও পালানির মাস্টারের সে প্রসঙ্গে মদত দানের মধ্যে যেন একটা বদলে-যাওয়া হাওয়ার আঁচ আছে। কুন্দনের কি সাবধান হওয়া উচিত? সাবধান? কিসের বিরুদ্ধে বা বিষয়ে? মনের নিচে ভয় কেন? কুন্দন কালই বন্দুক দুটো সাফ করবে।

কুন্দন ঝালোকে বলল, এ মহল্লার ছত্রিশটা গ্রামের মধ্যে কোনদিন আমরা গঞ্জু-দোসাদকে সরকারী ব্যবস্থায় স্কুলে পড়তে দিই নি, আজও দেব না। উ নাথারা বাত ভুলে যা। গঞ্জু পড়বে। তাহলে তো জুত্তি সে ছাতা বনত, মানুষ মাথায় দিত।

এই সময়ে বন্ধ দরজার বাইরে একটা অদ্ভুত শব্দ হল। যেন বহুক্ষণ দম আটকে ধরে রেখে কেউ নিশ্বাস ফেলল। ছোট ছোট পায়ের শব্দ।

ঝালোর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কুন্দন কিন্তু হাসল ও বলল, এ নিশ্চয় এতোয়া। ভালই হ'য়েছে বেটা আপন কানে সব শুনে নিল।

তারপর বলল, আজ তাড়াতাড়ি চলে এলাম, বলতে · এতোয়াকে নিয়ে যাব ক'দিন বাদে ঠিক বলতে আসি নি। এখন মনে হল ওর এত পড়াইয়ের শখ, রামগড়ে দোকানে ঝাড়ু-জল দেবে···কাহ্নু ওকে অঙ্ক-হিসাব শেখাবে · তোর আটা কলে তো হিসাব রাখতে হবে।

ঝালো এবং কুন্দন গভীর বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। এ-রকম গলায় এত ইতস্তত করে কুন্দন কখনো কথা বলে নি। এতোয়া ছাড়াও ওদের আরো দুটি সন্তান আছে যেমন, তেমন এও সত্যি যে কালই কুন্দন ওকে তাড়িয়ে দিলে দেশ-ঘরে কেউ তাতে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখবে না, ঝালো তো নয়ই। দেওয়ালে গোলা রঙে আঁকা বিকট প্রোপোরশনের পাখি ও বানরদের চোখও বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল।

রাতে ঘরে খেতে গিয়ে কুন্দন প্রথম টের পেল হাওয়া সত্যিই বদলেছে। কোথাও বন্ মে' আগ্ লেগে থাকবে। কেননা বাতাসে দাবানলের আঁচ ছিল।

ঘরওয়ালীর মুখ থমথমে, চোখ লাল, কান্না ও রাগে গলার স্বর বিকৃত। কুন্দনের সামনে বসে সে পাখার বাতাস করে গেল। কিন্তু কথা বলল না।

কি হল ?

আমি বাপের বাড়ি যাব।

কেন ?

এ অপমানের পর টাহাড়ে থাকব না।

কি অপমান ?

আমার গোপাল-গোবিন্ স্কুলে পাস করল না, আর ওই ঝালোর ছেলে।···

ও।

এতোয়াকে দেখ-ভাল করতে লোক আছে আমার ছেলেরা বাপ

থাকতে অনাথ। এখন আমার মুখে লাথি মে-র এতোয়া যাবে বড স্কুলে। ব্রাহ্মণের ছেলে থাকবে গ্রামের স্কুলে, গঞ্জুর ছেলে···

না।

কুন্দন হঠাৎ ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল। গর্জে উঠল, তার আগে আমি ওকে মেবে ফেলব।

কথাটা কুন্দন খুব জোরেই বলে এবং অন্দবের দাসীবা, বাইরেব দাসী ও নোকবরা সবাই শুনতে পায। পরে কথাটি নিযে কানাঘুষোও হযেছিল।

কুন্দনেব গলায প্রচুব হিংস্রতা ছিল, তাতেও ভয পেল না ঘবওয়ালী। বলল, এব ব্যবস্থা না হলে আমি দেওতাব কাছে যাব। ঝালোকে বাড়ির সামনে ঘর করে না দিলে চলছিল না? দেওতা কতবার বলেছিলেন বাহাবেব জঞ্জাল বাহাব রাখতে।

বক্তব্যটির আগুারলাইং থেট কুন্দনের কানে বাজল এবং সে বলল তাবও ব্যবস্থা করব।

ব্যবস্থা হবে। আমি মবলে।

তুই মরবি? তুই পাঁচশো বছব বাঁচবি।

কুন্দন ঘন দুধ ও মিছবির কটোবা ঠেলে দিয়ে উঠে গেল।

কুন্দন সকালে এতোয়াকে ডেকে খুব ডেঁটে দেয়, ঝালোকেও, এবং তাবপর ব্যাপারটিকে আর গুরুত্ব দেয় না। ও বোঝে নি পাস করা এবং মাস্টারের ভূয়সী প্রশংসা এতোয়ার মানসিকতায কি রূপান্তব ঘটিয়েছে। মানুষেব মন, এক গঞ্জু বালকের মন, ভূস্তর সদৃশ। তাতে নিবন্তব স্তর-পরিবর্তন—বিচূর্ণ—সম্ভেদ—অবক্ষতি চলতে চলতে পাললিক শিলা কেলাসিত হয়ে হীরক-কঠিন হতে পারে। এতোয়ার মনে এ সবই ঘটে যায়। দ্রুত। মানুষের মন জড পৃথিবী নয়। তাতে রূপান্তর সকল দ্রুত ঘটে। যা কোটি কোটি বছরে ঘটার কথা, তা দু-তিন দিনে ঘটলে ফলটি পরিণামে মানুষটির পক্ষে বিধ্বংসী ও বিনাশ-কারী হতে পারে। এতোয়ার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

দিন তিনেক বাদে ঝালো একটি পেতলের রেকাবিতে কয়েকটি

পেঁপে, ফুল ও তিলকুট রেখে যায় কুন্দনের গোহালে। পুজোর প্রসাদ গঞ্জু ও দোসাদরা গোহালেই রেখে যায়। কিসের পুজো, কেন পুজো তা জানা যায় নি।

এতোয়াকে গ্রামে পাওয়া যায় না। জানা যায়, পালানির মাস্টারও তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। বুরুডিহার সোম্‌রা গঞ্জু টাহাড়ে মেয়ের বাড়ি সোশাল ভিজিটে এসে গঞ্জুদের কাছে এতোয়ার কেসটি যথেষ্ট সহানুভূতি সহকারে শোনে। এক নম্বর চোলাইয়ের মহিমায় তার শীর্ণ, উড়ন্ত পরীর উল্‌কি-আঁকা বুকে অসংগত উদারতা জাগে। সে বলে, এতোয়া যা'ক্‌ না কেন? ভালাতোড়ে আমার চাচী আছে। তার ঘর থাকবি। জলপানি হতে তারে দুটা টাকা দিস, ছাগল চরাই করে দিস। হাঁ, আমি বলে দিব।

সোম্‌রার মানসিকতা যথারীতি গ্রামীণ টরচুআস পদ্ধতিতে ফাংশান করে। যে কাজ করতে কুন্দনের অ'নচ্ছে, সে কাজ করলে তার ভাল লাগবে।

কেন ভাল লাগবে? কেননা কুন্দন, হনুমান মিশ্রের চাচেরা ভাই। হনুমান মিশ্র সোম্‌রার কি করেছে, বা করছে?

খচড়াই।

কেমন করে?

সোম্‌রার সর্বসাকুল্যে এক বিঘা জমি। জমিটি যে তার, সে কবুলিয়ত পাট্টা আছে। হনুমান মিশ্র এবং লালারা সকল গঞ্জুর জমি, বিভিন্ন ধারকর্জের এগেন্‌স্টে বৈধ ও আইনসম্মত প্রশাসন—অনুমোদিত উপায়ে হাত করেছে। সোম্‌রার জমিটি সোম্‌রা তার জামাইকে দিতে চায়। জামাই বুদ্ধি করে জমির খাজনা দিচ্ছে রিটান্‌ নিচ্ছে। এ এক কারণে জমি নেওয়া যাচ্ছে না।

কোনো গঞ্জুর জমিই কাগজেপত্তরে পরিষ্কার নয়। সোম্‌রার জমি এক্‌সেপশন। এ স্বখাতসলিল লালাদের সৃষ্ট। লালা বাবুদের একজনের শখ যায় বাগানে শিকার খেলবে। শখটির পেছনে বিলাইতী সাদা ঘোড়া ছিল। অশ্বশক্তিতে ইলেকট্রিফায়েড লালাবাবু আদাড়ে-

পাঁদাড়ে গুলি ছুঁড়ে এক বৈপ্লবিক গণ্ডগোল বাধান। বুড়ী গাইটি জাবর কাটতে কাটতে দাপনায় গুলি খায়। গো-হত্যা ঘটে যেত ভীষণ পাপের করাল ছায়ায় লালা ভবন অন্ধকার হয়ে যেত।

সোম্‌রার বাপ তার নেটিভ ওষুধ প্রয়োগ করে গাই বাঁচায়। ফলে লালা জননী তাকে একটি এঁড়ে বাছুর দেন। এবং ছেলেদের বাধ্য করেন ওর জমি না নিতে, লিখাইপড়াই করে দিতে। আসন্ন নরক থেকে খালাস পেয়ে হৃষ্ট মনে ছেলেরা মায়ের কথা শোনে।

এখন মিশ্রজী বুরুডিহায় মোতায়েন হবার পর থেকে, তাঁর শিবমন্দির সংবলিত বাসগৃহের পাশে ফণীমনসার বেড়া দেওয়া সোম্‌রার জমিটি বড় খারাপ দেখায়। গঞ্জুরা সবাই জমি হারিয়ে জঙ্গল এন্‌ক্রোচ করে টোলি বেঁধে বাস করছে। সোম্‌রা একটা প্রায় আফলা, মাড়োয়া ও জই জমানো জমির মালিক। এটি অসহ এক অ্যানাক্রোনিজম। তারপর বউ মরে যাবার পর এতকাল কাটিয়ে হঠাৎ সে বিয়ে করবে বলে তাল তুলেছে। জামাইকে সে টিপ দিয়ে জমি দিয়ে দিয়েছে। অতএব তার বিয়েতে মেয়ে জামাইয়ের অমত নেই।

হনুমান মিশ্রের রীতিমত অমত। তিনি সোম্‌রার পেছনে লেগে আছেন। ইত্যকার কারণে সোম্‌রাও দেওতার ওপর চটে গেছে। এতোয়া বড় ইস্কুলে পড়লে বুন্দন কেন, দেওতাও চটে যাবেন তা সে জানে। অতএব সে এতোয়াকে মদত দিল।

ঝালো বুঝল, কুন্দন চটবে। কিন্তু সবাই বলল, আমাদের ঘরে কেউ পড়াই করে নি, এতোয়া করবে, তাতে আমাদের বুক বড় হবে।

হুজুর সরকার···

সবাই বলল, হুজুর সরকার চটলে কি তোর মাথা কেটে নেবে? জেল থেকে ফিরছে সুখিয়া, সে ফিরলে তোকে এই গঞ্জুটোলিতে থাকতে হবে না আবার?

অবশেষে ঠিক হল, পালানির মন্দিরে পূজা দিয়ে নিলে কোন আপদ ঘটবে না। ঝালো সেই পুজোর প্রসাদই বুন্দনের গোহালে রেখে আসে। ঝালো খুব খুশি মনে রাজী হয়নি আবার অখুশিও হয়নি। ওর

বিশ্বাস ছিল এতোয়ার বয়স বিবেচনা করে, কুন্দন তাকে এখনো চায় যখন, তখন সে জন্মেও মাপ করবে। ঝালো কখনই কুন্দনকে কোন নির্মম বা নিষ্ঠুর কাজ করতে দেখে নি। কুন্দন খুব নিদারুণ শাস্তি দেবে সে ভয় ওর কমে যাচ্ছিল। পাঁচজন ওকে ভরসা দেয় ঠিক হয় টাহাড় থেকে চলে গিয়ে পালানিতে গঞ্জু টোলিতে এতোয়া থেকে যাবে এবং সন্ধ্যায় যে সরকারী বাস পোস্ট-ব্যাগ নেয় তাতে চড়ে ভালাতোড়। যাবে সোমরা আগে থেকেই ভালাতোড় গিয়ে অপেক্ষা করবে।

কুন্দন কি ভাবে জানতে পারে অথবা আদৌ জানতে পারে কি না ত নানাবিধ স্পেকুলেশনের আনডাবে। কয়েকটি কথা জানা আবশ্যিক।

(১) বুরুডিহাতে হনুমান মিশ্র সন্ধ্যারাতি করতে করতে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন ও ঢলে পড়েন। সুস্থ হলে পরে বলেন, তিনি হঠাৎ দেখলেন ও মন্দির-টন্দির কিছু নেই। তিনি টাহাড় ও পালানির মাঝামাঝি সেই প্রান্তরটা দেখতে পাচ্ছেন। সেই প্রেতে পাওয়া প্রান্তর। সেই অশান্ত ও অস্থির পাথরটা যেন পথের দিকে ঝুঁকে পথে কি দেখছে।

এখন সকলের মনে পড়ে ঝুঝার গ্রামে কলেরার মড়ক ও বালকৃষ্ণ মাস্টারের মৃত্যু সবই তিনি দিব্যচোখে দেখেছিলন। সকলই ভয় পায় ও এ-ওর দিকে চায়। ভারত মুণ্ডা বলে, সব হল সময়ের দোষ। ওগুলো এক কালে মুণ্ডা জনপদ ছিল। ওগুলি মুণ্ডাদের কোঁসানবুরু। সমাধি-প্রস্তর। এখন না হয় সে গ্রাম নেই। তবু ওই সব পাথরের নিচে পিসাব করা, ওগুলোর গায়ে ছাগল-গরুকে দিয়ে হাগানো কি ঠিক?

অশুভ কোন ঘটনার পূর্বাভাস, কালো, স্থিরলক্ষ্য, মন্ত্রপূত মেঘের মত টাহাড় পানে রওনা হয়।

(২) সন্ধ্যার পর ঘোড়ার খুরের নিচে বালির থলি বেঁধে চললে যেমন শব্দ হয়, তেমন চাপা শব্দ জোড়া ঘোড়ার খুরে শোনা যায়। শব্দ শুনে টাহাড়ের লোকরা ডাকাতের ভয় খায় ও ঘরের ইন্দিছিন্দি এঁটে শুয়ে পড়ে।

(৩) ভোর রাতে টাহাড় গ্রামের সকলে একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে আসতে শোনে। চীৎকারটিতে এত আর্জেনসী ও আতঙ্ক যে সেটি রাতচরা পাখির ডাক বলে মনে হয় না। যেন মানুষ চেঁচাল।

সকাল হয়। তুপুর হয়। বিকেলে ঝালো পালানি-যাত্রী গোয়ালাদের বলে দেয় এতোয়া ভালয়-ভালয় গেছে সে খবরটি জেনে আসতে। গোয়ালারা সন্ধ্যার পর ফিরে এসে বলে ঝালোর ননদ-নন্দাই খুব চটে গেছে। বাস-স্টপে ওকে বসিয়ে নন্দাই গিয়েছিল দোকানে। এসে দেখে ছোঁড়া উধাও। দোকানে বসে চা খেতে, কথা কইতে, বিড়ি খেতে সময় গিয়েছিল বটে, তা বলে ছোঁড়া না বলে চলে গেল? ছেলে নিশ্চয় টাহাড় ফিরেছে ঝালো ন্যাকামি করে খোঁজ করতে পাঠিয়েছে কেন?

এখন ঝালোর মনে অ্যালার্ম সিগনাল বাজে। কারো কথা না শুনে সে হাতে ধোঁয়াটে লণ্ঠন নেয়। সকলকে বলে, ছোট ছেলে! শেষ অবধি দূরে যেতে সাহস পায়নি। হয়তো ফিরে আসতে পারেনি।

সবাই বলে, ফিরে আসতে পারেনি, তো গেল কোথায়?

ঝালো বিপন্ন বোধ করে বলে প্রথমে কুন্দনের কাছে যায় কিন্তু কুন্দন তুদিন বাদে রামগড় থেকে ফিরে তখনি শুয়েছে। সে ঝালোর বিপন্ন আর্জিকে মোটে আমল দেয় না ও ভীষণ ধমকে বলে, হারামি ছেলে, লিখাই পড়াই করার নামে কোথায় ভেগেছে তা আমি জানি? বাড়ি এসে কথা বলছিস? জুতোকে প্রশ্রয় দিয়ে ছাতা হয়ে মাথায় ওঠে, সে দেখছি কহাবৎ নয়, সাচ্চা বাত।

ঝালো তখন একাই লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রান্তরটির অপবাদে সে আমল দেয় না। অগত্যা আর তু-চারজন পুরুষও চলে তার সাথে। এগোতে এগোতে ঝালো আর্ত স্বরে ডাকতে থাকে, এতোয়া! বোলৎ কায় নাই? কাঁহায়াছে, এতোয়া? এবং লণ্ঠনটি তুলে ধরে সে জ্যোৎস্নার অস্পষ্টতা ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে করতে তারই চোখে পড়ে সেই অস্থির ও পিপাসিত পাথরটির নিচে সাদা কি যেন। পুরুষরা প্রেতভয়ে দৌড় মারে, কিন্তু ঝালো হনহন করে এগিয়ে যায়,

টিলায় ওঠে, এবং আর্ত হাহাকারে প্রান্তরের প্রত্যেকটি সুষুপ্ত মনোলিথের ঘুম ও কৌতূহলী করে তোলে। মূল ভূগর্ভে প্রোথিত না থাকলে তারাও ছুটে এসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারা মতে কাল-পেব্‌ল হমিসাইড অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার-এর কেসটি দেখত।

এতোয়া পড়তে চেয়েছিল বলে তার লেখার আঙুল, তর্জনী ও বুড়ো আঙুল কেউ কেটে নেয়। রক্তপাতের ফলে মৃত্যু।

পুলিস কেস। কুন্দনই অপরাধী গ্রেপ্তারে আগ্রহী। অজ্ঞাত কারণে অজানা আততায়ী কর্তৃক···তদন্ত চলিতেছে ইত্যাদি।

ঝালো কাঁদে না ও গুম্ মেরে থাকে। তারপর শ্মশান থেকে ফিরে এসে ছেলেমেয়েকে নিয়ে গঞ্জু টোলি চলে যায় প্রথমে। আবার শ্মশানে যায়। খুবই অসংলগ্ন আচরণ। তারপর গ্রামে ফেরে। ওর অস্বাভাবিক চলাফেরা দেখে কৌতূহলী হয়ে গঞ্জুস্ত্রী-পুরুষ-ছেলে-মেয়ে একটু তফাত রেখে ওর পেছন-পেছন অনুসরণ করে। এতোয়ার মৃত্যুর ফলে গ্রামে একটা অস্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু, আরো আরো অস্বাভাবিক সোশ্যাল অথবা অ্যান্টিসোশ্যাল কন্‌ডাক্‌ট অ্যাকটিভেট করে। মিশ্রবাড়ির পাইক-পেয়াদাও নির্বীর্য দর্শক হয়ে দেখে যায়। ঝালো তার শুকনো লাল চোখ, ভীষণ মুখ নিয়ে কুন্দনের বাড়ির কাছারি ঘরে ঢোকে ও এক মুঠো ছাই কুন্দনের মুখে ছুঁড়ে মারে। বলে, তোর বেটার ছাই। ছেলেকে মেরে ল্যাংটো হয়ে দাইয়ের কাছে স্নান করে গদিতে বসেছিস? মাথা কামাবি না? অশৌচ করবি না? না করলি, তোকে নির্বংশ করব, তুই নির্বংশ হবি।

গঞ্জুর শবদাহের ছাই দিয়ে ব্রাহ্মণের ঘর অপবিত্র করে সে হন্‌হন্‌ করে চলে যায় ও মুখ ফিরিয়ে বলে যায়, নির্বংশ হ'বি। কুষ্ঠ হয়ে পচে মরবি। নিজের ছেলে খেয়ে গোরক্ত খেয়েছিস।

এর রিপারকেশনে কুন্দন ফার্দার প্রতিশোধ নেয় না এবং হনুমান মিশ্র ঘোষণা করেন, মনোলিথটি এখন স্থির হবে। অচ্ছুত জাতের নিষ্পাপ বালকের রক্ত হল শুদ্ধতম রক্ত। তাতে মনোলিথ বা মানবগঠিত প্রতিমা বা সেতু-বাঁধা পড়তে অনিচ্ছুক নদী, সকলেই তৃপ্ত ও শান্ত হয়।

কিন্তু পাথরকে রক্ত খাওয়ানো ঠিক নয়। একবার স্বাদ পেলে বাঘের মতই পাথরও রক্ত খেতে চায়। মানুষের। যোগাড় করে। বাঘ পাউনস্ করতে পারে। পাথর মানুষকে তাইয়ে তাইয়ে স্ব-কাজ হাসিল করে নেয়।

যেহেতু ঝুঝার ও টাহাড়ের দুটি ঘটনাই সময়ের কারেণ্টে নিক্ষিপ্ত ডাইনামাইট চার্জার, সেহেতু সময়ের নিম্ন স্তরে বহু ক্রস্‌কারেণ্ট বইতে থাকে। যেহেতু সত্তরের দশক পৌঁছে যায় ও তিন বছরেরটি হয়, সেহেতু ঘটনাবলীও নব নব রূপে বিভাসিত, বিকশিত হয়।

বুরুডিহার পর জঙ্গল। জঙ্গলের পুবে কেনান্‌দ্রা গ্রাম ও পাহাড়। প্রতি দীপাবলীতে আদিবাসীরা তাদের নিঃশেষিত সত্তা নিয়ে প্রেত তাড়নার উৎসব করে। এ দিনে কেনান্‌দ্রা পাহাড়ের ওপর চ্যাটাল প্রশস্ত পাথুরে প্রান্তে মেলা হয়। আদিবাসীরা প্রেত-প্রতিভূ ধ্বজাগুলি আনে। পাথরের ফাঁকে গোঁজে। তারপর একটি শুওরছানাকে খড়ের দড়িতে বেঁধে ক্ষেত্রপাল দেবতা ও সূর্যদেবের উদ্দেশে নিবেদন করে ছুটে যায় পাহাডের কিনারে। নিচে, অনেক নিচে একটি বিশাল পাথর। যেন কাছিমের পিঠ। ওটি সমবচ্ছর পাথরই থাকে। কিন্তু এই সকালে হয়ে যায় ক্ষেত্রপালদেব ও সূর্যদেবের প্রতিভূ। প্রতিভূ হয়ে পাথরটি বলি নেয়।

তিয়াত্তর সালের মধ্যে এইসব জায়গা ও জীবনে পুলিস ঢুকে পড়ে। ব্যাপারটি খুবই বিপ্রতীপ বলতে হবে। কেন না অঞ্চলটি এমন যে, সেখানে টাইম, স্পীড-মোশন ইত্যাদি কথার কোন মানে দাঁড়ায় না। প্রান্তর-পাহাড়-গাছ-বন-আদিবাসীদের অন্নের বা ঘাটোর তরে আদিম সংগ্রাম—পাথরের পাহারা। পথ বলতে কয়েকটি বাসপথ। নইলে সব পথই পায়ে চলা পথ। গ্রামগুলি এত জনবিরল, এত দূরে দূরে যে চতুর্দিকে নৈঃশব্দ্য আর নৈঃশব্দ্য। 'সময়' শব্দটি এখানে এসে থেমে গেছে। সকাল নয়টা বাজল, না দুপুর দুটো—সন্ধে সাতটা না রাত দশটা, সব চিন্তার মানে যেন এখানে বাস করলে হারিয়ে যায়। জীবন-মানুষ-প্রকৃতি সব কিছুই আদিম চেহারায় থেকে গেছে এখানে।

পুলিস হল একেবারেই মানব-সৃষ্ট ব্যাপার। এ হেন পরিবেশে বুট-উর্দি-হেলমেট-বন্দুক সংবলিত পুলিস ঢুকে পড়ে এবং উগ্রপন্থী পলাতকদের উদ্দেশ্যে গ্রাম-কে-গ্রাম তছনছ করতে থাকে। চলতে থাকে। চলতেই থাকে কুম্‌বিং অপারেশন। কারণ নানাবিধ। সত্তর-একাত্তরের সুবিধে নিয়ে জোতদার মহাজনের অত্যাচার চরমে ওঠে, প্রশাসনের চোখে জোতদার-মহাজন অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হয়ে ওঠে। আর্গুমেন্ট: কেন? উগ্রপন্থীদের টার্গেট কি জোতদারী ও মহাজনী কারবার নয়? যুক্তিটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য। ফলে পুলিস জোতদার-মহাজনকে হেভি মদত দেয়। জোতদার-মহাজন অত্যাচার করবে। বেঠবেগারী নেবে, দেউলে করে ছেড়ে দেবে, এ আদিবাসীদের জীবনে নতুন ব্যাপার নয়। এসব তারা ন্যায্য ও প্রচলিত পাওনা হিসেবেই ধরে নেয়। কিন্তু সত্তর-একাত্তরে অত্যাচার ও শোষণ মাত্রা ছাড়ায়। ফলে স্পোরেডিকালি জোতদার-মহাজন কাটা পড়ে, বন্দুকবাজদের বন্দুক ছিনতাই হয় এবং বন্দুক ছিনতাইয়ের সঙ্গে নকশালীদের জোড়া যায় না। কেন না বহু ক্ষেত্রে বন্দুকটি ভেঙে টুকরো করে ফেলে রেখে যায় ছিনতাই পার্টি। ফলে খোঁচোড়রা ব্যথা পায়। এ কি জঙ্গুলে উজবুকী? বন্দুক ভাঙলি কেন? বন্দুকের সেলিং ভ্যালু প্রচুর। আবার কুম্‌বিং চলে। ক্রমে ক্রমে চারপাশের স্পোরেডিক ঘটনাসমূহ বুকডিহার আশপাশে আদিবাসী-মানসিকতায় একটা আশ্চর্য উপলব্ধি ঘটায়। তারা বোঝে জোতদার ও মহাজনও গলা কাটলে মরে যায়, ভয় পায়।

তারা কথা বলে। গোপনে, অন্ধকারের ভাষায়। এখন মনের ব্যাক গ্রাউণ্ডে বুড়োবুড়ির কাছে শোনা কোল বিদ্রোহ, খেরোয়ার বিদ্রোহ, হুল, উলগুলানী বিরসা মুণ্ডা, এসব গল্পগুলি যেন সত্য হয়ে ওঠে। রেজাল্ট গোলবদন সাহু।

গোলবদন সাহু বড় মহাজন। কেনান্দ্রা-কেন্দ্রিক সকল ভূসম্পত্তি সে বছরভোর বণ্ডেড লেবার দিয়ে চাষ করায়। কিন্তু সে কারণে তার মৃত্যু ঘটে না।

এবার ১৯৭৭ সালের অঘ্রাণে সে হঠাৎ ভালাতোড় থানা ও রামগড়

আর্মি ক্যাম্পের সহায়তায় কেনানদ্রায় একটি পুলিস ও সেনা ঘাঁটি খোলার অফার দেয়। বণ্ডেড লেবাররা জানতে পারে না প্রথমে কেন তারা জঙ্গল কেটে সাফ করছে, ঘরের পর ঘর তুলছে, পথ তৈরি করছে, কুয়ো কাটছে।

তারপর থানা-দারোগা ও আর্মি-অফিসার সরেজমিনে দেখতে আসেন ব্যবস্থাপনা। দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট হন ও যেসব কথাবার্তা বলেন, তা জনৈক পোরম ওঁরাও ভার্বেটিম রিপোর্ট করে।

—ব্যবস্থা তো জবর। কিন্তু মদ ?

—বার খুলে দেব।

—রাণ্ডী পট্টি খুলতেন যদি একটা……

—এদের মেয়েছেলেরা আছে। দেখুন সেণ্টার খুললে খরচ আছে। সে আমরা ওদের ঘাড় দিয়ে তুলে নেব। এখানে একটা সেণ্টার হলে আমার মত সব মহাজন বাঁচে। কিছু হলে ভালাতোড থানা ছাড়া উপায় নেই।

আদিবাসীরা সব জানে। অতঃপর সব ভেবেচিন্তে ওরা কয়েকটি হাটবারে, গোলবদনের খাতক অন্য গ্রামীণদের সঙ্গে কথা বলে নেয়। স্থির হয়, পরবের দিনে গোলবদন সাহুকে নেমন্তন্ন করবে ওরা।

গোলবদন নেমন্তন্ন পেয়ে খুশিই হয়। এতে বোঝাই যাচ্ছে, ওরা কিছুই জানে না। এও বোঝা যাচ্ছে, ওরা গোলবদনকে বিশ্বাস করে। গোলবদনেরও ইচ্ছে, ওদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। ও হেসে বলে, যাব, যাব। মেলা দেখে, পূজা দেখে চলে আসব। তোরা নেশা করবি ত ? যাঃ, সেদিনকার তরে আমি তোদের এক পিপা মদ দিব। কাঠের পিপা, সিপাহীদের রাম্। অমন জিনিস তোরা খাস নাই।

কেনান্দ্রা পাহাড়ের ওপরে দেয়ালীর সুন্দর সকালে দশটা নাগাদ বহু গ্রামের নরনারী শিশু বালক বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরিষ্কার কাপড় পরে প্রেতনিশানী ধ্বজা নিয়ে আসে। প্রচুর মদ খায় তারা, ভীষণ প্রতিজ্ঞায় কঠোর মুখে সূর্য পানে লাফ মেরে মেরে নাচে, ধ্বজাগুলি

কাটে স্পেশাল হিংস্র কোপে। এর পর জনৈক পহানের ওপর ভর-হওয়া ও বলিদান বাকি থাকে।

ভর হয়। জনৈক জীর্ণ ও শীর্ণ বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে হাত তুলে চুপ করে থাকে ও দুলতে থাকে। গোলবদন সাহু বলে, লেঃ বাবা, এলাম, পূজা দেখলাম, এবার তো তোরা শুওর বলি দিবি ? ওটা আর নাই দেখলাম।

খাতকরা আর্মি রাম্ পিয়ে মাতাল আনন্দে ঘেঁষে আসে ও কথা বলে না। গোলবদনকে কর্ডন করে।

লেঃ, সর্ তোরা······

গোলবদনের কথা শেষ হতে পায় না। পহানটি আকাশ থেকে কোন নির্দেশ পায় ও চীৎকার করে। রাহো রাহো রা······হো বলে পাথর থেকে নামে। হতচকিত গোলবদনকে সবাই চেপে ধরে, ল্যাংটা করে। খড়ের দড়িতে তাকে পেঁচিয়ে বাঁধে, মাথায় মদ ঢালে, কপালে সিঁদুর দেয়। তারপর তাকে শূন্যে তুলে ধরে পাহাড়ের কিনারে চলে যায়। পহান চেঁচিয়ে বলে, সূর্যদেব ! ক্ষেত্রপাল ! এবার বড় বলি এনেছি হে, বড় বলি।

গোলবদনকে তারা সূর্য পানে ছুঁড়ে দেয়। নিচে পাথরটি সাগ্রহে অপেক্ষা করে। ধপ্। একটা ভীষণ শব্দ। সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখে। গোলবদনের চাকর ছুটে পালায়।

যে আর্মি ও পুলিস ঢুকে পড়বে জীবনে বলে আদিবাসীদের ভয়, সেই আর্মি, সেই পুলিস, পহান এবং যে ছয়জন গোলবদনকে ধরে তুলেছিল তাদের খোঁজে গ্রাম-কে-গ্রাম চাষ করে, ঘর মাড়ায়, পিটুনি খাজনা বসায়, যুবতীদের রাণ্ডী করে ছাড়ে।

সাতজন ওঁরাও পালায়, শুধু পালায়। কেনান্দ্রা-কেন্দ্রিক জঙ্গলকেই তাদের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বলে মনে হয়। পহান বলে, জল আছে। চল খুঁজে নিব।

কোথায় ?

—জঙ্গলের ভিতর।

জঙ্গলের মধ্যে কোথাও জলাশয় আছে জেনে তারা ছুটতে থাকে ও

অন্ধকারে কুলুকুলু শুনে বোঝে ঝর্ণা কাছে। জল অবধি পৌঁছে ওরা নিচু হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জল খেতে এবং তখনি শোনে ক্রুদ্ধ ফোঁস-ফোঁস। মাথা তুলে দেখে জলপান নিরত একটি হাতি।

হাঁথি, হাঁথি।

ভীষণ ভয়ে জল না খেয়ে ওরা ওঠে ও তখনি শোনে—ডরো মৎ। হাঁথি কুছু করবে না। জগমোহন। উ লোক ভি জল পিবে। হটকে আও ভৈয়া !

মানুষী কণ্ঠস্বরে পলাতকরা আরো ভয় পায় এবং হাঁচড়ে পাঁচড়ে জল থেকে উঠে ছুটতে থাকে। বুলাকি খুব অবাক হয়। জগমোহনকে শান্ত করে এবং ভাবতে চেষ্টা করে ব্যাপারটি কি ঘটল। রাত ঘনালে আদিবাসী লোক জঙ্গল দিয়ে শর্টকাট করতে পারে। কিন্তু তাদের হাতে লণ্ঠন, গলায় কথাবার্তা থাকবে। নয়তো গান। এরকম নিশ্চুপে ওরা এল কেন, এবং বুলাকির গলা শুনে ভয় পেল কেন ?

সকাল হতে বুলাকি গাছে চড়ে ও দূরে বুরুডিহা গ্রামের শিবমন্দিরের ধ্বজা দেখে সেখানে যাবে বলে ঠিক করে।

কিন্তু সকালে সে দেখে পুলিস। • জঙ্গলে পুলিস দেখে সে ঘাবড়ে যায় এবং পুলিসরাও তাকে দেখে ঘাবড়ায়।

—তুমি কে ?

—বনারসের মোহান্তের মাহুত। এ হাঁথি ভি মোহান্ত মহারাজের।

—সরকারী বনে ঢুকেছ কেন ?

—জানি না হুজুর।

– সাতটা ওঁরাওকে দেখেছ ?

মনের মধ্যে বিপদের সংকেত। বুলাকি বোঝে সে বিপন্ন এখন।

—না হুজুর।

—ঠিক বলছ ?

—ঠিক বলছি। মোহান্তের হাঁথি নিয়ে আমি তো কতদিন থেকে বনে-জঙ্গলে ঘুরি, সবাই জানে। মিছে কেন বলব ?

—নিকাল যাও জঙ্গল সে।

বুলাকি অত্যন্ত ভয় পায় ও "কোমাণ্ডি কোমাণ্ডি জগমোহন।" বলে বুরুডিহা পিছনে রেখে চলে যায়। এ ভাবেই সে তৃতীয় সিগনিফিকেন্ট ঘটনাটির আওতায় আসে। সে ও জগমোহন। এবং এ ভাবেই মানুষ সৃষ্ট পুলিস ও পলাতকের ঘটনাটি পিছনে ফেলে আবার কোনো ডেসটিনেশনে রওনা হয়। বুরুডিহা ও জগমোহনের যোগাযোগ এবারও ঘটে না।

সাতজন ওঁরাও পালায়, শুধু পালায়। পাঁচদিন বাদে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত, তাড়িত সন্ধ্যার মুখে ঢুকে পড়ে বুরুডিহা। ভয়ে নিঃসাড়ে থাকে ও রাত হলে গ্রামে ঢুকে জল খোঁজে। যেহেতু লালাদের সঙ্গে গোল-বদনের দীর্ঘকালীন শত্রুতা ও বিবিধ দীর্ঘ মেয়াদী মোকদ্দমা, সেহেতু বুরুডিহাকে মনে হয় নিরাপদ। তারা সোমরা গঞ্জুকে ডেকে তোলে ও জল চায়। সোমরা কলসীতে লাথি মেরে দেখে জল নেই। সে বলে, দড়ি ও কলসি নিচ্ছি। চল, জল দিব।

ও পলাতকদের হনুমান মিশ্রের শিবমন্দিরের সামনে আনে। কিন্তু সভয়ে পহান চেঁচিয়ে ওঠে, দেওতার কুয়া। আমরা ছুঁব না।

চুপ চুপ!

না, তু জল এনে দে।

আরে আমি তো গঞ্জু আছি।

আমরা ছুঁব না।

জল চুরায়ে খাবি, ডর কি?

না।

কথাবার্তা শুনে মিশ্রজী বেরিয়ে আসেন। ওদের ডাকেন। বসতে বলেন। স্বহস্তে জল তুলে ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওদের আঁজলায় ঢেলে দেন। তারপর বলেন, রাতে জঙ্গলে লুকিয়ে থাক্‌গে। ভোরে পালাস।

রাতেই তিনি থানায় খবর দেন, এমার্জেন্সী আউটপোস্টে। বলেন, খুব জল খেয়েছে। পালাতে পারবে না। নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে।

দেওতার কথা মিথ্যে হয় না। তারা ধরা পড়ে। হনুমান মিশ্রের আন্তরিক চেষ্টাতেও ওদের সঙ্গে সোমরাকে জোড়া যায় না। তবে

অচ্ছুত হয়ে মন্দিরের কুয়োর জল চুরি করার ইচ্ছে হয়েছিল বলে দারোগা সোম্‌রাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন।

এর পর, মাঘ মাসে শিবরাত্রির প্রসাদ নিতে সোম্‌রা অস্বীকার করে ও মৌয়া খেয়ে চেঁচিয়ে বলে, ব্রাহ্মণ। দেওতা! আশ্রয় নিচ্ছিল ওরা মন্দিরে? ধরিয়ে দিলেন? এটা দেওতার কাজ হল?

হনুমান মিশ্রের কানে কথাগুলি যায়। তিনি রাগে গুমরে থাকেন। লালাদের বলেন, ছোট জাতের জমি মন্দিরের বগলে। তার হাতে আদালতের কাগজ! ওকে না উঠালে আমার শান্তি হবে না।

লালাদের কিছু করার থাকে না। মাকে কথা দেওয়া আছে।

জরুরী অবস্থার সময়টি ভাল ছিল। তখন সোম্‌রাকে জমি থেকে ঠেঙিয়ে তোলা যেত। কিন্তু এ বৎসরাধিক কাল, আর্মির কন্ট্রাক্টরী পাওয়ার ফলে মিশ্রজী রামগড ও রাঁচিতে কাটান। জরুরী অবস্থা যায়। ভারতের মুক্তিসূর্যকে রাজনারায়ণ হোম-কনস্টিটিউয়েনসিতে ল্যাং মেরে ফেলে দেন। হঠাৎ হনুমান মিশ্রের মাথা থেকে হাত, পায়ের নিচ থেকে মেঝে সরে যায়। নতুন সরকার আসে। পুরনো প্রশাসনিক লোকজন প্রথম কয় দিন বোঝে না কি হল। কিন্তু হঠাৎ সবাই ঘাবড়ে যায়। কেন না জেলার কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে ভালাতোড় থানার ও. সি. অবধি সবাই বদলী হতে থাকেন। এ রকম সামারি ট্রানস্‌ফারে থানা-বি. ডি. ও. আপিস-কৃষি আপিস—সব জায়গার লোকজন আতান্তরে পড়েন। ব্রিজভূষণ ছত্রী অবধি ঘাবড়ে যায়, কেন না হঠাৎ বেছে বেছে তপসিলী জাতের একজন এ সব বেল্‌টে আসতে থাকে। স্কুল-ইনস্‌পেক্টর ব্রিজভূষণকে বলে যান, আদিবাসী ও তপসিলী বেল্‌টে আদিবাসী ও তপসিলী ছেলেমেয়ে যদি স্কুলে না আসে, তবে স্কুলের পার্পাস ব্যর্থ। সরকার এ্যায়সা স্কুল নহী রাখেগি। বুঝলেন?

— আমাদের ছেলেমেয়েরা?

—আপনি হলেন সুপারম্যান। তিন গাঁয়ে তিন বউ, এগারোটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে। আপনার ছেলেমেয়ে তো পড়বেই। তা বলে লোয়ার কাস্ট, ট্রাইবাল ছেলেমেয়ের নাম স্কুল রোলে থাকতে পারে না?

—এ কি বলছেন ?

—পছন্দ না হয়, সরকারকে বলে আপার কাস্টের জন্যে স্কুল বানিয়ে নিন। আমার আণ্ডারে যে সব স্কুল, তাতে আমি ওদের নাম দেখতে চাই। নইলে আমার চাকরি চলে যাবে। আপনার জন্যে আমি চাকরি খোয়াব ?

—ওরা স্কুলে এলেই পারে ?

—আপনি আর আপনার দেওতা থাকতে ? এতোয়া গঞ্জুর কথা সবাই ভুলে গেছে ?

—এ দেখিয়ে ! উস্‌মে মুঝকো ফাঁসানা নহীঁ।

—যা বলবার বলে গেলাম। আপনার অনেক ফল-দুধ-ঘি খেয়েছি। ভাল কথা বলে গেলাম।

—আপনিও বদলী হচ্ছেন ?

—হতে কতক্ষণ ? নয়া এম. এল. এ, নয়া এম. পি। এদের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন বের করবার টাইমই দিচ্ছে না। খচড়াই হয়ে গেল।

—তাহলে ?

—আসবে, লাইনে আসবে। তবে টাইম নেবে তো ? জনতাকে ভালো করব বাতিক কদ্দিনে যায়, সেই বুঝে লাইন লাগাব। আপনার ভালাতোড় থানা, আপনার শ্বশুরাল তো গেল। সব নতুন লোক। পুরা খচড়াই।

—অফিসার ?

—য়ো ভি। থানা অফিসার যখন লালাদের ফলের ভেট ফেরত দেয়, তখন জানবেন লক্ষণ খুব খারাপ। খু—ব খারাপ।

ক্রমে দেখা যায় খুব ডামাডোল। এমন কি মিশ্রজীর ফল বাগিচার ওপর বকেয়া খাজনা বসে যায়। বি. ডি. ও. বুরুডিহার গঞ্জুদের যাতে রাস্তা তৈরির কাজে লেবর নেওয়া হয় সে জন্যে চাপ দেয়। ফলে গঞ্জুদের মনে অহৈতুকী ভরসা জাগে, তাদের তরেও রাজ আয়া হ্যায়।

এ সময়ে হনুমান মিশ্রেরও মাথা খারাপ হয়। এখন ডবল ফ্যানাটিক

হয়ে তিনি ডিকলেয়ার করেন, যা হচ্ছে সব ঝুট। কলির খেলা। ঈশ্বরের সেওয়া যদি তিনি শুদ্ধাচারে করে থাকেন, তবে সত্যের জয় হবে।

এ কথা বলে তিনি হঠাৎ বলেন, সোম্‌রাকে ও জমি ছাড়তে হবে। মন্দিরের আওতায় গঞ্জুর ঘর থাকবে না।

সোম্‌রা খুবই ঘাবড়ায় এবং বি. ডি. বাবুর কাছে চলে যায়। নতুন বি. ডি. ছোকরা। তিনি সোম্‌রার কেসটি শুনে বলেন, কাগজপত্র থাকলে তোমায় ওঠায় কে?

—মিশ্রজী।

—না না। তিনি মহাত্‌মা।

—তবে আমার জমির ওপর রোখ কেন?

—রোখ হলেই কি জমি নেওয়া যায়?

—যদি…

—কি?

—বেড়া উপড়ে নিয়ে নেন।

—আদালতে যাবে।

সোম্‌রার বুকে উডন্ত পরীর উল্‌কি আঁকা হলে কি হয়, তার কমন-সেন্‌স ভূ-প্রোথিত। সে বলে, গঞ্জু লোক মামলা করতে পারে?

বি. ডি. তার কেসে আগ্রহী হন এবং বলেন, তোমার কথা যে সত্যি, তার প্রমাণ কি?

পথে লেবর-দাতা বুরুডিহাই গঞ্জুরা সানন্দে কাজ ছেড়ে বিড়ি ধরিয়ে এসে বসে এবং খুব বিশদ করে বুঝিয়ে দেয়, মিশ্রজী দীর্ঘকাল ধরে সোম্‌রার জমি নিতে চাইছেন। কিনতে চাইছেন না, নিতে চাইছেন।

—সে কি?

—সাচ বাত হুজুর।

সোম্‌রার কেসটি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসারকেও জানানো হয়। গঞ্জুও এক ট্রাইব। অফিসার বলেন, আমি থানাকে বলে দেব। তুমি কোন অন্যায় ঘটলে সুবিচার পাবে।

থানা অফিসার বলেন, নিশ্চয় পাবে। জোর করে জমি নিলে তা

হবে সাব্-পোলিস ম্যাটার। এখন সরকার খুব কড়া। হরিজনদের ব্যাপারে……তুমি কি হরিজন?

—হাঁ হুজুর।

—ট্রাইবাল না?

—হাঁ হুজুর।

—জাতে গঞ্জু তো?

—হাঁ হুজুর।

—সে কি?

—কাঁয় নই হুজুর? গঞ্জু আমি, সবাই জানে গঞ্জু অছুত। যাকে কেউ ছোঁয় না সে যদি হরিজন হয়, তবে আমি গঞ্জু ভি হলাম, হরিজন ভি হলাম। য়ো মোচবালা অপ্সার, টাইবল অপ্সর বললেন, গঞ্জু লোকের নাম ওঁদের রেকডে আছে। তা হলে দেখুন না কেন, আমি টাইব ভি হলাম।

—ওফ্। কি কাণ্ড!

—কি করব হুজুর? দেওতা খেপে গেছে। আঁখ মোটা করে ঘুরাচ্ছে। ধুন্চি নিয়ে নাচছে আর বলছে সাত দিনে ধরমরাজ কারেম হবে। উনি আমার জমি লিবে।

—নিলেই হল? আদালত নেই?

—কেস-মামলা গঞ্জু করে না।

—সরকার তোমাদের উকিল দেবে

—অ্যাঁ?

—উকিল, উকিল, মামলাতদার।

—তবে ভয় নেই হুজুর??

—না।

—দেওতাকে দেখলে যে ডর উঠে যাঃ? উনি সকল সময়ে শিবকে ডাকছেন।

—তা তো ডাকবেনই।

—আপনি জানেন না হুজুর। দেওতায় চাচেরা ভাই কুন্দন, তার গঞ্জু ছেলে এতোয়াকে···

—জানি জানি। যা তোমার এক্তিয়ারে নয়, তা নিয়ে বোক না। পুলিস আছে, থানা আছে, অপ.সার আছে কেন?

সোম্‌রার মুখে এল 'ঘুষ খেতে আর গরিবকে ঠ্যাঙাতে'। কিন্তু সে তা বলল না। বলল, দেওতা আমার জমি নেবে না তো?

—না, না, না।

সোম্‌রা এরপর টাহাড়ে গেল। মেয়ের বাড়ি। ওর জামাই গঞ্জু কম্যুনিটিতে এলেমদার যুবক। স্থানীয় জন্‌তা এম. এল. এ-কে ভালভাবে চেনে, এমন এক কন্ট্রাক্টরের মাল পাহারা দেবার কাজ পেয়েছে ভালাতোড়ে।

সে শ্বশুরের কেসটি মন দিয়ে শুনল এবং বলল, আমার ঘর টাহাড়। ও জমি নিয়ে আমার মোটা ফয়দা নেই কিছু। তব ভি আপনার হকের জমি কোই বাস্তোন-উস্তোনকে নিতে দিব না। বাস্তোনের খেলা অনেক হয়েছে এতদিন। এখন জন্‌তা রাজ বলছে, আমাদের সওয়াল ভি শুনবে।

কার্যকালে দেখা যায় এম. এল. এ. নিজেও তপসিলী। তিনি মন দিয়ে শোনেন ও সোম্‌রাকে বলেন, আগে আমার জান নেবে, পরে তোমার জমি। ও অঞ্চল মিশ্র পরিবারের থাবা হতে ছাড়াতে হবে। শুধু কি তুমি? এমন শত শত গঞ্জু···

এবারে সোম্‌রাকেই এম. এল. এ. এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়ে দেন এবং আশ্বস্ত করে ফেরত পাঠান। এতে সোম্‌রার বুকের পরীর ডানায় বাতাস লাগে। সে ঘরে ফেরে।

এখনো উৎসাহী আছেন বলে এম. এল. এ. হিআরসে বা জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে ঝুঝারের বালকৃষ্ণ মাস্টারের মৃত্যু, টাহাড়ের এতোয়ার মৃত্যু, দুটিকে যোগ করেন। উত্তর দাঁড়ায় গোলবদন সাহুর মৃত্যু।

এম. এল. এ. নিজে একবার অঞ্চলটিতে ভ্রমণে যান এবং জীপ যোগে ঝটিকা ভ্রমণের মাঝেই বুরুডিহার হনুমান মিশ্রকে দেখে আসেন। ঋষি-প্রতিম, নেড়া মাথা, বলিষ্ঠকায় মিশ্রজীকে দেখে তিনি বোঝেন ভেতর-

ভেতর ভয় ধরছে। তাই গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি হাটে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে, বর্তমান সরকারের অস্পৃশ্য, তপাসলী ও আদিবাসী-বিষয়ক নীতিটি ব্যাখ্যা না করে ভরসা দেন। ইচ্ছে করে সোম্‌রার জমিটিতে গিয়ে দাঁড়ান ও বলেন, সরকার এখন গঞ্জু বা দুসাদ বা রবিদাসের উপর অত্যাচার ঘটলে মাপ করবে না কারুকে। তোমার জমি কেউ নিতে পারবে না, নিশ্চিন্ত থাকো।

হনুমান মিশ্র মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শোনেন।

ক্রমে অক্টোবর আসে। সাতাত্তরের অক্টোবর। এ বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল হঠাৎ আশ্বিনের গোড়ায়। ফলে এখনি বাতাসে হিম। সোম্‌রা এবার ভাল ভুট্টা পেয়েছে। ভুট্টা দানা বোরায় ভরে রেখেছে। বেশ কিছুদিন দেওতার দিক থেকে কোন উৎপাত নেই। সোম্‌রা এক সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ঘাটো খেল ও ঘুমোবে বলে মাচাঙে চট পেতে, দোরগোড়ায় বসে বিড়ি ধরাল !

—সোম্‌রা !

সোম্‌রা চমকে মাথা তুলল। অদূরে, আধো আঁধারে মিশ্রজী।

—দেওতা ! গোড় লাগে দেওতা !

সোম্‌রা মাটিতে প্রণাম ঠুকে উঠে দাঁড়াল। দেওতার চেহারা, মুখের চেহারা খুব অচেনা। গলার স্বরেও দীন আকুতি।

—তুই আমাকে জমিটা দিয়ে দে সোম্‌রা। আমি তোর কাছে দেওতার নামে চাইছি।

—দেওতা !

—আমি দেওতা নই, সোম্‌রা। আমি সামান্য মানুষ। দেওতা হলে বাগিচায় খাজনা বসে ? কণ্টাক্টরী ছুটে যায় ? মেয়ে বিধবা হয় ?

—আমি কি করব দেওতা ?

—দেওতা আমি নই। ওই মন্দিরে যিনি, তিনিই দেওতা। তাঁর নাম করে আমি চাইছি, জমিটা তুই দিয়ে দে। আমার ইজ্জত বাঁচা।

—আপনার ইজ্জত ? আমি বাঁচাব ?

—দিয়ে দে।

—হম কা খায়গা ?

—তোকে রোজ পরসাদ ভেজে দেব। তোর নাম থেকে যাবে সবাই নাম উঠাবে।

—আমি···আমি কিছু বলতে পারব না। আমার জামাইকে না শুধায়ে···

—দিবি না ?

সোম্‌রা সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলল, জমি দিলে ঔর ঔর গঞ্জু লোক আমাকে মারবে, মেরে ফেলবে। এতোয়াকে লিয়ে সব কোই কো মনে দাগা আভিতক গহ্‌রি হ্যায়। আপনি জানতেন সব, তব ভি কুছু বললেন না। মন্দিরে যো বাত উঠালেন···মায়ের ত্বলার, ত্বধের ছেলে মরে গেল···

হনুমান মিশ্র অপ্রকৃতিস্থ গলায় তীক্ষ্ণ স্বরে হাসলেন। বললেন, তুই মানিস না আমি দিব্যচোখে সব দেখতে পাই ?

—হম্ কা জানে দেওতা ?

—সব দেখতে পাই। এই জমি সব ছেড়ে দিয়ে তোকে কুত্তার মত পালাতে হবে।

গভীর অস্বস্তি বুকে নিয়ে সোম্‌রা ঘুমোতে গেল। এর কয়েক দিন বাদেই বুলাকি ও জগমোহন বুরুডিহার জঙ্গলে ঢুকল।

তিন

বুলাকি ও জগমোহন জঙ্গলে ঢোকে সন্ধ্যাবেলা। জঙ্গলের পুবদিকে একটা বটগাছ আছে, বুলাকি পথেই জেনে এসেছে। জঙ্গলে ঢুকে বুলাকি জগমোহনকে সেদিক পানে নিয়ে যেতে থাকে।

জগমোহন হঠাৎ দাঁড়াল। থরথর করে কাঁপতে থাকল ওর শরীর।

বুলাকির মনের নিচে অজানা ভয়। সব যেন অশুভ। জগমোহন দাঁড়াল কেন ? দাঁড়াল যদি, তবে কাঁপল কেন ? সে জগ্‌মোহনকে

বলল,— কোমাণ্ডি কোমাণ্ডি জগ্‌মোহন। ভুরকুণ্ডা বেট। হেহেগড়া হেহেগড়া মেরে লাল।

জগমোহনের কাঁপুনি থেমে গেল। সে আবার চলতে থাকল। অন্ধকার বন। যেন অলৌকিক ক্ষমতায় পথ জেনে জগমোহন বট-গাছটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মাটির ধস্ নামার মত নিঃশব্দে ও নিঃশেষে বসে পড়ল।

বুলাকি দেখল দূরে টিমটিমে আলো। ওটাই তাহলে জঙ্গলের আঁচল কেড়ে নিয়ে বসতি-বাঁধা গঞ্জুটোলি।

বুলাকি বটপাতা ভাঙল। জগমোহনের সামনে রাখল। তারপর গঞ্জুটোলিতে গেল। জল চাই একটু জল।

গঞ্জুটোলির লোকজন খুবই অবাক হল। বুড়ো পারশ গঞ্জু বলল, তোমাকে তো আমি দেখেছি। রামগড়ে।

—জল কই? জল পাব?

—খাও না।

—আমার জন্যে নয়। হাতির জন্যে…

—হাতি কোথায়?

—বটগাছের কাছে।

—সেখানেই তো জল পাবে। এবারে হঠাৎ যে বৃষ্টিটা হয়ে গেল, ওখানেই তো।

বুলাকির মুখ সাদা হয়ে গেল ভয়ে। জলের কাছে এসেও জগমোহন জলের অস্তিত্ব টের পেল না কেন? তখন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁপল কেন? বসবার সময় যেন ধসে পড়ল নিঃশেষে, এমন করে বসল কেন?

পারশ গঞ্জু বলল, চল, বাতি নিয়ে যাচ্ছি আমি। তোমার মুখ ভয়ে সাদা দেখায় কেন? কোন ভয় নেই ওখানে।

মাটির কমণ্ডলুতে বাতি বসিয়ে পারশ আগে আগে এল, পেছনে বুলাকি। পারশ বলল, ওই তো, তোমার হাতি জলের কাছে চলে গেছে। কিন্তু জল খাচ্ছে না তো?

মাটির ঢাল। পাথরের বুকে জল। কিন্তু জগমোহন স্থির ও অনড়।

বুলাকির বুকের নিচে অসহ্য চাপ। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট।

জগমোহন! পানি, পানি জগমোহন! যা, আগা, জুজুভাতু, জুজু-ভাতু জগমোহন! কোমাণ্ডি। কোমাণ্ডি। জল খা!

জগমোহন যেন চিন্তার সমাধি থেকে নড়ে চড়ে জেগে উঠল ও মাথা ঘোরাল। শুঁড় বাড়িয়ে সহসা ও বুলাকির মাথা ও কাঁধে বোলাল তারপর আস্তে, ধসের মত বসে পড়ল। তারপর শুয়ে পড়ল। পারশ গঞ্জু অসীম কৌতূহলে বাতি নিয়ে একটু এগোল ও বলল, তোমার হাতি কাঁদছে হে। চোখে জল। শুঁড়ের ফুকর হতে দেহবাসী পোকা বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার হাতি মরে যাচ্ছে।

পারশের কথা যেন বুলেট। বুলাকি বুঝল, তার ফুসফুসে রক্তাক্ত ফেনা। সে জগমোহনের মাথার কাছে বসে পড়ল। জগমোহনের কপালে মাথা রাখল। তারপর মাথা তুলে পরাশকে বলল, ভাই একটা টিন দিতে পার? জল তুলব?

জল তুলে শুঁড়ে ঢালল বুলাকি। ঢালল, ঢেলে চলল। বুকের নিচে বুলাকির পৃথিবী ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। কোমাণ্ডি, কোমাণ্ডি জগমোহন। কোমাণ্ডি—সারাণ্ডা—রাই-জুজুভাতু-হেহেগড়া-ভুরকুণ্ডা আরো কত জায়গা আছে যে? কত পথে যে চলা হয়নি, কত সপত্র স্নেহময় ছায়াদাত্রী বটগাছের পাতা খাওয়া হয়নি—কত সতেজ বেণু-কুঞ্জের কচি ডগা ও নরম পাতা বাকি আছে অপেক্ষায়—বনের ভেতরে ও বাইরে কত কুণ্ডী ও ঝর্ণা—আদিবাসী শিশুদের হাতি দেখে হাততালি।

সব পথ জগমোহন শেষ করে দিচ্ছে কেন? বুলাকি কান্নায় অন্ধ হয়ে বসে পড়ল। জগমোহন মাঝে মাঝে শুঁড় তুলে ওর গায়ে বোলাচ্ছে। খেল খতম পয়সা হজম মেরে বুলাকি। তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি। আফসোস। চরণদাস না থাকলে তুমি আর আমি হয়তো যে-যার মত, এর চেয়ে ভাল অথবা মন্দ স্বাধীন জীবন বাঁচতে পেতাম। হল না। চরণদাসরা যে সবকিছু দখল করে ফেলে, সব সময়ে, সকল সময়ে। চরণদাস ধরেই নিয়েছিল আমার ও তোমার বিনাশ নেই। কিন্তু আমরা তো খুবই বিনশ্বর। তোমাকে মাইনে দেয়

নি, আমাকে খাদ্য। অথচ আমাদের ওপর থেকে ওর থাবা সরায় নি। আমার ও তোমার যৌবনে আমার ওপর থাবা ব'সয়ে বাঘ ঝুলে পড়েছে। তার থাবা ছাড়িয়েছি ঝাঁকি দিয়ে, তাকে মাড়িয়ে মেরেছি। কিন্তু চরণদাসের থাবা। সে থাবায় ধৃত আমি এখনো। তুমি তো থাকবেই।

পুরীতে যখন আমাদের ঢুকতে দেখল চরণদাস, আমি হাতি নামের অ্যাপলজি, তুমি মানুষ নামের। কোনদিন জিগ্যেস করেনি কি খেয়ে আমরা বেঁচে আছি।

হাতি আর মানুষে সাদৃশ্য পয়েনটগুলি অনুরূপ– পঁচিশে যৌবন, পঞ্চাশে বৃদ্ধ। সাধারণত একবার একটি শাবক জন্মায়। সে হিসেবে তুমি ও আমি হ্যাভ আউটলিভড আওয়ার টাইম। কিন্তু চরণদাস না থাকলে। শুধু তুমি ও আমি থাকলে কত ভাল হত? আমি জানি তুমি আমাকে বুরুডিহার জঙ্গলে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে দিতে না।

কিন্তু চরণদাস না থাকলে। তুমি তোমার মত মানুষী জগতে— আমি আমার মত আরণ্য জগতে থাকলে কত ভাল হত? সবচেয়ে ভাল হত, তাই না? কিন্তু চরণদাসরা যে সবকিছু দখল করে ফেলে, সব সময়ে, সকল সময়ে। একজন বুলাকিকে তারা হতভাগ্য গরিব হয়ে নিজের মত বাঁচতে দেয় না। আমাকে দেয় না অরণ্যচারী যূথপতি হতে। কোমাণ্ডি—কোমাণ্ডি-কোমাণ্ডি-বলে কেঁদ না। আর কোন পথ চলার নেই। কিন্তু এত মানুষ কেন?

গঞ্জুটোলির সবাই এসেছে। দূরে দাঁড়িয়েছে। এই হিমেল রাতে, বুরুডিহার জঙ্গলে। এক হাতির আসন্ন মৃত্যুতে এক মানবের শোক খুব দুর্লভ ও ভয়ংকর দৃশ্য। দৃশ্যটির পেছনে যে রক্তাক্ত নির্মমতার ইতিহাস আছে, তার গুরুভারে বাতাস ভারি।

জগমোহন নড়ে উঠল। পা মাটিতে ঘষে ঘষে ও উঠছে। সহসা বুলাকি বুঝল, মৃত্যু এসেছে জানলে হাতি নির্জন স্থান খোঁজে বলে যে কিংবদন্তী আছে, সেই মিথ এখন রিয়্যালিটি হতে চলেছে। তার শোকবিমূঢ়, অন্ধকার ও অশিক্ষিত মন এটুকু বুঝল, মিথ যখন রিয়্যালিটি

হয়, সেই অমোঘ মুহূর্তে মানুষের দূরে সরা উচিত। পিছিয়ে ও গঞ্জুদের দলে গিয়ে দাঁড়াল।

জগমোহন অশেষ চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল ও সন্থ অন্ধের মত টলতে টলতে চেতনার রেডারে পথ চিনে সঠিক পথে এগোল। ভীত। বিচলিত। সন্ত্রস্ত জনতা ওর সঙ্গে তফাত রেখে অনুসরণ করল।

বনের অঞ্চল ফুরাল। গঞ্জুটোলি। পথ। খেত। জগমোহন শুঁড়টা বাতাসে ঘোরাল। বাঁ দিকে ঘুরল। আরো পথ। সোম্‌রার জমি। ফণিমনসাব বেড়া টপকাল। কোনো বন্য হাতি কাঁটা তারের বা ফণিমনসার বেড়া সুস্থ অবস্থায় পেরোয় না। বেতলার জঙ্গলে কাঁটা-তারের বেড়া দেখলে বুনো হাতি, পাগল না হলে, কখনো টপকায় না, খুঁটি উপড়ে। হাইলি ইনটেলিজেনট অ্যানড সেনসিটিভ অ্যানিম্যাল। কিন্তু জগমোহন বুনো বা পোষা হাতির ডেফিনিশনের বাইরের হাতি। বুনো সে ছিল না। এবং পোষা হয়েও তাকে বনবাসী থাকতে হত। এখন তো ও সব ডেফিনিশনের বাইরে যাবে বলেই চলেছে।

সোম্‌রার জমি। জগমোহন দাঁড়াল টলল, শুঁড় আকাশ পানে ওঠাল, দুপাশে দোলাল। তারপর একটা আর্ত নিস্ফল বৃংহন বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে হুড়মুড় করে হাঁটু ভেঙে প্রথমে বসে পড়ল, তারপর শুয়ে পড়ল।

জগমোহনের বৃংহনের পরেকার নৈঃশব্দ্য ভেঙে খানখান করে বুলাকির চিৎকার, জ—গ—মো—হ ন।

ভীষণ গণ্ডগোল। জনতার চীৎকার। সোম্‌রা বিমূঢ় দর্শক। হনুমান মিশ্র এগিয়ে এলেন। শূন্যে দুহাত তুলে এসে মাটিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন।

জগমোহন? জগমোহন?

ক্রন্দনরত বুলাকিকে হনুমান মিশ্র লাথি মারলেন। বললেন, সরে যা অবিশ্বাসী? ছুঁস না। আকাশে জ্যোতি দেখেছিস?

জগমোহন? হাঁথি? হাঁথি ও নয়, কোনদিন ছিল না। কলিকালে ব্রাহ্মণ আর দেওতার মাহাত্ম্য ফিরিয়ে আনবেন বলে তুই মহাপুরুষ

গজরূপ ধরেছিলেন মাত্র। তৈলঙ্গ স্বামী আর কাঠিয়া বাবা। এক থে শরীর, ঔর থে মন। আজ কাজ সমাপ্ত করে তাঁরা স্বর্গে ফিরে গেলেন। এখানে এই গজরূপের মন্দির বসবে ঔর যতকাল ধরতি থাকবে, ততকাল মানুষ সে মন্দির দেখে মনে জানবে

ব্রাহ্মণ যব ভি ভ্রষ্ট
তিনোঁ ভুবন মেঁ শ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণ যব ভি নষ্ট
তিনোঁ ভুবন মেঁ শ্রেষ্ঠ।

চার

সকাল না হতে শত শত লোক দা কুড়োল নিয়ে এসে পড়ে ও জগমোহনের শব কুপিয়ে দেহখণ্ড নিয়ে স্বগৃহে বেদী বানাতে চলে যায়। মৃতবৎসারা জগমোহনের নখ নিয়ে যায় মাদুলি করে পরবে বলে। অন্ধ ও খঞ্জরা তার শরীর ছোঁয়। কুষ্ঠরোগীরা জগমোহনের চর্বি গায়ে মাখে। লালাবাবুরা পুরুষাঙ্গটি নিয়ে ভস্ম করে ঘি দিয়ে খেয়ে ফেলেন।

মন্দিরের সব টাকাই লালাবাবুরা দিতে রাজী হন ও মাংস-লাগা কংকালটি সোম্‌রার জমিতে বিশাল চিতায় ভস্ম করে, ছাই সে জমিতে পোতা হয়। সোম্‌রার ঘরও পুড়ে ছাই হয়।

খুব হেঁটেছিল সোম্‌রা। এম. এল. এ.— বি. ডি. ও.—ট্রাইবল ওয়েলফেয়ার অফিসার—থানার ও. সি.।

কোনোই সুরাহা হয়নি। সকলে তাকে যা বলেন, এবং যা বলেন না, তার সারাংশ এইরকম :

হনুমান মিশ্র যদি সোম্‌রার জমি দখল করতেন, তবে তা মানুষের জন্য সৃষ্ট আইনের আওতায় পড়ত এবং সোম্‌রা রিড্রেস পেত। হরিজন বলে ব্রাহ্মণ তার জমি নেবে এ অন্যায় সরকার সহ্য করত না কিছুতে।

যা ঘটেছে, তা সাব-জুডিস বা সাব-পোলিস ম্যাটার নয়,

অলৌকিকত্বের দেশ ভারতবর্ষ। যুগে যুগে অবিশ্বাসীকে শিক্ষা দিতে মহাপুরুষরা মানবরূপে অবতীর্ণ হন। এখনো সাঁইবাবা, বালক ব্রহ্মচারী, মা আনন্দময়ী, মোহনানন্দ ইত্যাদি ইনস্টিটিউশনস বর্তমান আছেন। মহাপুরুষদের লীলা বোঝা ভার। তৈলঙ্গস্বামী বেজায় মোটা ছিলেন। কাঠিয়াবাবা বেজায় চিমড়ে। কিন্তু পালামৌ বেল্টে অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণের তাদের শিক্ষা দিবার জন্য তাঁরা এক হন ও গজরূপ ধরেন। চরণদাসও মহাপুরুষ। সে জানত জগমোহন দুই মহাপুরুষের প্যাকিডার্ম সংস্করণ। মহাপুরুষরা বায়ুভুক। জগমোহনকে খেতে দিলে অন্যায় করা হত বলেই সে হাতিটিকে যাবজ্জীবন প্রায় অনাহারে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। বুলাকিকেও। মহাপুরুষ যখন প্রায় অনাহারী, তাঁর সেবককে অনাহারী রাখাই হল ধর্ম।

বোঝাই যাচ্ছে, জগমোহনেব মন্দির হলে আপামরজন ব্রাহ্মণ ও দেবতার মহিমা বুঝবে। এতে প্রশাসনের কোন অফিসারই বাধা দিতে পারেন না। ভারতের ধর্মীয় মহিমা স্থাপিত হতে চলেছে তাতে তাঁরা বাধা দেবেন না।

সোম্‌রা বলে—হামানি কো কাঁয় হোগা ? জমিন চল্ গেল্।

—তোর জমি ! তুই তো ধন্য হয়ে গেলি রে।

সোম্‌রা কাঁদতে কাঁদতে চলে আসে। এখন ধর্ম বিশ্বাসের হোলি ফায়ারে প্রজ্বলন্ত মুখে দারোগা বলেন, ব্রাহ্মণ যে সবার বড, এরা, এই ছোটলোকেরা যে কিস্‌সু নয়, তাও তো প্রমাণ হল ? শুনতে পাচ্ছি, তপসিলীদের জন্যে জব রিজার্ভেশন হবে। এরপর তা করতে গেলে আগুন জ্বলে যাবে। যে সরকার ঈশ্বরের মহিমা, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, দেখেও দেখে না, য়ো ভি ফির্‌ত্তি চুনাও মে হেরে যাবে।

—কে আসবে ?

—মত্ পুছিয়ে বি. ডি. বাবু।·· যাঁর চুনাও হলে ধর্ম থাকে, ব্রাহ্‌মন থাকে। অছুত ফিন্ পায়ের জুত্তি বনে, তিনি আসবেন ? এ তো সহজ রূথা।

—কবে ?

—ত' কে বলতে পারে? জগমোহনকে নিয়ে ।। হয়ে গেল, ও এক দর্পণ। এই দর্পণে আপনি যো হোয়েগা তার ছায়া দেখতে চেষ্টা করুন।

—একটা হাতি এল মরে গেল···

—হাতি নয়।

—মির‍্যাক্‌লের যুগ তাহলে শেষ হয় নি?

—হলেই কি আপনি খুশি হতেন? মিরাক্‌ল্ যাকে বলছেন। য়ো ভি নেসেসারি কমোডিটি হ্যায় না? মাইনেতে কি হয়? আমার পয়সা চাই আপনার পয়সা চাই. সবসে বেচারী এম. এল এ ঔর এম. পি. লোক। পাঁচ বরিষে জীবন চলবার রেস্ত গুছানো চাই। মিরাক্‌ল্ চলতে থাকলে সব কোইকো সুবিস্তা।

মহামহিমায জগমোহনের মন্দির ওঠে। চরণদাস মোহান্তও বেনারস থেকে আসেন ও হনুমান মিশ্রকে এক লাখ টাকা দেন মন্দির নির্মাণ-কল্পে। বুক পুড়ে যায় তাঁর। জগমোহন মহাপুরুষ তা ইউ. পি-তে কেউ জানল না, তাকে আবিষ্কার করল বিহার। যত ফায়দা সব এই মিশ্রজীর হল। বুলাকিটাও নিখোঁজ! তাকে পেলে বাকি দুটো মাহুতকে ট্রেনিং দেওয়াতেন এবং বুলাকিসহ তারা দুজন আর তিনটে হাতিকে অনাহারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারতে পারত। তাদের মধ্যে সোহং স্বামী—ভোলাগিরি, অনুকুল ঠাকুর, বরদাযোগী—দুধিয়া বাবা—তুলসী গিরি, যাঁর যাঁকে পছন্দ, জোড়ায় জোড়ায় থাকতে পারতেন ও বেরোতে পারতেন। নিশ্বাস ফেলে চরণদাস মিশ্রজীকে বলেন মন্দির উদ্বোধনের সময়ে একটু খবর দেবেন।

—জরুর।

—কে উদ্বোধন করবেন?

—হিমালয় সে সারস্বত স্বামী আসবেন

—উনি নেমে আসেন?

—এবার আসবেন।

চরণদাস মোহান্ত চলে যান।

ঘুরুডিহায় জগমোহনের মৃত্যুর খবরটি এখন সর্বভারতীয় ঘটনা। বিদেশী কোনো স্টার জগমোহন হয়ে অভিনয় করতে রাজী হলে ঘটনাটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাবে।

অঞ্চলটিতে অলৌকিকত্বের আরা বিরাজ করছে। গোলবদন সাহুর বিধবা স্বপ্নাদেশে জগমোহনের মুখে শুনেছেন, মিশ্রজীর শিবকে প্রত্যহ দশ লিটার দুধে স্নান না করালে গোলবদনের মুক্তি হবে না।

বুলাকি ও সোম্‌রা দুজনেই যে কোথায় গেছে কেউ জানে না। গঞ্জুটোলিতেও তারা থাকতে পায় নি। কেন না বুলাকির পাপ, সে জগমোহনকে হাতি ছাড়া আর কিছু বলে চেনে নি

সোম্‌রার পাপ, মিরাক্‌লের পরেও সে জমি ফেরত চেয়েছিল।

এদের থাকতে দিলে গঞ্জুটোলির ওপর মিশ্রজীর অভিশাপ এসে পড়ত।

গোমোর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দুজন নবাগত শরণার্থীকে দেখা যায়। হত দরিদ্র, রোগা, জীর্ণ, হলদেটে চোখ তাদেব। কুলির কাজও তাদের নিত্য জোটে না এবং তারা উপোসেই থাকে।

মাঝে মাঝে কুলি কাম জোটে। সেদিন ওরা দুজনেই আট আনার টিকিটে 'হাতী মেরে সাথী' দেখতে যায়।

ছবিটি শেষ হলে দেখা যায় একজন অঝোর ধারে কাঁদছে আরেকজন তার পিঠ থাবড়ে থাবড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

তারপর তারা পয়সা থাকলে মদ খায়, নয়তো এসে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে পড়ে। একজনের বুকে দেখা যায় উড়ন্ত পরীর ছবি উল্‌কিতে আঁকা। দুজনে দুজনের হাত ধরে প্রেমিকের মত ঘুমোয়, যেন দুজনে ছাড়া পরস্পরের আর কেউ বা কিছু নেই। ওদের নাম কেউ জানে না বা জানার চেষ্টা করে না। স্টেশন প্ল্যাটফর্ম একমাত্র ঠিকানা হয় যাদের, তাদের নাম না জানলেও ভারতবর্ষের চলে, কেন না ওরা অত্যন্ত এক্সপেনডেবল।

———

শিকার

জায়গাটি গোমো—ডালটনগঞ্জ লাইনে পড়ে। স্টেশনটিতে একদা ট্রেন দাঁড়াত। সম্ভবত ট্রেন দাঁড়াবার খরচ পোষায় না। তাই স্টেশন ঘর, থাকার কোয়ার্টার ও কুলী বস্তির ঘরে দেখা যায় গরু ও ছাগল মাঝে মাঝে। 'কুরুডা আউটস্টেশন, অ্যাবান্‌ডন্‌ড' লেখা বোর্ড। এখানে এসে ট্রেনের গতি মন্থর হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনটি ওপরে ওঠে। অল্প অল্প করে এখান থেকেই ট্রেনটি ওঠে কুরডা পাহাড়ে। ঢালু পাহাড়। কিছুদূর উঠে ট্রেনটি ঢোকে একটি গিরিখাতে। আধ মাইল লম্বা গিরিখাতের দুপাশে ব্লাস্ট করা পাথর। পাহাড়ের ওপরে বাঁশবন, এবং মাঝে মাঝে বাতাসে বাঁশগাছ নুয়ে পড়ে ট্রেনের ছাদে ঝাপট মারে। তারপর ট্রেনটি নামে ও তার গতিবেগ বাড়ে। এবার স্টেশন তোহ্‌রি। এ অঞ্চলের ব্যস্ততম স্টেশন। বহু বাস রাস্তার জংশন। তোহ্‌রি কোল্‌হল্টও বটে। ট্রেনে কয়লা ওঠে। চতুর্দিকে সারফেস্ কোলিয়ারি। এ অঞ্চলে মাটির প্রায় ওপরেই নিম্নমানের কয়লা মেলে। তবে তোহ্‌রির আসল লক্ষ্মী কাঠের ঠিকাদাররা। শাল অঞ্চল। ট্রাকে রাতদিন শাল-গুঁড়ি আসে। কাঠ-কারখানায় চেরাই হয় ও দিকে দিকে চলে যায়। কুরুডার নৈঃশব্দ্যের পর তোহ্‌রির সরগরম একটা অভিজ্ঞতা।

দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে পাহাড়ের মাথা দিয়ে ট্রেন চলার দৃশ্যটি একটা অভিজ্ঞতা। রোজ দেখে গ্রামবাসীরা, তবু বিস্ময় ফুরোয় না। ট্রেনটা যাচ্ছে, যাচ্ছে, ইঞ্জিনটা হাঁপাচ্ছে ; এবার খাতটা ট্রেনটাকে গিলে ফেলল। দৌড়ে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে কোথায় ট্রেনটাকে উগরে দিল। পাহাড়ের মাথায় একদিন কয়েকটা হাতিও দেখা গিয়েছিল। বাঁশগাছ খেতে খেতে হাতিগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে। দূর থেকে তাদের পুতুল হাতির মতো দেখাচ্ছিল।" ট্রেনটি চলে যেতে তারা শুঁড় তুলে চেঁচিয়ে দৌড় মারে।

কুরুডা গ্রামটি স্টেশনের অনেক পিছনে। ছুটি পাহাড়, একটি প্রান্তর পেরিয়ে। আরেকটু কাছে হলে হয়তো গ্রামের মানুষরাই এসে ওই পরিত্যক্ত পাকা বাড়িতে থেকে যেত।

কুরুডা গ্রামের মতো গ্রামে যারা থাকে, তাদের জীবনে বাৎসরিক পূজাপার্বণ ছাডা বৈচিত্র্য খুবই কম। সেইজন্যই কুরুডা পাহাড়ের ওপরের দৃশ্যগুলি এমন করে তাদের চোখ ভোলায়।

মেরী ওঁরাও যখন এসে দাঁডায়, তখন সে যেমন ট্রেনটিকে দেখে, যাত্রীরাও চোখ পড়লে তাকে দেখে। বয়স আঠারো, দীর্ঘাঙ্গী, চ্যাপ্টা মুখ-নাক, রং তামাটে ফর্সা। সাধারণত ও ছাপা শাড়ি পরে। দূর থেকে ওকে খুব মোহনীয় দেখায় কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, ওর চোখের ভাষায় খুব কঠিন প্রত্যাখ্যান আছে।

ওকে দেখলে কেউ আদিবাসী বলবে না। কিন্তু ও আদিবাসী। এক সময়ে কুরুডায় সায়েবদের টিম্বার-প্লান্টেশন ছিল। স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে সায়েবরা চলে যায়। ডিক্সনদের বাংলো ও বাড়ি দেখাশোনা করত মেরীর মা। ডিক্সনের ছেলে ১৯৫৯-এ এসে বাড়ি, জঙ্গল সব বেচে দিয়ে চলে যায়। যাবার আগে ভিকৃনির গর্ভে মেরীকে দিয়ে যায়। সে যায় অস্ট্রেলিয়া। মেরীর নাম রাখেন গির্জার পাদরী। তখনও ভিকৃনি ক্রীশ্চান ছিল। তারপর রঁাচির প্রসাদজী যখন ডিক্সন-বাংলোয় থাকতে এলেন, ভিকৃনিকে কাজে বহাল করতে অরাজী হলেন, ভিকৃনি আবার ক্রীশ্চান ধর্ম ছেডে দিল। মেরী প্রসাদদের গাই-মোষ চরায়। ও অত্যন্ত দক্ষ গাই-চরাই। তাছাড়া ফলের পাইকারী খদ্দের, কুঞ্জরাদের কাছে ও অসম্ভব দর কষে প্রসাদদের ফলবাগিচার সরিফা ও আমরুদ বেচে। ক্ষেতের সব্জী নিয়ে চলে যায় ট্রেনে চেপে তোহ্‌রি।

সবাই বলে, প্রসাদজী খুব ভাগ্যমন্ত। ভিকৃনির সঙ্গে ওঁর মাইনের বন্দোবস্ত, মেরীর সঙ্গে খাওয়া-থাকা কাপড়ালত্তার কড়ার। ডিক্সন-বাংলো সায়েবদের থাকার জন্যে তৈরি। সায়েবরা, ভিকৃনির কথা, বারোজন আয়া-নোকর-জমাদার রাখত। এখন প্রসাদজীর আমলে বিশাল বাংলোটি মেরীই পরিষ্কার রাখে।

তোহ্‌রি বাজারে মেরীর ভক্তবৃন্দ অগণ্য। স্টেশনে নামে ও রানীর মতো। বাজারে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে স্বাধিকারে। অন্যান্য বাজারিয়াদের কাছে বিড়ি নেয়, ওদের পয়সায় চা-পান খায়, কিন্তু কাকুকে আমল দেয় না। বাজারিয়াদের নেতা, মস্তান ছেলে জালিম ওর প্রণয়ী। জালিম অথবা ও, একজনের পয়সা জমে একশো টাকা হলেই ওরা বিয়ে করবে।

বিয়ে করবে, এই কথার ভিত্তিতেই ও জালিমকে কাছে আসতে দিয়েছে। ওঁরাও মায়ের মেয়ে, দেখতে অন্যরকম, লম্বাও বেশি। তাই স্বজাতে ওর জন্যে ছেলে মেলেনি। আদিবাসী যুবকদের কাছে মেরীর গায়ের রং একটা প্রতিরোধের দেওয়াল। ছেলে দেখেছিলেন প্রসাদ গিন্নী। ওঁদের মালীর ছেলে। বলেছিলেন, এখানেই থাকবি।

'ভিক্‌নি বর্তে যায়। মেরী বলে, 'না। মা জী বলেছে, তার কাজের লোক বাঁধা থাকবে বলে'

ঘর দেবে।

ঝোপড়ি।

ছেলেটা ভালো।

না। ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল-সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, অমন জীবন আমি চাই না।

মেরী রাজী হয়নি। গ্রাম-সমাজে ও স্বীকৃত। মেয়েরা ওর বন্ধু, পালা-পার্বণে নাচতে ও অদ্বিতীয়। তাই বলে ওদের জীবন কাটাতে ও চায় না।

প্রণয়ী হতে চেয়েছে বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে দেখিয়েছে। তারা বাইরের মানুষ। ভিক্‌নির মতো, তাকেও পেটে বাচ্চা দিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতে পারে।

ওকে নিয়ে একবার তো তোহ্‌রি বাজারে দাঙ্গা বেধে যায়। টিম্বার লরীর ড্রাইভার রতন সিং, মদ খেয়ে ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। তখনই জালিম এসে বাধা দেয় এবং রতন সিংয়ের সঙ্গে তার মারামারি হয়। তারপরেই দেখা গেল মেরী জালিমের পাশে বসে সব্জী বা চীনেবাদাম

বা ভুট্টা বেচছে। কোনদিন ও জালিমের ঘরে যায়নি। না, বিয়ে হোক আগে। জালিম তাতে খুবই সশ্রদ্ধ। হ্যাঁ, মেরীর মধ্যে সাচাই আছে অস্ট্রেলিয়ান রক্তের তেজ।

মেরীর মধ্যে কোথাও আছে অবিশ্বাস। জালিমকেও ও পুরো বিশ্বাস করে না। একশো টাকা জমলেই ওরা বিয়ে করবে, এ তোহ্‌রির বাজারিয়ারাও জানে। সে একশো টাকা, জালিমের বক্তব্য, সে-ই জমাবে। মেরী কিছু আনতে পারলে ভালো। তাই জালিমের ওপরেই ও ছেড়ে রেখেছে টাকা জমাবার দায়িত্ব। জালিমের পক্ষে কাজটি সহজ নয়। গ্রামে ওর মা-বাবা, ভাই-বোন আছে। এখানে ঘর ভাড়া করতে হবে, বাসন-কোসন কিনতে হবে। সব খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবে না। তারপর মেরীকে কাপড়টা, জামাটা, সাবানটা দিতে ইচ্ছে যায়।

মেরী ওকে অবশ্য প্রথম উপহারটি দেয়। রঙিন সুতোর গেঞ্জী

তুহি দেত্‌ল ? জালিম খুব খুশি।

নায়। তোহ্‌বা ভৌজী ভেজ্‌ল।

এরপর জালিম ওকে এটা সেটা দিয়েছে। যে সব শাড়ি-জামা মেরী পরে না। বিয়ের পর পরবে।

মেরী বোঝে, জালিম যথেষ্ট কষ্ট করছে টাকা জমাবার জন্যে। বুঝেও কিছু বলে না, একশো না হোক, বিরানব্বই টাকা ওর জমানো আছে।

টাকাটি ওর উপার্জন। প্রসাদ বাড়িতে। সরকারী কানুন হল, জঙ্গল-অঞ্চলে, কারো বাড়িতেও যদি মহুয়া গাছ থাকে, তাতে যে তুলবে তার অধিকার মহুয়া ফলে। মহুয়া ক্যাশ ফল। মহুয়া থেকে মদ হয়, মহুয়া ফলের কালো বিচির তেল হল কাল্‌চে কাপড়কাচা সাবান তৈরির উপাদান। প্রসাদ বাড়ির চারটি মহুয়া গাছের ফলই মেরী কুড়োয়। গ্রামের অন্য কেউ, মস্করা করেও সে ফলে হাত দিতে পারেনি। তখনই মেরী দা তুলেছে। এ তার হকের জিনিস। এর জন্যেই ও প্রসাদ বাড়িতে বিনে মাইনেয় এত খাটে।

প্রসাদ-গিন্নির ব্যাপারটি খুব পছন্দ নয়, কিন্তু লছমন প্রসাদ বলেন,

'ওদিকে চেও না। কে এমন করে বাড়ি সাফ করবে, গাই চরাবে? তোহ্রি গিয়ে ফল, সব্জী, বাদাম বেচে আসবে লাভ রেখে?'

মেরী ভূতের মতো খাটে, কিন্তু প্রসাদজীর কাছ থেকে ও কোন অন্তরঙ্গতা বরদাস্ত করে না।

কি রে মেরী, মৌয়া বেচে কত টাকা হল?

আপনার দরকার?

মহাজনী কারবার খুলে দে।

হ্যাঁ, তাই খুলব।

দেখ, আমি বলেই তোকে মোয়া তুলতে দিই। নইলে সরকারী হক্। নোকর লাগিয়ে তুলে নিতে তো পারতাম? নিই না তো?

নোকররা এসেই দেখুক। দা আছে না? খুব রুক্ষ ও গম্ভীর গলা মেরীর।

প্রসাদজী বলেন, হবে না? সাহেবী রক্ত।

প্রসাদ-গিন্নি মেরীকে দিয়ে তেল ডলিয়ে, গা দাবিয়ে নেন। চর্বি-সর্বস্ব শরীরে মেরীর নিটোল ও কঠিন শরীরটি দেখেন। বলেন, 'কি বে, সাদীর কদ্দ্র? জালিম কি বলে?'

গরীব মানুষের কথা শুনে আপনি কি করবেন? আপনি সাদী দিয়ে দেবেন?

রাম রাম! মুসলমানের সঙ্গে? আমি সাদী দেব?

কেন? মুসলমান তো সাদী করবে বলছে। আপনার ভাই তো রাখতে চেয়েছিল।

মুখের মতন জুতোটি খেয়ে গিন্নি চুপ করেন। যে মেয়ে ভূতগত খাটে, আধমণী বস্তা পিঠে নিয়ে চলে যায় ট্রেনে চেপে, আধঘণ্টায় পুরো বাড়ি সাফ করে, তার মুখের কথা সইতে হবে বই কি।

মেরীকে সবাই ভয় করে। মেরী তার অটুট স্বাস্থ্য, অসীম কর্মক্ষমতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়ে ঘর সাফ করে, গাই চরায়। চরাতে-চরাতে ভাজা মকাই দিয়ে লাঞ্চ সেরে নেয়। দাঁড়িয়ে থেকে ফল পাড়ে ও পাড়ায়। নিজে ওজন করে দেয় কুঞ্জরাদের। পাখি ও বাদুড়ে খাওয়া

ফল বোরায় তুলে নিয়ে যায়, ওর মায়ের পোষা মুরগীদের খাওয়ায়। বর্ষা সমাগমে বীজ থেকে গজিয়ে ওঠা চারা নেড়ে নেড়ে বসায়। সমস্ত দিকে কড়া নজর ওর। প্রসাদদের প্রয়োজনীয় চাল-তেল-ঘি-মসলা তোহ্রি বাজাব থেকে কিনে আনে। নিজেই বলে, 'যত পয়সা বাঁচাই আপনাদের, আব নাফা করে দিই, তাতে আপনার কত টাকা জমে বছরে মা জী? কেন সস্তার শাড়ি নেব? ভালো কাপড় পরব, তেল-সাবান মাখব সব 'দবেন।'

প্রসাদ-গিন্নি অগত্যা ওকে ভালো কাপড় পরান।

মাঝে মাঝে ও গ্রামে যায় আড্ডা মারতে। অবরে-সবরে। সেখানে গিয়ে পেটে কাপড় বেঁধে প্রসাদ-গিন্নি হয়, এক পা খুঁড়িয়ে প্রসাদজী হয়, এবং সকলকে হাসায়। সেখানে ও খুবই সহজ যুবক ছেলেরা যখন বলে, 'মুসলমানী বিবি এখানে যে?'

তোবা কেউ বিয়ে করলি?

তুই কবলি?

আমাব মতো লম্বা হয়ে, এত গোরা হয়ে এলি না কেন?

তুই তো সাহেবের মেয়ে।

'বড সাহেব! ঔরতের পেটে বাচ্চা দিয়ে চুহার মতো ভেগে যায়। আমার মা হল বদমাশ। যখন দেখলি গোরা মেয়ে. তখনই তো মেরে ফেলবি? তাহলে কি এত ল্যাঠা হত?

মেরে ফেললে তোব কি হত?

আমি থাকতামই না।

ছেঁড়া কথা রাখ্। মুসলম'নী হবি তো হবি। হবার আগে আমাদের একদিন ··

কি?

ভাত-মুরগী-খাসী আর মদ?

খাওয়াব। খু—ব খাওয়াব। কবে খাওয়াইনি? বল্ তোরা?

তা খাওয়াস বটে।

যে মেয়ী, প্রসাদজীর মুনাফা রাখতে মণ-মণ বোঝা টানে, ফল বেচে

কুঞ্জরাদের সঙ্গে লড়াই করে, চীনেবাদাম একটা কারুকে দেয় না, সেই মেরীই ও বাড়ি থেকে চুরি করে আনে বাদাম তেল, আটা, গুড়। লবণ আর মসলা।

টোলীতে যে কোন ওঁরাও বাড়িতে বসে ও মাটির চাটুতে আটার পিঠে ভাজে, সকলের সঙ্গে খায়। জালিমকে বিয়ে করবে তা যেমন জানে, এও জানে, ও যে-কোন ওঁরাও মেয়ের মতো দেখতে হলে— ওর পিতা সোমরা বা বুধনা বা মংলা ওঁরাও হলে— এ বিয়ে ওঁরাওরা হতে দিত না। শ্বেতাঙ্গ পিতার জারজ মেয়ে বলে ওকে ওঁরাওরা রক্তের রক্ত মনে করে না এবং স্ব-সমাজের কঠোর রীতিনীতি ওর ওপর আরোপ করে না।

করলে ও বিদ্রোহ করত। করে না বলে ওর দুঃখ হয়। ওর অন্তরের অন্তরে কোথায় যেন ওঁরাও সমাজের একজন হবার আকাঙ্ক্ষা আছে। খুব খুশি হত ও। ওর তের-চোদ্দ বছর বয়সে যদি কোন সাহসী ওঁরাও ছেলে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করত। মেরী তোহ্‌রিতে দু-তিনটি হিন্দী ছবি দেখেছে। আমন উঠলে তোহ্‌রিতে ভ্রাম্যমাণ ফিল্ম দল আসে। খোলা মাঠে সিনেমা দেখায়। কুরুডা গ্রামের মেয়েরা কেন, ছেলেরাই বলতে গেলে কেউ সিনেমা দেখেনি। সিনেমা দেখেনি, ভালো কাপড় পরেনি, পেট ভরে খায়নি। এদের পরে মেরীর এক রকম মমতাও আছে।

এই রকম করেই চলতে থাকে মেরীর জীবন। একদিন হঠাৎ, ট্রেন থামিয়ে প্রসাদজীর ছেলের সঙ্গে নেমে পড়ে ঠিকাদার তশীলদার সিং, এবং মেরীর জীবন বিপর্যস্ত হয়, কুরুডার শান্ত ও দরিদ্র অস্তিত্বে ঝড় ওঠে।

দুই

প্রসাদজীর বাংলোর সংলগ্ন জমি পঁচাত্তর একর বা দুশো পঁচিশ বিঘা। এ অঞ্চলে সিলিং কেউ মানে না, দূরে দূরে একদা টিম্বার-

প্লাটারদের যে সব বাংলো আছে, সবগুলির সঙ্গেই অসাগর জমি। ডিক্সন সাহেব পঞ্চাশ একরে শাল গাছ লাগান। ও অঞ্চলের বামন শাল নয়, জায়েন্ট শাল। কালে গাছগুলি মহীরুহ হয়েছে। ফেলিং-এর জন্যে প্রস্তুত। শালগাছ না থাকলে প্রসাদজী এ জমিতে কি কি ফলাতে পারতেন, তা নিয়ে আক্ষেপ করতেন। এখন শাল গাছের দাম জেনে থেকে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, উচ্চতম দামে গাছ বেচা। এ হেন প্রস্তাবে লালচাঁদ এবং মুল্‌নিজী, অঞ্চলের আরো দুই জঙ্গল-মালিকও খুশি হন। প্রসাদের ছেলে বনোয়ারী সচেষ্ট হয় ও ডাল্‌টনগঞ্জ-ছিপাডোর চষতে থাকে। ফলশ্রুতি তশীলদার সিং।

তশীলদার সিং এসেই প্রথমে বধ্য গাছগুলি দেখে। তারপর দাঁও কষাকষি চলে। প্রসাদ বলেন, 'এ রকম শাল কাঠ! এই দামে বেচা যায়?'

বেচবেন কেন? যেখানে নাফা মিলবে, সেখানে বেচবেন?

একটা দামের মতো দাম বলুন।

প্রসাদজী। বনোয়ারী আমার চিক্কে দোস্ত। ছিপাডোরে ও সার্ভিস করে, আমি ঠিকাদারী। মিছে বলব না, ম্যাচিওর, গাছ, কাঠ ভি পাক্কা'।

সাহেবরা লাগিয়ে গেছে।

হাঁ। তবে এখানে গাছ কাটাব, টুকরা হবে। ট্রাক এখানে আসবে না। সাহেবদের দিন নেই যে হাঁথি আনব ফরেস্ ডিপার্ট্ থেকে আর তোহ্‌রি অব্দি টানাব কাঠ। আমাকে মুরহাই অবধি নিতে হবে। কাঁচা রাস্তায় ট্রাকের টায়ার ফাঁসবে। তাব আগে গাছ কাটাব, কত খরচা আমার হবে বলুন?

নাফা তো হবে?

জরুর। বিনা নাফা কোই কাম করে? তবুও নাফা আপনার বেশি। জলের দরে বাংলা কিনলেন, তৈরি শাল ফরেস্ পেলেন। যা পাবেন, সবই নাফা। কেঁও কি, এর জন্যে তো আপনার কিছু ইন্‌ভেস্ না হ্যায়। মকাই নয় যে ভৈঁষা লাঙল টেনেছে, নৌকর কেটেছে। সরিফা বা আমরুদ নয়, যে পাখি-বাদুড় তাড়িয়েছেন। ফরেস্ এরিয়া, শাল এরিয়া, গাছ আছে, বেচে দিবেন ফটাফট্।

লালচাঁদ আর মুলনিও বললেন, 'ইত্না তকরার না করো ভৈয়া। ও চলে গেলে কি করব ? শাল গাছে যখন বাতাস চলে, দরিয়া গর্জায়, ওহি শুনেগা ? ফুল হয়, ফল হয় না। ওহি দেখেগা ? কিনতে চায়, বেচে দেব।'

ঠিকাদারও তাই চায়। সাহেবরা কি সব গাছ লাগিয়ে গেছে। আকাশ ফুঁড়ে মাথা উঠেছে, গুঁড়ি রেলইঞ্জিনের মতো মোটা। শুধু প্রসাদজীর গাছ কিনবে কেন ? এ অঞ্চলের সব গাছ ও কিনবে।

প্রতি পাঁচ-সাত বছরে কিছু কিছু গাছ তৈরি হবে, ও আমিই কিনব। ফটাফট ! য়ে আভিতক্ ভার্জিন এরিয়া হ্যায়, হাম্হি মনোপলি গাছ ফেলিং করেগা।

তাই ঠিক হল। প্রসাদজী পরে বুঝলেন, গাছ বওয়ার খরচের কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। কেন না মুরহাই ছাড়িয়ে, কুরুডার কাছাকাছি চলে এলো ট্রাক। ওদিকটা সমতল ও পাথুরে। ট্রাক আসতে বাধা নেই। সেখানে তাঁবু পড়ল ঠিকাদারের। গাছ কাটার জন্য দক্ষ লোক এলো দুজন।

ঠিকাদার ম্যান-পাওয়ার রংরুট করতে বসল। কুরুডা, মুরহাই, সিহো, থাপারি, ধুমা, চিনাডোহা—ছয়টা গ্রামের ওঁরাও মুণ্ডা পুরুষরা-মেয়েরা এলো। অবিশ্বাস্য কথা। ঘরে বসে পয়সা। গাছ কাটবে অন্য লোক, তার ডাল-পালা ছাঁটাই, কাটা গাছ পিস্ করার পর সেগুলি বয়ে ট্রাকে নেওয়া, পুরুষরা দিন বারো আনা, মেয়েরা আট আনা। তারপর দুপুরে মকাইয়ের ছাতু টিফিন। অবিশ্বাস্য সব ! ছাতুর সঙ্গে লবণ এবং লঙ্কা। গ্রাম-পহান্ ও গাঁওবুড়ারা মেয়ে-পুরুষ আনবে। গ্রাম পিছু প্রতি হপ্তায় এক বোরা লবণ। গাঁওবুড়ারা বলল, মেয়েরা কাজ করবে, তাদের ইজ্জত ?

ঠিকাদার বলল, সবাই সবায়ের মা-বোন ! যে ভুলবে, তাকে ভাগিয়ে দেব।

ট্রাকের গতিময়তা, ঠিকাদারের কথাবার্তার স্পীড, তড়িঘড়ি কাজের ব্যবস্থার স্পীড, তাতে গাঁওবুড়াদের মাথা ঘুরে গেল। ফলে তাদের

মনেই হল না, ঠিকাদারের কথাটি ঠিক নয়। সবাই সবায়ের মা-বোন হতে পারে না। কথা পাকা হতে ঠিকাদার গাঁওবুড়াদের ছ'জনার হাতে ছ' বোতল এক নম্বরী চোলাই ধরিয়ে দিল। কুরুডার গাঁওবুড়ারা অন্যদের বলল, 'গাঁয়ে যেয়ে পহানকে বলে থানে পুজা দে। সময়টা ভালোই পড়ল আমাদের।'

ঠিকাদার ট্রেনের ড্রাইভারের সঙ্গে ও কথা বলে নিল। মুরহাইতে ট্রেন ধরে। সেখানে কথা বলে নিলে, দরকারে কুরুডাতে ট্রেন ধরবে। ওয়াগন মিলবে। ড্রাইভারকেও বোতল দিল ঠিকাদার। পাকা শাল গাছ একেকটির দাম দিচ্ছে সে পনেরো টাকা। কোন খরচেই তার বিশাল মুনাফা আটকায় না। সে বেচবে কিউবিক ফুট হিসেবে। বনোয়ারীকে সে একটি ট্রানজিস্টার দিল। বনোয়ারী না বললে সে জানতেও পারত না, বামন শালের দেশে এই কোয়ালিটির শাল গাছ আছে। সমস্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত লাভজনক।

ঠিকাদারটি তার স্বজাতীয় প্রসাদ বা মুল্নি বা লালচাঁদদের বর্বর অশিক্ষা ও অজ্ঞতাকে তারিফ করল। বেটারা জানেও না, কি মাল ছেড়ে দিচ্ছে। বনোয়ারীকে সে গাছ পিছু এক টাকা গোপনে দিয়ে দিয়েছে। তাতেও তার প্রচুর মুনাফা থাকছে। বহু গাছ পাঁচ সাত বছরে কাটার মতো তৈরি হবে। প্রসাদকে হাতে রাখা দরকার। শীগগিরই এ সব অঞ্চল যুক্ত হবে ওদিকে তোহ্রি ও এদিকে নিরলা-ঘাটের সঙ্গে। রাস্তা তৈরি হচ্ছে। রাস্তা হয়ে গেল তখন, ভবিষ্যতে ট্রান্সপোর্ট খরচা বেঁচে যাবে।

কিছুদিন বসে ঠিকাদারটি তোহ্রি থেকে এক বাক্স মিষ্টি, এক হাঁড়ি ঘি নিয়ে প্রসাদের বাড়ি এলো। প্রসাদ বললেন 'মেরী! মেহ্মান এলো। কুছু চায়ে-উয়ে আন্।'

মেরী আজই স্নান করেছে। ফলে খুব ঘষামাজা চেহারা, চুলে তেল দিয়ে বেণী বাঁধা। ছাপা কাপড় সামনে আঁচল দিয়ে পরা, হাতে ও কানে পেতলের গহনা। ট্রে-তে চা খাবার নিয়ে মেরী ঢুকল, তশীলদার সিং সোজা হয়ে বসল। আরে বাব্বা! এ কি মেয়েছেলে? এই জঙ্গলে?

প্রসাদজী বুঝলেন। মেরী বেরিয়ে যেতেই উনি বললেন, আমার নোকরানীর মেয়ে। ওর মা যখন ওর মতো জোয়ানী, তখন ·

মেরীর রূপের গোপন রহস্য বিবৃত করে তিনি উপসংহার স্বরূপ বললেন, আমার পরিবার ওকে বেটি সমঝতে, আমাদের ও মা-বাবার মতো ভক্তি করে।

তা তো হবেই। তশীলদার সিং বলল, নইলে আপনাকে সবাই বড়মানুষ বলে কেন? সেই বড, যার দিল্-কলিজা বড়। সে মনে মনে ভাবল, এই জঙ্গলে গাছ কাটানোর ব্যাপারটি খুবই নাফাজনক। মেরী তার অবস্থিতি কালকে অন্য অর্থেও নাফাজনক করতে পারে।

মেরী হল বহির্জগৎ তোহ্রি ও কুরুডার নিয়মিত যোগাযোগ-সেতু। রাতে প্রসাদজীকে ওষুধ খাবার গরম জল দিতে এসে ও বলল, য়ো হারামী তো আপনাদের ঠকিয়েছে! নাফা পিটে নিল। তোহ্রিসে ছিপাডোর সবাই হাসছে।

প্রসাদজী বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে জলের বাটিতে রাখলেন। তারপর ওষুধ খেলেন। একটু পরে বললেন কা করে মেরী? রোড না হ্যায়, আমার ক্ষমতা কি যে নাফায় কারুকে বেচব? জঙ্গলে থাকলে এই হয়। বনোয়ারীটা ওকে আনল। বনোয়ারীটা গোঁয়ার, তাতে ওর মায়ের দলে। আমি আগে 'না' বললাম, তাতে লালচাঁদ ঔর মুল্নি রেগে গেল। বাড়িতেও অনেক আপত্তি হল।

বনোয়ারীও টাকা খিঁচে নিয়েছে।

তুই জানিস?

হমানি কো মালুম হ্যায়।

দেখ্ কি দুঃখের কথা।

নিশ্বাস ফেলে প্রসাদজী একটা টাকা ওকে দিলেন। এ রকম মাঝে মধ্যে দেন। বললেন, আমার একটা ফল, একদানা ভুট্টায় যাতে না ঠকি, সে জন্যে তুই কত কষ্ট করিস। নিজের ছেলে, কিছু বোঝে না। কি করব বল? আমি কি জানি না, আমি মরলে এই সব কিছু বেচে দিয়ে বেটা ভেগে যাবে?

পরে যখন গাছ বেচবেন, ততদিনে রোড হয়ে যাবে, উস্‌কো মৎ দে না। নিজে যাবেন ছিপাডোর। বড় কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে কাজ করবেন। তখন নরম হবেন না।

ঠিক বলেছিস।

মেরী কুকড়ার গাঁওবুড়াদেরও বলল, বারো আনা আর আট আনা! এ পয়সায় তোহ্‌রি বা ছিপাডোরে কোন কুলী বাবুদের ব্যাগ বয় না।

গাঁওবুড়ারা বলল, কা করে মেরী! আমি 'না' বললে গাঁয়ের লোক খেপে যেত। বলত, কে আমাদের এই পয়সা বা দিচ্ছে?

মেরী বলল, 'ওর লোভ লেগে গেছে। পাঁচ-সাত বছরে আবার ও আসবে। তখন তিন টাকা-দু' টাকা নেবে দর কষে। ওকে দিতেই হবে। নইলে এখানে বাইরের লোক পাবে কোথায়?

রোড নেই, কাজ মেলে না, জানিস তো সব।

মেরীর মনে হল, ঠিকাদারের চাহনির উত্তর অনুযায়ী সেও তার বুদ্ধি মতে সকলকে লোকটার স্বরূপ জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তশীলদার সিং ওর কথা ভুলল না। কয়েকদিন বাদে, মেরী যখন মোষের পিঠে চড়ে অন্য গরু-মোষ তাড়িয়ে ঘরে ফিরছে, তশীলদার এসে দাঁড়াল। বলল, কি খুবসুরৎ রে! তোকে হেমা মালিনীর মতো দেখাচ্ছে।

কা বোলা?

তোকে হেমা মালিনীর মতো দেখাচ্ছে।

তোমাকে উল্লুর মতো দেখাচ্ছে।

তশীলদার সিং এ হেন মন্তব্যে খুবই প্রশ্রয় পেল ও কাছে এলো। মেরী মোষটি থামাল না। চলতে চলতে একটি ধারালো দা ও ফস্‌ করে বের করল ও অলস কণ্ঠে বলল, তোমার মতো সরু প্যাণ্ট, কালো চশমা পরা ঠিকাদার তোহ্‌রির রাস্তায় টাকায় দশটা মেলে, তাদের আমি এই দা দেখাই। বিশ্বাস না কর, গিয়ে জেনে এসো।

তশীলদারের কাছে ওর কথা বলার ভঙ্গীটি খুব আকর্ষণীয় মনে হল।

রাতে খেতে বসে বনোয়ারী বলল, মেরী আমার বন্ধুকে অপমান করেছে।

কথাটা বলল বাপকে, জবাব দিল মেরী, কি অপমান করেছি তোমার বন্ধুকে?

রুঠা বাত বলেছিস।

এবার বাত বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে ওরকম বদমাশি নাখারা করতে এলে নাক কেটে দেব।

বনোয়ারীও ঘাবড়ে গেল। বলল, কা, কোই বুরা কিয়া য়ো?

আমার কাছে সেটা বুরাই বাত। তোমার কাছে সেটা ভালো কথা হতে পারে।

প্রসাদজী বললেন, তুই ওকে বারণ করে দিস। গাছ কিনতে এসে এ সব ঝামেলা ভালো নয়।

মেরীও যেন তোহ্‌রি বাজারে শাল গাছ বেচার কথা না বলে। গাড়ির জমিতে হলেও শাল গাছ বেচা বে-আইনী। শাল সরকারের গাছ।

রাখ্‌ তোর আইন। আইন মতে জমি কে রাখে, এ তল্লাটে শাল গাছ কে বেচে না?

মেরী বনোয়ারীকে সরাসরি বলল, আমি তোমাদের গাছ বেচার কথা তোহ্‌রি বাজারে বলেছি?

বলেছিস্‌ বলেছি? বলতে মানা করেছি।

আমাকে হুঁশ দিতে হবে না।

মেরী চলে গেল। প্রসাদজী বললেন, এ ঠিক বাত নয়। তোর বন্ধুকে বলে দিবি। বাড়িতে থাকে, মেয়ের মতন, ওকে কিছু বললে আমার অপমান?

বনোয়ারী তশীলদারকে বলল, য়ো বহোৎ খচড়াই আর রুঠা হায়ে। কারুক্কে পাত্তা দেয় না।

কে পাত্তা চায়?

তা ছাড়া ওর সাদীও ঠিক হয়ে আছে।

কোথায় ?

মুসলমানের ঘরে।

রাম রাম ! সমাজে কি ছেলে নেই ?

ওর পছন্দ।

তশীলদারের বিশ্বাসই হল না, কুরুডার মতো জংলী গ্রামের মেরী ওঁরাও ওকে উড়িয়ে দিতে পারে। গাছ দাগানো ও কাটা, টুকরো করা ও চালান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও মেরীর সঙ্গ ধরে থাকল। মেরী ওকে পাত্তা দেবে না, মুসলমানকে বিয়ে করবে, তাতে ওর জেদ বেড়ে গেল।

এরপরেই ও মেরীর জন্যে ডালটনগঞ্জ থেকে একটা নাইলন শাড়ি কিনে আনে, প্রসাদজীর জন্যে মিষ্টি। প্রসাদজীকে বলে, কত আসি যাই, চা-য়ো খাওয়ায়, একটা কাপড় দিলাম। প্রসাদজী নিতে রাজী হল না, কিন্তু তশীলদার শোনেনি। মেরী গিয়েছিল তোহ্‌রি। ফিরে এসে কাপড়টার কথা ও শোনে। প্রথমে প্রসাদজীকে পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দেয়। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চা-রুটি খায়। তারপর বেরোয় কাপড় নিয়ে।

তশীলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে-মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে কাপড়টা ছুঁড়ে দেয়। বলে, শহরের রাণ্ডী পেয়েছিস আমাকে। কাপড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিস ? ফের বদমাশি করবি তো নাক কেটে নেব। হাত দুলিয়ে বেরিয়ে যায় ও সগর্বে।

তশীলদারের মুখ খুব ছোট হয়ে যায় ওদের কাছে। সে বলতে যায়, ভালো মনে একটা জিনিস দিলাম ·

গাঁওবুড়ারা বলে, আর দিস না।

কি বললে ?

আর দিস না।

উ কা আচ্ছা ঔরত হ্যায় ? মুসলমানকো সাথ সাদী করেগা কোই আচ্ছা ঔরত ?

আর বলিস না।

হঠাৎ তশীলদার বোঝে, সে এবং তার লোকজন সংখ্যায় কম, এরাই বেশি। সকলের কাছেই বলোয়া বা দা! সে চুপ করে যায়।

রাতে ড্রাইভারও তাকে বলে, এ সব নাখারা উঠাবেন না। য়ে আদিবাসী লোক খচড়াই হোতা। কোই থানামে পাত্তা চলায়ে তো মুশকিল হোয়েগা।

ড্রাইভার জানে, তশীলদারের ঘরে বউ ছেলে আছে। জানে, তা সত্ত্বেও তশীলদার মেয়েদের লালচে মরে। মেরী খুবই মোহনিয়া বটে, কিন্তু সেই কারণে আদিবাসীদের খেপিয়ে দিয়ে থানা-পুলিস করা বোকামি। মেরী যদি রাজী থাকত, তাহলে কোন কথাই উঠত না। মেরী নারাজ। তশীলদারকে সেটা মেনে নিতেই হবে।

এরপর প্রসাদজীও গম্ভীর হয়ে যায়। চা আনতে থাকে ভিক্নি। তশীলদার ও বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু মেরীর ধান্দা ও ছাড়ে না।

মেরী যখন গাই চরিয়ে ফেরে, তোহ্‌রি থেকে ফেরে, তোহ্‌রি যাবে বলে তিন মাইল দূরে মুরহাই স্টেশনে যায়, হাট করতে যায় ধুমা, তশীলদার ওর সঙ্গে দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করে।

মেয়েরা বলে, মেরী ও ঠিকাদার তোকে ভালোবাসে।

হাতের মধ্যে পাচ্ছে না বলে। পেলেই ভালোবাসা উপে যাবে। আমার মাকেও তো সাহেব ভালোবেসেছিল।

সাদী করবে তোকে।

ওর বউ আছে।

তাতে কি?

ছাড় ওর কথা।

গাছ কাটা চলতে থাকে। ক্রমে শীত কমে। পলাশ গাছ এখানে মাইলের পর মাইল। গাছে নতুন কুঁড়ি আসে। তারপর একদিন পহানের ঘরে নাগারা বাজে। জানা যায়, হোলির দিন আদিবাসীদের যে শিকার খেলার নিয়ম আছে, এবার সে শিকার মেয়েদের। বারো বছর পুরুষরা এ দিনে শিকারে যায়। তারপর আসে মেয়েদের পালা। পুরুষদের মতো তারাও বেরোয় বলোয়া—তীর ধনুক নিয়ে। জঙ্গলে

পাহাড়ে ছোটে। শজারু—খরগোশ—পাখি যা পায় তাই মারে। তারপর সবাই মিলে বনভোজন করে, মদ খায়, গান গায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। পুরুষরা যা যা করে, ওরাও ঠিক তাই করে। বারো বছরে একদিন। তখন হোলির আগুন জ্বেলে ওরা গল্প করতে বসে। বুধনি গল্প বলে, সেবার আমরা গুলবাঘা মারলাম। আমি তখন জোয়ানী ছিলাম।

গল্প শোনে বুড়িরা, প্রৌঢ়ারা রাঁধে, জোয়ান মেয়েরা গান গায়।

কেন ওরা শিকার করে, তা ওরা জানে না। পুরুষরা জানে। হাজার-লক্ষ চাঁদ ধরে ওরা এ দিনে শিকার খেলছে। একদিন বনে জানোয়ার ছিল, জীবন বন্য ছিল, শিকার খেলার অর্থ ছিল। এখন বন শূন্য, জীবন অপচিত ও নিঃশেষ, শিকার খেলা অর্থহীন। স'ত্যি শুধু একদিনের আনন্দটুকু।

তশীলদারের ক্লান্তিহীন একাগ্র অনুসরণে মেরীর ধৈর্য চলে যাচ্ছিল। জালিমও জেনে যেতে পারে। জানলে সে খেপে যাবে। হয়তো বাগে পেলে তোহ্‌রি বাজারে মারতে যাবে তশীলদারকে। তশীলদারের অনেক টাকা, অনেক লোকজন। শহুরে খচড়া কোন চুরির মামলা সাজিয়ে শেষ পর্যন্ত জালিমকে ফাঁসাতে পারে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য হারাচ্ছিল তশীলদারও। গাছকাটা হয়ে যাবে শীঘ্রই, কারবার গুটিয়ে চলে যেতে হবে, তখন কি হবে? তশীলদার একদিন মেরীর হাত চেপে ধরল।

সময়টা অনুকূল ছিল। এবার পুরুষদের শিকার খেলা নেই। পুরুষরা মদ খাবে, হোলির গান বাঁধবে নতুন নতুন, সং সেজে গাইতে বেরুবে, পয়সা নেবে। তশীলদার ওদের হোলির মদ দেবে বলেছে।

গাছ কাটাইয়ের জায়গা থেকে ঘরে ফিরেই গান, রোজ গান। টানা বৈচিত্র্যহীন সুরে। তাই শুনছিল মেরী। হাট ফেরত। শুনতে শুনতে সন্ধে হল। ও ঘরের দিকে রওনা হল।

তশীলদার জানত ও আসবে। ওর হাত চেপে ধরল তশীলদার। বলল, আজ ছাড়ব না।

মেরী প্রথমে ঘাবড়ে যায়। ধস্তাধস্তিতে দা-টা ছিটকে পড়ে। অনেক চেষ্টায়, অনেকক্ষণ নীরব ধস্তাধস্তির পর মেরী ছিটকে সরে আসতে পারল। দুজনেই উঠে দাঁড়াল। তশীলদারের চোখে এখন কালো চশমা নেই। বড় জুলপি, লম্বা চুল, টেরিক্লথের প্যান্ট, সুঁচলো জুতো, গায়ে ঘন লাল জামা। হোলির গানের পটভূমিতে ওকে একটা জানোয়ার মনে হল মেরীর। জা-নো-য়া-র! শব্দগুলো মনে ধাক্কা মারল। হঠাৎ মেরী হাসল।

মেরী!

ব্বাস, ওখানেই থাকো। এগিও না।

কি দেখছিস?

তোমাকে।

আমি তোকে—

আমাকে খুব চাও তুমি, তাই না?

খুব।

ভালো।

কি ভালো?

বুঝলাম সত্যিই চাও।

সত্যিই চাই। তোর মতো মেয়েমানুষ আমি দেখিনি। লাখ টাকার মাল তুই। তোর কদর করবে ও বাজারিয়া? ও মুসলমান?

তুমি করবে তো?

নিশ্চয়। কাপড় দেব, গহনা দেব—

আচ্ছা?

সব দেব।

মেরী খুব জোরে জোরে নিশ্বাস টানল। তারপর বলল, আজ নয়। আজ আমি অশুচ আছি।

কবে, মেরী কবে?

মেরীর চোখ ও মুখ কোমল হল। বলল, হোলির দিনে। তুমি থাকবে ওই বুরুর কাছে। সব মেয়েরা শিকার খেলতে দূরে দূরে যাবে।

আমি তোমার কাছে আসব। তুমি তো জানো কোন্ বুরু! তুমি তো সেই পাথরটার আড়াল থেকে আমায় দেখ।

বুঝেছি।

তবে সেই বাত রইল?

হাঁ মেরী।

কারুকে বোল না কিন্তু! মরদের তো দোষ লাগে না, ঔরতের দোষ লাগে। আমি তো বেজন্মা, তায় মুসলমানকে সাদী করতে যাচ্ছিলাম।

করবি না তো?

আর করি? তুমিও একটু ধৈর্য ধরে থেক। ও রকম করে আমার পিছনে ঘুরো না।

তোর জন্যে যত কষ্ট করলাম···

সব পুষিয়ে দেব। হোলির দিনে।

মেরী ওর গালে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, তুমি বড় ভালো গো! আগে বুঝিনি। হেলেদুলে মেরী রওনা হল। ও জানত, আজ তশীলদার ওকে পিছন থেকে দ্বিতীয় বার জাপটে ধরবে না।

তিন

আগের রাতে আগুন জ্বলেছে, আজ রাতেও জ্বলবে। কাল রাতে হোলির আগুন অনেক ওপরে উঠে আকাশ রাঙা করে রেখেছিল বেশ কিছুক্ষণ। আজ সকাল হতেই পুরুষরা মেতেছে মদে-গানে-আবিরে। অত্যন্ত বুড়ী যারা, তারা কয়েকজন বাচ্চাদের আগলাচ্ছে।

মেয়েরা সবাই বনে। যে যার ঘরের সামনে বলোয়া—পুরুষদের তীরধনুক নিয়ে উত্তেজনায় টান্ টান্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পহান্ নাগারায় ঘা দিতেই ওরা কুলকুলি তীক্ষ্ণ আওয়াজে আকাশ চিরে দিয়ে ছুটে গেছে। ভিক্‌নি ছুটেছে প্রসাদজীর একটা শার্ট আর প্রসাদ-গিন্নীর সায়া পরে।

বুধনি, মুংরি, সোমারি, শনিচরী—এদের ছোটাছুটির দিন বিগত। ওরা মদের বোতল, রান্নার চাল-ডাল, বাসন, মদের চাট, মকাই ভাজা, পেঁয়াজ-লঙ্কা নিয়ে গেছে পরিত্যক্ত বম্‌ফিল্‌ড বাংলায়। সেখানে কুয়োয় জল আছে। পুরুষরাও শিকারের পর ওখানেই রাঁধে ও খায়। বুধনি মেয়েদের বলেছে, আমাদের সময়ে আমরা খরা-শজারু তিত্তির, কিছু না নিয়ে ফিরতাম না। দেখব তোরা কি করিস। শিকার কেমন করিস?

মেরী আজ জালিমের দেওয়া নতুন শাড়ি পরেছে, পুঁতির মালা। নাচতে নাচতে বুধনিকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, শিকার খেলে এসে তোকে সাদী করে নেব। তখন আমি বর, তুই বউ।

তাই হবে।

তোকে নাচাব।

নাচব।

মেরী আজ আনন্দে উপছে পড়েছে। মায়ের পোষা মুরগি চারটে ও কিনে নিয়েছে মার হাতে নগদ দশ টাকা দিয়ে। মুরগিগুলো এখন শনিচরীর হাতে। মেরী মদও দিয়েছে দু' বোতল। এটা উপরি। মেয়েরা আগেই তশীলদারের কাছে মদ চেয়ে নিয়েছে। তশীলদার পুরুষদের মদের ওপর খাসীও দিয়েছে একটা। বলেছে, সন্ধ্যায় ও এসে সকলকে শহরের টুইস্‌ নাচ দেখাবে। মদ খাবে বোতল বোতল। গাছ কাটা হয়ে গেছে ওর, পড়ে আছে কাটা গাছের টুকরো। সে অনেক। তশীলদার অসীম উদারতায় সেগুলো কুরুডার লোকদের জ্বালানি করতে দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আবার আসব, তোদের দিয়েই গাছ কাটাব। তখন মদে চুবিয়ে রাখব তোদের।

বুধনিদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করে মেরীও ছুটে গেল। শনিচরী বলল, ওঃ, মেরীকে কেমন দেখাচ্ছে আজ? যেন মুল্‌নিজীর বেটার বউ।

বুধনি বলল, ও বিয়ে করে চলে গেলে কুরুডা কানা হয়ে যাবে।

মুংরি বলল, কখনো খালি হাতে টোলিতে আসেনি। তোরা ওকে দেখছিস, ভুলে গেছিস, ভিক্‌নি কত সুন্দর ছিল জোয়ানীতে?

সোম্‌রি দুলছিল আর হাঁটছিল। সহসা ও প্রায় চোখ বুজে গেয়ে উঠল,

হোলিতে আগুন রে হোলিতে আগুন
তুমি দেখে দেখে ঘরে এসো ভুলে থেকে' না—'

অন্যরা তার সঙ্গে ধুয়ো ধরল। বিগতযৌবন, প্রৌঢ়া, চারটি জরতী প্রেমের গান গাইছে, রোদ তাতছে, নেশা জমছে, দূর-দূরান্তে নাগারা ও ভেঁপুর শব্দ।

মেরী ছুটে চলল। মেয়েরা সবাই কুরুডা পাহাড়ে উঠছে, জঙ্গলে ঢুকছে, নালার ধারে যাচ্ছে। মেরী হাসল। শিকার ওরা পাবে না· সব খেলার মতো শিকার খেলারও নিয়ম আছে। শজারু-খরগোশ-তিতির মেরে কি হবে? বড় শিকার মারতে হয় টোপ ফেলে।

রঙিন শাড়ি ও লাল জামায় মেরী এখন চলন্ত পলাশ গাছ যেন। যেন, বাতাসে এক ঝাঁক পলাশ ফুল ছুটে যাচ্ছে। চারদিকে পলাশ আর পলাশ। লালে লাল সব। একটি খরগোশ ছুটে গেল। মেরী হাসল। ও জানে ওর বাসা কোন্ গর্তে। চলে যা! ভয় নাই! মেরী হেসে বলল। ওঃ, মদের নেশায় কি মাতন। রক্ত নাচছে উদগ্র পিপাসা। তশীলদার তশীলদার, আমি এলাম বলে। তশীলদার ওকে খুব চায়। এখন ওর কাছে জালিম কিছু নয়। তশীলদার ওকে কত উগ্রতায় চাইতে পারে? কত ডিগ্রী ফারেনহাইটে? মেরীর মতো বন্য রক্ত আছে ওর? এত সাহস?

একটি শজারু। যা, চলে যা! আজকের দিন না হলে ওটা মারত মেরী, মাংস খেত। আজ আর ছোট কিছুতে মন উঠবে না ওর। শিকার চাই, বড় শিকার! মানুষ চাই, তশীলদার। দূর থেকে বুরুটি দেখা গেল। সিধা, খাড়াই পাথর। ওপর থেকে কার্নিশের মতো বেরিয়ে থাকা পাথর। সেখান থেকে গিটগিন্দা লতা নেমে লতাজাল সৃষ্টি করেছে। জালের গায়ে হলুদ গিটগিন্দা ফুল। জালের পিছনে আড়াল। ভাবতেও রক্ত চমকাল মেরীর। তারপর এগিয়ে গিয়ে লতাজালের পিছনেই খাদ, খাদের পাড়ে আলগা পাথর। খাদের ভেতরটা কত গভীর কেউ জানে না। কেউ নেমে দেখেনি। সেই

অতল ও শীতল অন্ধকারে যদি নামা যেত? সে ও তশীলদার! তশীলদারের গাঢ় লাল শার্ট চোখে পড়ল।

বিলিতী মদ, সিগারেট, তশীলদার।

চলো জী অন্দর চলো।

অন্দর কাঁহা? তোরি অন্দর মেঁ ঘুসেঁ?

হাঁ জী, হাঁ।

খাদের ধারে। লতাজালের আড়ালে।

পহ্‌লে দারু পিও।

শুধ্‌ দারু কেন? সিগারেট দাও।

কেমন খেলি?

বহোৎ বঢ়িয়াঁ।

অত তাড়াতাড়ি খাস না।

নেশা চাই যে?

কত?

অনেক, অনেক নেশা চাই। আরো মদ। নেশা হচ্ছে। মাথায় তারা জ্বলছে-নিভছে। আঃ, নেশায় চোখে ঝালর নামছে। ঝালরটা ঝিলমিলে। ঝালরের ওপারে তশীলদারের মুখ। আরো মদ। বোতলটা গড়িয়ে গেল। খাদের গভীরে। শব্দও হল না। খাদ কত গভীর? মুখটা এবার, হ্যাঁ এবার শিকারের মতো হচ্ছে বটে।

মেরী সাদরে তশীলদারের মুখে হাত বোলাল, ঠোঁটে চুমকুড়ি খেল। তশীলদারের চোখে আগুন, মুখ হাঁ, ঠোঁট লালামাখা, দাঁতে ঝিলিক, মেরী দেখছে, দেখছে, মুখটা বদলাতে বদলাতে এবার? এবার? হাঁ, জানোয়ার হয়ে গেল।

অব লে মুঝকো?

মেরী হেসে ওকে জড়াল, মাটিতে শোয়াল, তশীলদার হাসছে, মেরী দা-টা ওঠাল, নামাল, ওঠাল নামাল।

কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়াল। রক্ত? জামায়? কাপড়ে? নালায় ধুয়ে নেবে। ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে ও তশীলদারের পকেট

থেকে পার্স নিল। অনেক টাকা। অনে—ক টাকা। কোমরের গেঁজে খুলে নিজের সঞ্চয়ের টাকার সঙ্গে টাকাগুলো রাখল।

তারপর আগে তশীলদারকে খাদে ফেলল, ওর পার্স, সিগারেট, রুমাল। পাথরের পর পাথর। রক্তের গন্ধে রাতেই হায়েনা চলে আসবে, নেকড়ে। কিংবা আসবে না।

মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছে ও।

মেয়েদের জমায়েতে মেরী সবচেয়ে বেশি মদ খেল, গান গাইল, নাচল, সবচেয়ে তারিয়ে তারিয়ে মাংস-ভাত খেল। শিকার পায়নি বলে সবাই ওকে প্রথমে খোঁটা দিল। তারপর বুধনি বলল, কি রকম করে খাচ্ছে দেখ? যেন সবচেয়ে বড় শিকার ও করেছে।

মেরী এঁটো মুখেই বুধনিকে চুমু খেল একটা। তারপর দুটো খালি বোতল হাতে নিয়ে ঠুকে ঠুকে নাচতে শুরু করল। বিকেলের বাতাস ঠাণ্ডা। শনিচরী আগুন জ্বালল।

মদ আর গান, মদ আর নাচ। সবাই যখন আগুন ঘিরে গোল হয়ে নাচছে, যখন গাইছে,

হে হরম্‌দেও,
এমন হোলি বছর বছর হোক—
এমনি শিকার বছর বছর করি—
মদ দিব তোমাকে
মদ দিব—

তখন নাচতে নাচতে মেরী পিছোতে থাকল। পিছোতে পিছোতে অন্ধকারে। ওরা নাচছে, খুব নাচছে। মেরী অন্ধকারে ছুটে চলল। পথ ওর নখদর্পণে। কুরুডা পাহাড় দিয়ে ও আজ রাতে সাত মাইল হেঁটে তোহ্‌রি যাবে। জালিমকে ডেকে তুলবে। তোহ্‌রি থেকে বাস যায়, কাঠের ট্রাক। ওরা চলে যাবে কোথাও। রাঁচি—হাজারীবাগ—গোমো—পাটনা। আজ, বড় শিকারের পর, ওর জালিমকে চাই।

দূরে দূরে হোলির আগুন। অন্ধকারে, তারার আলোয় রেললাইন দেখে পথ চলতে চলতে মেরীর মনে কোন ভয় এলো না, কোন জানোয়ারের ভয়। আজকে ও সবচেয়ে বড় জানোয়ার মেরেছে বলে বন্য চতুষ্পদদের বিষয়ে সব প্রাত্যহিক, রক্তে অভ্যাসের ভয় ওর চলে গেছে।

শিশু

জায়গাটির নাম লোহ্রি এবং জায়গাটি রাঁচি-সরগুজা ও পালামৌ তিন জেলার সীমারেখার মিটিং পয়েন্টে অবস্থিত। অফিসিয়ালি রাঁচিতেই। কিন্তু সমস্ত জায়গাটি দগ্ধ প্রান্তর বিশেষ। যেন ভূগর্ভে ভীষণ তাপ এখানে। তাই গাছগুলি বামন-বামন, নদীর বুক শ্মশান, গ্রামগুলি অবধি ধূলিধূসর। মাটির রং খুব অদ্ভুত। লাল মাটির দেশেও এমন গাঢ়, বাদামী-লাল চোখে পড়ে না। রক্ত শুকোবার আগে এ রকম নিষ্প্রাণ লাল হয় বটে।

রিলিফ-অফিসারকে ব্রিফ করা হয়েছিল এখানে আসার আগে। এই অফিসার অত্যন্ত সৎ ও দরদী। অনেক বাছাই করে তবে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। বলে দেওয়া হয়, জায়গাটি বহুৎ খচ্ড়া। অধিবাসীদের কোনো অনেস্ট ওয়ে অফ লিভিং নেই।

—কেন?

—চাষ করে না।

—কেন? জমি আছে?

রিলিফ অফিসার ও বি. ডি. ও, বাংলোয় বসে কথা বলছিলেন। বাইরেটা এখনো জুড়োয় নি। রাতে বাংলোর হাতার মধ্যে নেয়ারের খাট পেতে দেবে চৌকিদার। এত গরমে এখানে কেউ ঘরে ঘুমোয় না। রিলিফ অফিসার মাত্র তিন মাসের জন্য এই কাজে বহাল হয়েছেন। খাদ্যবিভাগ তাঁকে ধার দিয়েছে। জীবনে তিনি এ হেন রোদেপোড়া, অখাদ্য জায়গা দেখেন নি। ত্রাণ যারা নিতে আসে, সেইসব উলঙ্গপ্রায়, শীর্ণ, ক্রিমি ও প্লীহা ফোলা পেট মানুষজন দেখে তাঁর খুব বিশ্রি লেগেছে। তাঁর ধারণা ছিল, আদিবাসী পুরুষরা বাঁশি বাজায় ও আদিবাসী রমণীরা ফুল পরে নাচে। গান গেয়ে তারা পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছোটে।

নিজে জীপ রেখে নিচু বুরুর ওপরের গ্রামে উঠতে গিয়ে বুঝেছেন, ছুটে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বুকে হাঁপ লাগে। আদিবাসী জীবনে

গানের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি জানতেন। এখন শুনতে পাচ্ছেন ওদের গান। একটানা. বুড়ী ডাইনীর নিঃসঙ্গতার কান্নার মতো। খুবই নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতা। রিলিফ অফিসার, ফিলিম, বিশেষ হিন্দী ফিলিম দেখে আদিবাসী জীবন সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা করেছিলেন। এই যদি ওদের গান হয়, তাহলে মডাকান্না কাঁদে কি করে? এ গানই তো কান্নার মতো। অস্বস্তি! অস্বস্তি!

—ওরা গান গাইছে কেন?

—জংলী লোক। যা হয়, সব কিছু মনে করে অপদেবতার খেলা। গান গেয়ে ভূত তাড়াচ্ছে।

'ভূত' শব্দটিতে অস্বস্তি। বি. ডি. ও. দেখলেন ও হাসলেন। বললেন, ভয় পেলেন?

—না না।

—এই খরা আর আকালও ওদের কাছে অপদেবতার অভিশাপ।

—ও।

—খুব খারাপ জায়গা। ভালো জায়গায় হিন্দু লোক থাকে, মহাবীরজীর ধ্বজা ওড়ে, এখানে কিছু নেই। আমি কবে যে বদলী হব!

—আমি কাল কোথায় যাচ্ছি?

—লোহ্‌রি। খুব খচড়াই জায়গা। বেটাদের জমি দিলেও মহাজনকে বেচে দেয়। আঁখ মোটা করে বলে, জল কই? বিছন কই? হাল কই? ভৈঁষা কই? চাষ করব কি করে? সব দিলে ভি মহাজনকে বেচে দিবে। বলবে, ফসল ওঠা তক্ কি খাব? ধার নিলাম। জমি বেচে শোধ দিলাম।

—সেখানে কি থাকতে হবে?

—হ্যাঁ। ক্যাম্প করবেন। থাকতেই হবে। ক্যাম্প চালু করে দিয়ে আসবেন। আমি লোক পাঠাব, ভাববেন না, ঔর ভয় খাবেন না।

—কিসের ভয়?

—চোরের।

—চোরের ?

—হাঁ। যতবার রিলিফ যায়, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে চুরি করবে এক-দো বস্তা চাল। চাল-মাইলো-গুড়, যা পাবে।

—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ?

—হাঁ। তাদের কেউ ধরতেও পারে না। কেউ কেউ দেখেছে। আমি সেবার নিজে দেখলাম। সঙ্গে বন্দুক ভি ছিল।

—আপনি বন্দুক রাখেন ?

—লাইসেন্স। বন্দুক। লোহ্‌রি খুব খচড়াই জায়গা। দশ বছর আগে···না, বারো সাল হল···খুব বলোয়া হয়···আগ জ্বলে যায়।

—সে কি ?

বি· ডি. ও. বললেন, আমি তখন চাকরিতেই ঢুকি নি। লোহ্‌রি জায়গাটার কহানী জানেন ?

—না।

কিছুই জানেন না রিলিফ-অফিসার, জানতেও চান না। চাকরির খাতিরে রাঁচি শহরের আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছেড়ে এখানে এসেছেন।

—এখানে, মানে ওখানে থাকত লোহার লোক। আগরিয়া। আগরিয়ারা, কহানীতে বলে অসুরের বংশ। ওদের কাজই ছিল মাটি থেকে লোহা উঠিয়ে কামারশালে লোহার জিনিস বানানো। ওরা আগুন খেত, আগুনের নদীতে স্নান করত, ওদের নগর ছিল লোহ্‌রি। রাজার নাম লোগুন্‌ডি। মাটির নিচে যে অসুররা থাকে, তারা শুধু আগরিয়াদের পাতালে নেমে লোহা উঠাতে দিত। শুধু আগরিয়াদের।

—তারপর ?

—ওদের রাজার নাম লোগুন্‌ডি। লোগুন্‌ডি রাজারা বারো ভাই। বারো ভাইয়ের এক বউ।

—দ্রৌপদীর চেয়েও সরেস।

—লোগুন্‌ডি রাজার গরব উঠে গেল, সুরজ দেওতার চেয়ে তার তেজ বেশি। সুরজ দেওতা চলে এল লোহ্‌রি। সুরজের আগুনে লোগুন্‌ডি রাজা, তার এগারো ভাই, লোহ্‌রি নগর, সব জ্বলে গেল।

বউ ভিন্ গাঁয়ে ছিল, বেঁচে গেল। সুরজের তেজে জ্বলতে জ্বলতে বউ পালাল এক গোঁড়ের ঘরে, ঔর মাট্ঠার হাঁড়িতে নেমে তার আগুন জুড়াল। সেখানে, ছিন্দি গাছের নিচে তার ছেলে হল। নাম জ্বালামুখী।

—বাপ্ রে!

জ্বালামুখী জোয়ান হয়ে সুরজের সঙ্গে লড়াই করতে গেল। ওই লোহ্রিতে দুজনের লড়াই হয় ঔর সেই তেজেই ওখানে মাটি জ্বলে গেল। লড়াই হথে, জ্বালামুখী সুরজকে শাঁপ দিল। চাঁদ যখন পুনম্-এ থাকবে, তখনি তোমাদের, মরদ-আওরতের মিলন হবে। সুরজ দেওতা বলল, তোরা আগরিয়ারা লোহার কাজ করে যথ দৌলত পাবি, সব ছাই হয়ে উড়ে যাবে। সেই থেকে আগরিয়ারা গরিব।

—জংলী কহানী।

—সে তো বটেই।

—আগরিয়া লোকেরা এখন ওই রকম হয়ে গেছে। জাত বেওসা, লোহার্ কাম ভি ওদের ছুটে গেছে। কিন্তু ওদের চাষ-খেতী কামে লাগানো কঠিন। ওরা বলে, ওরা অশুচ হয়ে আছে। লোহাসুর ওদের লোহা দেয় না কয়লাসুর দেয় না কয়লা। আগাইয়াসুর দেয় না আগুন। একদিন ওদের দিন আসবে।

—বলোয়া কা বাত বাতাইয়ে।

—বারো-চোদ্দ সাল আগে ভারত সরকার লোক পাঠায়। লোহ্রিতে আয়রনওরের তালাস করে। কুভা গ্রামের লোকরা ছিল খচড়াই আগরিয়া। তারা বলে, ওহি বুরুতে আমাদের তিন অসুর দেওতার বাস। ওখানে তালাস চালাবে না। দু পাঞ্জাবী অফ্সর মাদ্রাজী জিওলজিস্ট, তারা কি মানবে জংলী অসুরদেওতার কথা? বুরু উড়িয়ে দেয় ব্লাস্ট্ করে।

—উস্কে বাদ?

—কুভা গাঁও থেকে আগরিয়ারা এসে সবাইকে কেটে ফেলে। উস্কে বাদ জঙ্গল মে ঘুসে যায়।

—ঘুসে যায়?

—হাঁ। ওহি যে ঘুসে গেল, ইয়ে সমঝিয়ে মিস্টার সিং, ওহি যে ঘুসে গেল, বাস্! একদম খোয়ে গেল। ঔর কেউ ওদের দেখেনি। একশো-দেড়শো মানুষ!

—বলেন কি?

—ওহি তো তাজ্জব কী বাত।

—বাস্, বে-হদিস?

—বে-হদিস! বে-খবর!

—গরমেণ্ট পাত্তা চালাল না?

—বরাম্ভবনের বিংবা যেমন চাল থেকে কীড়া বাছে, তেমন করে জঙ্গল বাছল।

—তব্ ভি মিল্ল না?

—না।

—উস্কে বাদ?

—গরমেন্‌ট খুব তালাস চালাল। বিনা কুভা গ্রাম, কোনো গ্রামের মানুষ বেপাত্তা হয় নি। ইসি সে পরকাশ হুয়া কা ঔর কোই অপরাধী নেই থে। তালাস চলল এক মাস। উস্কে বাদ কুভা গ্রাম জ্বালিয়ে নাশ করে, গ্রামের মাটিতে লবণ ঢেলে পুলিস চলে এল। ঔর সব আগরিয়া গ্রামে পিটুনি খাজানা বহোত জুলুম করল।

—তাদের পাত্তা মিলে নি?

—না।

—কোথায় গেল?

—জঙ্গল। জঙ্গল মেঁ কত বৃক্ষ, কত গোমফা, কোথা গেল কে বলবে?

—সব লোহ্‌রিতে?

—হাঁ।

—আপনি কেন বন্দুক নিয়ে যান?

—ভয় করে। অত অত লোক! কোথা ছিপাকে আছে, যদি আসে?

—সেই জন্যে ?

—না।

—তব্ ?

—রিলিফ যখনি যায়, চুরি হয়। আগে চার বস্তা, পাঁচ বস্তা চুরি হত। কয়েক বছর ধরে দু তিন বস্তা চুরি হয়। জায়গাও বহোত্ খারাব। কে জানে মাটিতে কি আছে! কুছ্ হোতাই নেহি। আমার ভাতিজাও একবার খেতি করতে চেষ্টা করল। কিছু হল না। না ধান, না জোয়ার, না মাড়োয়া, না ভুট্টা। লাঙল চোটালে নিচে যেন লোহা। য়ো এক অভিশপ্ত ভূমি হ্যায়। দেখেই মালুম পড়ে।

— এখনো চুরি হয় ?

—হ্যাঁ। সবাই বলত, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আঁধারে এসে চুরি করে। আমি ভেবে নিলাম, রিলিফ কা মাল তো রিলিফ-বাটনেওয়ালা লোক চুরি করেই থাকে। চুরি করে, কাউকে বেচে দেয়। গরমেন্ট কিছু জানে না। শীত-গ্রীষ্ম, রিলিফ পাঠালেই কম্বল ভেজবে, কাপড়ালত্তা। য়ো জংলী লোক কা করে গা ধারিওয়ালী কম্বল ঔর আচ্ছা কাপড়া ঔর চিনি দিয়ে ? সব তো তারাও বেচে দেবে, আর মহাজন বানিয়া টর্চবাতি, দেশলাই, কি আয়না দিয়ে সব কিনে নেবে। এ জানে বলেই রিলিফ-বাটনেওয়ালা লোক সব বেচে দেয়। এতে আমি কোন দোষ দেখি না।

—কিন্তু এ তো ঠিক নেহি হ্যায়।

—এইসান্ বে-ঠিক কাম তো হোতাই হ্যায়। দেখুন না, ও বাংলা-দেশ যুদ্ধের টাইমে গরমেন্ কলকাতা হতে যত রিলিফ ভেজল, তামাম দুনিয়া হতে জামা-কাপড়-কম্বল-মশারি-বাসন-স্টোভ-জুতা—সব আমরা রাঁচি বাজারে কিনলাম না ?

—তাও বটে।

—সে যাক। আমি ভাবলাম, নিজেরা রিলিফ চুরি করে আর গপ্ উড়ায় কা বাচ্চা লোক চুরি কর্তা। তা আমি সেবার নিজে গেলাম। সঙ্গে বিশ হাজার টাকার মাল, সিপাহী ভি মেঙে নিলাম। ক্যাম্প হবে

লোহ্‌রিতে। সবাই আসবে, নেবে। কিন্তু রাত ভি খুব কালো ছিল, মাথার চুলের মতো, গরমও খুব। আমি বাহারে শুয়েছিলাম। হঠাৎ কেমন শব্দ। উঠে দেখি কি বস্তা নিয়ে ছোট ছোট মানুষ, বাচ্চাই হবে, পালাচ্ছে।

—আপনি কি করলেন?

—আকাশে বন্দুক ফুটালাম। কি করব। বাচ্চাদের গায়ে মারব? কিন্তু য়ো লোক ভেগে গেল। নাঙ্গা ছিল, বাচ্চা। গুলি মারব?

—তাও তো বটে।

—ঔর ভাবলাম, রিলিফের মাল তো কত চুরি হয়, কতজন নাফা করে, বাচ্চা লোক না হয় নিল।

—ঠিক বাত।

—লেকিন্!

—কি?

বি. ডি. ও. ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্ধকার অত্যুষ্ণ ও গলন্ত। গলে গলে পড়ে বিশ্বচরাচরের সব ইন্দিছিন্দি যেন বুজিয়ে দিয়েছে এই অন্ধকার। মাটি থেকে উঠন্ত ধুলো ও ভাপে বাতাস অস্বচ্ছ। তাই আকাশের তারাও তেমন উজ্জ্বল নয়। চাঁদ উঠবে বেশি রাতে।

বি. ডি. ও. বললেন, কারুকে বলি নি। কিন্তু আপনি ভালো লোক, রাজ্যমন্ত্রী আপনার মৌসা লাগেন, আপনাকে আজ যে কথা বলব তা কাউকে বলি নি। কিন্তু আপনাকে বলব, ঔর বিপদের আসানী ভি দিয়ে দেব।

—কি কথা?

—জানেন মিস্টার সিং? ও জায়গাটা তো বদনামী। অসুর-বোঙা-ভূত কি আছে বলে সবাই। আমি দেখেছিলাম, যে বাচ্চারা বস্তা নিয়ে ভাগছে, তারা মানুষের বাচ্চার মত নয়।

—কি বললেন?

—হাত-পা সব অন্যরকম।

—কি রকম ?

—তা বলতে পারব না। কি লম্বা চুল, আর কি রকম হেসে যে চলে গেল !

—আমার ভয় করছে।

—আপনার কোনো ভয় নেই। এই কথাটা বলব বলে আজ ফেরত গেলাম না টাহাড়। থেকে গেলাম। আপনার মেসোমশাই রাজ্যমন্ত্রী, আপনার জানের জিম্মাদারী মেরে পাস। আমি এই পরসাদ এনেছি মহাবীরজীর। পাকিট মেঁ রাখ্ দিজিয়ে। এ যার কাছে থাকবে তার কোনো ভয় নেই।

—বন্দুক নেই যে ?

—তাতে কি ? সঙ্গে লোক থাকছে।

—বন্দুক-সেপাই বা পুলিস···

—এখন তো মাঙাবার কোনো উপায় নেই। ঠিক আছে। আপনি তো কাল যাচ্ছেন। এর পরে যারা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে পুলিস পাঠাবার কৌশিস্ আমি করব।

—চলুন খেয়ে নিই।

—আগে স্নান করুন।

কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নান। মেসোমশাই রাজ্যমন্ত্রী। ফলে খাওয়ার টেবিলে উৎকৃষ্ট চালের ভাত। ভাতে মটরশুঁটি। মাংস, গুলাবজামুন, আচার।

রাতে বাইরে খাট। মাটি জলে ভেজানো। ফলে সামান্য ঠাণ্ডা।

কিন্তু ঘুম আসে কোথায় ? সূর্য আর একটি বালকের যুদ্ধ। একটি বুক। অন্ধকার থেকে ঝল্‌কে ওঠা বল্লায়া। কয়েকটি মৃতদেহ। বিধবা, ব্রাহ্মণের বিধবা যেমন করে চালের পোকা বাছে, তেমনি করে পুলিস জঙ্গল বাছছে। রিলিফ। অন্ধকারে অতিমানুষী শিশুরা চাল চুরি করছে। ছবির পর ছবির মিছিল। মুখে তাপ লাগতে তবে রিলিফ অফিসার বুঝলেন, খুব ঘুমিয়েছেন। টেনে। এখন মুখে সূর্যের তাপ লাগছে।

সকালে রিলিফ-অফিসার রওনা হলেন। বি ডি. ও. টাহাড় ফিরে গেলেন। রিলিফের মাল চলল ট্রাকে। যায় তাঁবু।

পথ কিছু পরেই কাঁচা রাস্তা। গ্রীষ্ম বলে যাওয়া যাচ্ছে। বর্ষায় পথ অগম্য। পথে দেখা গেল, মিশনহাউসে মিশনরীরা রিলিফ-সেন্টার খুলেছেন। দলে দলে মানুষ। কালো, শীর্ণ ও নীরব।

জীপের ড্রাইভার থুথু ফেলে বলল, জান্‌বর সব! আকাল হলে বালবাচ্চা মিশনের দরজায় ফেলে দিয়ে চলে যায়। বলে, ও লোক ফেলে দেবে না। কুছ না কুছ দিয়ে বাঁচাবে। আমাদের কাছে থাকলে মরে যাবে।

—মানুষ নয় এরা।

—মিশনের সায়েবরা এদের ক্রীশ্চান বানাচ্ছে। ধরম্ নাশ করে দিল। তবে এরাও খচড়াই। ক্রীশ্চান ভি হচ্ছে, নিজেদের দেও-দেওতা ভি পূজছে।

—মিশনরীরা জানে না?

—জানে। তব্ ভি ওদের দাওয়াই দিবে, দেখ্ ভাল করবে। ওই গোরা গোরা মেমরা ওই জান্‌বরদের বাচ্চাদের কোলে বসাবে। মুমে মু লাগিয়ে পেয়ার করবে।

—রাম রাম।

—ও গানা শুনিয়ে না! কোই আচ্ছা লোক এ্যায়সান্ টাইমে এ্যায়সা গানা গায় গা?

গানের নামে দীর্ঘায়িত প্রেত-বিলাপটি এখন সকল বুরু ও জঙ্গল হতে এসে এসে ছুটন্ত জীপে ধাক্কা মারে।

—কেন গান গাইছে?

—ওরা ওইরকম। যারা চলতে পারবে, তারা রিলিফ নিতে আসবে। যারা চলতে পারবে না, বহোত্ বুড্‌ঢা যারা, তারা গোল হয়ে বসে ওই রকম গান গাইবে। গাইবে, গাইবে, গাইতে গাইতে মরে যাবে। এক গ্রামে গানা হবে তো ঔর গ্রামে মরনেবালা বুড্‌ঢিরা জোয়ানদের ভেজে দেবে রিলিফ আনতে। ঔর নিজেরা গানা গাইবে।

রিলিফ-অফিসার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। রাঁচিতে আলো-ঔজ্জ্বল্য-ট্যাক্সি-মোটর, জীবন সেখানে চলছে। এ কোন দেশে যাচ্ছেন তিনি, যেখানে অতিপ্রাকৃত শিশুরা বন্দুকের শব্দের উত্তরে প্রেতহাসি হেসে রিলিফ নিয়ে পালায়? যে দেশে যেতে হলে চোখে পড়ে শুধু ধূসর পাহাড় ও জঙ্গল। কিন্তু তার মধ্যে বসে জরতীরা মৃত্যু আসন্ন জেনে বাঁচার চেষ্টা করে না। প্রেত-বিলাপে গান গায়?

—মরে যায় অনেক?

—অনেক! দেখুন না, কত শকুন-চিল উড়ছে? জ্যান্ত থাকতেও শকুন খেয়ে নেয় কতজনকে। এ তাজ্জব দেশ।

—লোহরি কতদূর?

—ঢুকছি এখন। দেখুন না, গাছ-মাটি-পাহাড় সব কি রকম! যেন তামা দিয়ে তৈরি, কেমন লাল? এহি হ্যায় লোহরি। এখানকার মাটিতে বিষ আছে।

দূরে কয়েকটি পাহাড় দেখা গেল। ড্রাইভার বলল, ওখানে আপনার ক্যাম্প পড়বে।

কিছুক্ষণ বাদে ড্রাইভার আবার বলল, এক বাত হুজুর। বুরা মত মানিয়ে গা। লোহরিতে যা আছে জানি না, কিন্তু মনে খুবই ডর এসে যায়। রাতে আমরা একটু দারু-উরু পিব। ক্যাম্পের কাছেই। নইলে ভয় ধরে যায়। য়ো বাহাদুর তো পাগল হয়ে গেল।

—বাহাদুর কে?

—ডেরাইভর। কেন? তার কথা অফসর সাব বলেন নি?

—না।

—য়ে ঠিক নেই কিয়া।

—বাহাদুরের কি হয়েছিল?

—তা এখনো কেউ জানে না। ওর সঙ্গে যারা ছিল, তারা বলে, সে রাতে সবাই ঘুমোচ্ছিল। বাহাদুর হঠাৎ, চোর! চোর! বলে কাকে তাড়া করে, ঔর অন্ধেরা মেঁ খো গয়ে। যারা ওকে খুঁজতে যায়, তারা আঁধারে কার হাঁস শুনে ডরসে চলে আসে। পরদিন সকালে

দেখে বাহাদুর বেহোঁশ হয়ে পড়ে আছে। হোঁশ ফেরে, লেকিন চেতন নেহী।

—তারপর?

—বাউরা হয়ে গেল। আভিতক্। রাঁচি মে হ্যায়। নিন্, লোহ্‌রি পঁহুছ গেলাম।

ক্যাম্প ফেলার জায়গা সাফ করা ছিল। একটি ছোট ঝোপড়ি থেকে তশীলদার বেরিয়ে এল। বলল, চায়ে-উয়ে পিয়ে নিন হুজুর। পানি মৌজুদ, নাহাতে ভি পারেন। পানি আনতে হয় আধা মিল দূর থেকে।

ড্রাইভার বলল, ওহি কুণ্ডী?

—ওহি।

রিলিফ-অফিসারের সপ্রশ্ন চাহনির উত্তরে তশীলদার বলে, কুভা গ্রামের বলোয়া কে বাদ বুরু ব্লাস্ট করা হয়। সেই ব্লাস্টে বুরু উড়ে যায়, এক গহ্‌রা গাঢ়া তৈরি হয়। তাতে জল জমে বর্ষায়, ঔর সালভর পানি রহ্‌তা। উসি কে পানি।

চা খাওয়া হলে তশীলদার তাঁবু খাটিয়ে ফেলে। রিলিফের মাল বস্তা গুনে সাজায়। বলে, কুছ্ মত্ শোচিয়ে। বছর-বছর আমি এহি কাম করি। গ্রাম-ওয়ারি নামের দফা ভি মৌজুদ। দশটা থেকে চারটে অবধি রিলিফ বাটবেন, তারপর খেল্ খতম।

—কত লোক আসবে?

—হাজার, দো-হাজার, ঠিক নেই কুছু।

—মেডিক্যাল ইউনিট আসছে।

—এখানে?

—হ্যাঁ। তাঁবু চাই। তাঁবু খাটান।

—বেশ হুজুর? মেডিক্যাল ইউনিট তো কখনো আসে না?

এর আগে কখনো তো জন্‌তা সরকারও আসে নি। আর রিলিফ দিতে স্পেশাল অফিসার আসে নি।

তশীলদার মনে মনে বলে "শুয়ারের বাচ্চা" ও মুখে বলে, যো বোলে গা ওহি করে গা।

—সরডোহা মিশন থেকে যারা এসেছেন, তাঁরাও কাজ করবেন।

—য়ো লোক ভি ?

—হ্যাঁ। ওঁদের নার্স আছেন। ডাক্তার।

—বহোত্ আচ্ছা।

—ক্যাম্প জল আনার জন্যে, ক্যাম্প সাফাই রাখার জন্যে, খিচ্‌রি যাতে বসবে সে হাণ্ডা সাফা করতে লোক চাই। দশটা গেঁয়ো ছেলে বেছে নিন। নাম লিখে নিন। তারা সব কাজ করবে, খানা পাবে, দিন এক টাকা করে মজুরিও পাবে।

—ওরা তো খানা পেলেই সব করে।

—আপনি কথা বলতে এসেছেন, না শুনতে ? ক্যাম্প আমি চালাব। আপনি রোজ আসবেন।

—কতদিন ক্যাম্প খোলা থাকবে ?

—এখন এক মাস। আমি এ ক্যাম্প দেখব। বিশ বিশ মাইল তফাতে ক্যাম্প পড়ছে। আর এক কথা ! স্টোর যেখানে থাকবে, আমি সেই তাঁবুতে থাকব। আমার দায়িত্ব তো !

—য়ে খুব ঠিক কথা। আমাকে তো শও র পেয়া দিলেও স্টোরের তাঁবুতে থাকব না।

—কেন ?

—চুরি হয়। ঔর যারা চোরাই করে, তারা মানুষ নয়।

—ও সব কথা ছেড়ে দিন। কলেজের ছেলেরাও আসছে ভলান্টিয়ার হয়ে। বলে দিন, গ্রামে গ্রামে বুড়োবুড়ির গান উঠাবার দরকার নেই। গ্রামেও রিলিফ যাবে। ছেলেরা নিয়ে যাবে।

তশীলদার তাজ্জব বনে চলে যায়। সে প্রতি বছর রিলিফ থেকে চুরি করে ও কাজ গোছায়। সে অতি বদ, কিন্তু অত্যন্ত কাজের। দশটি গ্রামীণ আগরিয়া যুবককে সে ক্যাম্প দেখ্-ভাল্ সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত করে। চৌকিদার দুজনকে নিয়ে গাছের নিচে রিলিফের মাল

সাজায়। আজ শুকনো মাল বিলি হয়। কাল থেকে খিচুড়ি ও শিশুদের জন্যে দুধ বিতরিত হবে।

রিলিফ অফিসারকে বলে, স্টোরের তাঁবুতে এই ছেলেরা পাহারা থাকবে। আমাদের মধ্যে কেউ তো থাকবেই না, আপনি একা থাকবেন?

রিলিফ-অফিসার আশ্বস্ত হন। খুব তাড়াতাড়ি অতীব শৃঙ্খলায় ক্যাম্প চালু হয়ে যায়। পরদিন থেকে রান্না করা খিচুড়ি দেওয়া হয়। মেডিক্যাল ইউনিট কলেরা ও টাইফয়েডের ইঞ্জেকশন দেয়। জায়গাটি সরগরম হয়।

দূর-দূরান্ত থেকে এখন মানুষ আসতে থাকে। রাতেও চোখে পড়ে দব-দিগন্তে চলমান আলো। মশাল জ্বেলে মানুষ আসতে থাকে এবং দিনে যেহেতু প্রচণ্ড দাবদাহ সেহেতু রাতে পথ চলাই সুবিধে। কয়েক দিনে তশীলদারও বলে, না হুজুর, রিলিফের কাজ করে আপনি যে জানবরদের মনে বিশোয়াস এনে দিয়েছেন একটা। আগে বুড্ঢারা জানত মরে যাবে, গান উঠাত। এখন গানা ভি বন্ধ। এক কাম করলে হয় না?

—কি?

—গাঁও মে রিলিফ মত্ ভেজিয়ে। এবার তো ওরা রিলিফ পাচ্ছে ঠিকমত। ওরাই কেন বুড্ঢা-বুড্ঢিদের বয়ে আনুক না?

—না-না। যে লোক ভুখ্ সে মমতহীন হো জাতা। যাকে আনবে না সে তো মরে যাবে। বয়ে আনবে বা কি করে? আসতে আসতে পথে পড়ে মরে যাচ্ছে। তাগদ্ ভি নেই।

রিলিফ অফিসার এই ঋণদান কার্যে অসম্ভব জড়িয়ে পড়েন। জায়গাটির পোড়ামাটির মতো চেহারা, খর্বাকৃতি ধূসর ও পত্রহীন গাছের ঘন বন, লালচে ও হিংস্র পাহাড়, ভয়াবহতা হারায়। নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষগুলি পায় টপ প্রায়োরিটি। ডাক্তার ছেলেগুলি টীকা দিয়ে চলে যায়। মিশনের ডাক্তার ও নার্সদের মনেও তিনি ভরসা যোগান এবং যদিচ কলেরা ও টাইফয়েডের ইঞ্জেকশন দেয়া নিয়ম, তিনি প্রোটোকলকে তুচ্ছ করে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক, ঘায়ের ওষুধ, বেবিফুড, নিউট্রি নাগেট ইত্যাদি আনান রাঁচি থেকে।

প্রাচীন আগরিয়া দশজন তাঁকে ঘিরে থাকে। ওরা তাঁকে বুরু ব্লাস্টেড কুণ্ডীতে নিয়ে যায় না। ওটি ওদের কাছে ট্যাবু। লোহ্‌রি নদীর বুকে যে লুক্কায়িত কুণ্ডী ওদের জলোৎস, যেখানে ওঁকে নিয়ে যায়। স্নান করতে করতে উনি ওদের কাছে সূর্য ও জ্বালামুখীর লড়াইয়ের কাহিনী শোনেন। জ্বালামুখী, এক আগরিয়া বালক ওদের হিরো। তার কারণেই আগরিয়ারা গরিব। আবার তার অভিশাপেই পূর্ণ-চন্দ্রিমার রাত ছাড়া সূর্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না। লোহাসুর, আগইয়াসুর ও কয়লাসুর, তিন অসুরের আশীর্বাদ পায়নি বলেই আগরিয়ারা আজ কষ্ট পাচ্ছে। স্নান করে যখন ফেরেন, তখন রাত হয়েছে।

রাতে স্টোরের তাঁবুর সামনে খাট পেতে শুয়ে পড়েন ও ভাবেন, রিলিফ চুরি করত দু হাতে, তাই বলেই প্রেতদের চুরি করার কথা রটিয়েছিল সবাই। এই লোহ্‌রির আগরিয়াদের ভাগ্য বদলে দেওয়া যায় কিনা, একথাও ভাবেন। সৎ ও অনুকম্পায়ী অফিসার দরকার। তেমন লোক এদের কৃষিকর্মে কনভার্ট করতে পারবেন। রাঁচি গিয়েই নোট দিতে হবে। বছর বছর রিলিফ দিয়ে এত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েন। নিশ্চিন্ত ঘুম। আগরিয়া যুবকগুলি তাঁবু ঘিরে ঘুমোয়। ওরা ওকে "দেওতা" বলেছে। ভাবলে মনে হয় খুব জিত হয়েছে ওঁর। যারা নিজেদের ছাড়া কারুকে বিশ্বাস করে না, তাদের মুখে "দেওতা" শোনা একটা বিরাট জয় বই কি।

যুবক দশটি কিন্তু ঘুমোয় না। জেগে থাকে ও কান পেতে থাকে। এবার ক্যাম্প অনেক বড়। হইচই অনেক বেশি, সে জন্যেই কি?

একদিন তারা কোনো সম্মিলিত পদশব্দ শোনে। শ্বাপদ সতর্কতায় কয়েক জোড়া পা এগোচ্ছে। চাপা শিস্‌। প্রত্যুত্তরে শিস্‌। তাঁবুর দড়ি খুলে ফেলে কারা যেন। তারপর খুব দ্রুত ও নিঃশব্দ অ্যাকটিভিটি। যুবকগুলি উঠে যায় ও তাঁবুর পর্দা তুলে ধরে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ গভীর রাত। চালের বস্তা নেমে যায়, মাইলোর বস্তা। কয়েকটি ছোট ছোট হাত।

রিলিফ-অফিসারের ঘুম নিমেষে ভাঙে। টর্চ নিয়ে উঠে বসেই তিনি দেখেন, আগরিয়া যুবকরা নেই। ক্ষিপ্র পায়ে তাঁবুর ওপারে চলে যান। যুবকরা দড়ি টেনে খোঁটায় বেঁধে দিচ্ছে। কেন? তাঁবুর পর্দা কেন খোলা হয়েছিল? বিমূঢ় ও আহত, বিশ্বাসভঙ্গে আহত অফিসার ওদের দিকে তাকান। অচেনা, অপরিচিত মুখ। ওরাই। কিন্তু ওদের সঙ্গে ওঁর মনের আর্ত প্রশ্নের কোন সংবাহন ঘটে না। হিংস্র এবং বিজয়ীর হাসি হেসে যুবকেরা নিমেষে আঁধার বনে মিলায়। দৌড়ে অফিসার তাঁবু ঘিরে আসেন ও ভেতরে ঢোকেন। দুটি বস্তা নেই।

বেরিয়ে আসেন ও ছোটেন। ছোট ছোট পায়ের শব্দ। বনের ফাঁক দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে বস্তা চলে যাচ্ছে। প্রেত নয়, মানুষ। এত ছোট, শিশু বললে হয়। নিশ্চয় বালক-বালিকা। এদিকে রিলিফ নেয়, ওদিকে আট-দশ বছরের ছেলেদের দিয়ে চুরি করায়। অথচ সরকারী রেকর্ড : লোহুরির আগরিয়ারা চুরি-রাহাজানি-বাটপাড়ি জানে না। কখনো মিথ্যা বলে না। তিনি তো এদের ভাল করতে চেয়েছিলেন? যুবকগুলি ওঁকে "দেওতা" বলেছিল। সব ছিল প্রতারণা? মনে হচ্ছে কেউ ঠকবাজি করে ওঁকে নিঃস্ব করে ফেলে রেখে গেল! রিলিফ-অফিসারের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ভালো লোক তিনি, সৎ, ঘুষখোর নন। আদিবাসীদের বিষয়ে মমতা আছে। এতগুলো কারণে তাঁকে নির্বাচনের মর্যাদা তিনি রেখেছিলেন। প্রাণ দিয়ে রিলিফের কাজ করেছেন। এদের রিলিফ দিয়ে বছরে একবার না-বাঁচিয়ে পাকাপাকি বাঁচিয়ে রাখার কথা ভেবেছেন। তার প্রতিদানে এই ব্যবহার? ছোটদের পাঠিয়ে রিলিফ চুরি করা? উনি ওদের ধরবেন, চুরির ফয়সলা করে যাবেন।

দৌড়তে থাকেন উনি গোঁ ভরে। ওরাও ছোটে। বন পাতলা হয়। খেড়ো ঘাসের বন। প্রান্তর। এই সেই প্রান্তর, যেখানে সূর্য ও জ্বালামুখী যুদ্ধ করেছিল। এখানে পৌঁছে ছেলেগুলি মাইলো ও চালের বস্তা নামায়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়। রিলিফ-অফিসার কাছে যান, বস্তা-

গুলির কাছে। বস্তা ঘিরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা গুঁড়ি মারা জানোয়ারের মতো। ভঙ্গিতে হিংস্রতা। যেন লাফ দেবে। নিশ্চল, মৌন, নজর রাখছে ওঁর ওপর। কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নায় সব অস্পষ্ট।

হঠাৎ ওরা ওঁর কাছে এগিয়ে আসে। ছেলেরা নয়, মেয়েরাও আছে। হঠাৎ ভয় থাবা বসায় বুকে। ভয়, ভীষণ ভয়। এগোতে এগোতে ওঁকে ঘিরে ফেলে ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ল কেন ?

ওরা ওঁকে দেখে, উনি ওদের দেখেন। ওরা আরেকটু এগোয়। আবার দাঁড়ায়। রিলিফ-অফিসার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন। বৃত্ত সম্পূর্ণ। পালাবার উপায় নেই। পালাতে যাবেন না। পালাতে যাবেন কেন ? এরা তো মানুষ, মানুষের ছেলেপিলে। প্রেত নয়, প্রেত চাল ও মাইলো চুরি করে না। "য়োহ্ এক অভিশপ্ত ভূমি হ্যায়"– কে বলেছিল ? "একটু দারু-উরু পিব"—কে বলেছিল ? রিলিফ-অফিসার নিজের বাড়ি-খাওয়া, আছড়ে পড়া হৃৎপিণ্ডকে শাসন করেন। ওরা এগোয়।

ভয়, ভীষণ ভয়। ভীষণ, ভীষণ ভয়। ভীষণ ভয় করছে ওঁর। নীরবে এগোয় কেন ? কেন কথা বলে না। ওদের শরীর স্পষ্ট হয়। এ কি দেখছেন উনি ? নগ্ন কেন এরা ? মাথার চুল এত বড় বড় কেন ? বালক, বালক, লড়কাপন যদি, তবে এর মাথার চুল সাদা কেন ? মেয়েদের, বালিকাদের বুকে লম্বিত ও শুকনো স্তন কেন ? ও এগোচ্ছে কেন ? সাদা চুল যার ! কাছে এস না। ওঁর আর্ত চীৎকারটি মৌন থাকে, শব্দরূপ পায়, 'ঔর মৎ আও। যার চুল সাদা, সে কাছে এসে ওঁকে কি দেখাচ্ছে ? বীভৎস বীভৎস দৃশ্য, নিজের পুরুষাঙ্গ দেখাচ্ছে, শুকনো, ঝোলা কোঁচকানো।

শিশু নয়, অ্যাডাল্ট ! রিলিফ-অফিসারের মুখ থেকে শব্দ বেরোয় না। কিন্তু উপলব্ধির আঘাতে মস্তিষ্ক হিরোশিমা-নাগাসাকি হয়ে যায়।

বৃদ্ধটি বোঝে উনি বুঝেছেন। ও হাসতে থাকে। খিক-খিক-খিক —অমানুষী সে হাসি। হাসি ছড়িয়ে পড়ে। অফিসারকে ঘিরে সকলে হাসে। হাসতে হাসতে তারা শূন্যে লাফ মারে, কেউ কেউ গুড়ি মেরে বসে। অফিসার কি করবেন ?

—মোরা ছেলা নই। মোরা কুভা গ্রামের আগরিয়া। কু—ভা! জানিস? "কুভা" নাম জানিস?

—নাঃ! নাঃ! নাঃ!—অফিসার চোখ ঢাকতে চান। হাত ওঠে না। প্রচণ্ড আঘাতে মস্তিষ্ক দীর্ণ। হাতকে মস্তিষ্ক, ওঠবার আদেশ দেয় না। "পাকিট মেঁ মহাবীরজীর পরসাদ"—কে বলেছিল?

—মোরা মোদের পূজার বুরুর মান রাখতে তুরাদের কেটে ফেলে সে হতে বনবাসী। কেউ মোরাদের ধরতে পারে নাই। কত পুলিস, সেপাই, কেউ পারে নাই।

বৃদ্ধটি হাসে। সবাই হাসে। খিক-খিক-খিক—প্রেতহাসি ছড়িয়ে পড়ে।

—নাঃ! নাঃ! নাঃ!

—আগরিয়ারা বাঁচায়ে রাখে। পলায়ে থাকতে থাকতে, না খেতে খেতে, সবাই মরে গিছে!

—নাঃ! নাঃ!

বৃত্ত ছোট হয়। ওরা আবো কাছে।

—কাছে এস না।

—কেন আসব নাই? অত অত চাল, অত অত মাইলো, দুটা বোরার লেগ্যে তু এলি কেন? এলি যখন, ভাল করে দেখ? হেই! তুরা দেখায়ে দে?

পুরুষরা পুরুষাঙ্গ দেখায়, মেয়েরা স্তন।

বৃদ্ধটি এখন খুব কাছে। অফিসারের গায়ে পুরুষাঙ্গ লাগছে। সামনে থেকে পেছনে থেকে। শুকনো সাপের খোলস যেন। শুষ্ক ও অশুচি।

—মরতে মরতে মোরা এই চোদ্দজনা আছি। খেতে পাই না বলে দেহ শুকায়ে ছোট হয়্যা গিয়াছে। পুরুষরা শুধু মুতে যায়, রাতের কাম উঠাতে পারে না। মেয়েদের পেটে ছেলা আসে না। তাতেই মোরা রিলিফ চুরাই। খেয়ে খেয়ে আবার ত বড় হতে হবে কি না বল্?

—নাঃ! নাঃ! নাঃ!

—আগরিয়ারা মোরাদের মদত দেয়। কুভার বলোয়ার লেগ্যে মোরাদের এই হাল। কুভার বলোয়া!

— নাঃ! নাঃ! এ হতে পারে না।

কেননা এ যদি সত্য হয়, তাহলে সব মিথ্যে। কোপার্নিকাসের বিশ্ববিন্যাস, বিজ্ঞান, এই শতক, এই স্বাধীনতা, এই প্ল্যানের পর প্ল্যান। তাই রিলিফ অফিসার বলে চলেন, নাঃ, নাঃ, নাঃ।

—"না" বললে "না" হবে? তবে এগুলা হল কি করে? ই গুলান্ দেখে বুঝিস না, মোরা ছেলাপিলা নই?

ওরা পিশাচ আনন্দে, প্রতিহিংসার উল্লাসে খিক-খিক করে হাসে। তারপর ওরা ওঁকে ঘিরে ছুটতে থাকে, হাসতে হাসতে। মাঝে মাঝে ওঁর গায়ে ঘষে দেখায় পুরুষাঙ্গ, বুঝিয়ে দেয়, ওরা পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় মানুষ।

আকাশে চাঁদ। কি নিরুপায় চাঁদের চেহারা। কি নির্বীর্য তার জ্যোৎস্না। সূর্য ও জ্বালামুখীর যুদ্ধের আগুনে দগ্ধ প্রান্তরে কয়েকটি বালক-বালিকা সদৃশ পূর্ণ বয়স্কের ভীষণ উল্লাস। প্রতিহিংসা চরিতার্থতার উল্লাস। শত্রুর মাথা তলোয়ার কোপে নামিয়ে দেবার উল্লাস। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ।

কিসের বিরুদ্ধে?

ওদের নৃত্যপর শরীরের ওপর দিয়ে প্রলম্বিত ওঁর ছায়া। ছায়া বলে দেয় কিসের বিরুদ্ধে।

ওঁর পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের বিরুদ্ধে।

ওঁর শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে।

রিলিফ-অফিসারের মস্তিষ্ক দিয়ে যুক্তির কথাগুলি মোটর রেস্ করে চলে যায়। বলতে চান, কেন এই প্রতিশোধ? আমি সাধারণ এক ভারতীয়। রুশ কানাডিয়ন-আমেরিকানের মতো আমার শরীরের বৃদ্ধি নয়, দৈর্ঘ্য নয়। আমি জীবনেও সেই খাদ্য খাই নি, যা ক্যালোরিগুণে মানবদেহের বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যক। ওআর্লড্ হেল্থ অর্গানাইজেশনের মতে যে খাদ্য না-খাওয়া অপরাধ।

কিছুই বলতে পারেন না। চাঁদের নিচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে দেখতে, ওদের হাসি শুনতে শুনতে, ওদের পুরুষাঙ্গের ঘষটানি খেতে

খেতে, ভারতের সাধারণ মানুষের অপুষ্ট দেহ ও হাস্যকর দৈর্ঘ্যকে মনে হয় সভ্যতার জঘন্যতম অপরাধ, নিজেকে মনে হয় প্রাণদণ্ডের আসামী, এবং ওদের বামনাকৃতির কারণে রিলিফ-অফিসার নিজেকেই নিজে প্রাণদণ্ডটি দেন, এবং চাঁদের দিকে গলা তুলে হাঁ করেন। ওরা নাচছে, হাসছে, ওঁর গায়ে খসখসে পুরুষাঙ্গ ঘষছে, এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত প্রান্তর ফাটানো আর্তনাদ করে পাগল হয়ে না যেতে পারলে তাঁর মুক্তি নেই। কিন্তু মস্তিষ্ক গলাকে আর্তনাদে ফেটে পড়ার আদেশ দিচ্ছে না কেন? ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

নুন

—হাতে নয়, রুটিতে নয়, নিমক সে মারে গা, বলেছিল উত্তমচাঁদ বানিয়া। বানিয়া সে, মহাজনও সে, এবং কয়েক পুরুষ ধরে তার বংশই ঝুঝার বেল্টটিকে শাসনে রেখেছে। স্থানীয় ওঁরাও এবং কোলরা কোনোদিন তার কথায় 'না' বলবে, সে ভাবে নি।

সেই অভাবনীয় ঘটনাই ঘটল। এই সরকারের আমলে। এর আগে সরকার এসেছে, সরকার গেছে, এ-রকম কখনো ঘটে নি।

পালামৌ অভয়ারণ্যের কোলে আদিবাসী গ্রাম ঝুঝার। গ্রামের অধিবাসীরা জঙ্গলে গাই-ছাগল মোষ চরাতে, পড়ে-থাকা কাঠে জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারে। ঘর ছাইবার পাতাও নিতে পারে। এর বাইরে ওরা বাঁশের কোঁড়, কন্দ ও তেঁতুলপাতাও চুরি করে। বনবিভাগ চোখ বুজে থাকে। শজারুটা, খরগোশটা, পাখিটাও মারে। এ-সব আরণ্য প্রাণী ও পাখির আদমশুমারি সঠিক ও নির্ভুল নয়। ফলে এ বিষয়েও বনবিভাগ চোখ বুজে থাকে। তবে শিকার করে মাংস এরা কমই পায়। কেননা জঙ্গলের প্রাণীরাও সতর্ক হয়ে গেছে। তারা চট করে ফাঁদে ধরা দেয় না।

অভয়ারণ্যের কোলে গ্রাম। কোয়েল নদীর গা ঘেঁষে সামান্য জমি। জমি কিন্তু উত্তমচাঁদের। ১৮৩১ সালের কোলবিদ্রোহের পর এ-অঞ্চলে যে-সব হিন্দু বেনে নতুন করে ঢোকে, উত্তমচাঁদের পূর্বপুরুষ তাদেরই একজন। আদিবাসীদের জঙ্গল-আবাদী জমি সে দু হাতে কিনেছিল। জমি কিনে আদিবাসীদের উৎখাত করা তখন খুব সহজ ছিল, এখনকারই মতো। সেদিনের আদিবাসীরাও হিসেব-দলিল-পাট্টা-আইন সব কিছুকে ডরাত। আজকের আদিবাসীরই মতো। ফলে এখন ঝুঝারের আদিবাসীরা জানেও না, কবে তাদের নিজস্ব জমি ছিল। কবে তারা মেহনতের ফসল নিজের ঘরে তুলত।

এই উত্তমচাঁদের কাছে গ্রামটি বেঠবেগারির ডাণ্ডাবেড়িতে বাঁধা। কয়েক পুরুষ ধরে। পূর্বপুরুষের অলিখিত ঋণ শোধ করতে এরা বছর বছর ফসলের সময়ে উত্তমচাঁদের গ্রাম টাহাড়ে চলে যায় বারো মাইল হেঁটে, এবং পেট-খোরাকি ও সামান্য ফসলের বিনিময়ে বেগারি দিয়ে আসে। যে ফসল পায়, তাও যোগ হয় ঋণের খাতায়। বেঠবেগারি বে-আইনি, এ কথাও তারা জানত না। জেনেছিল বটে আদিবাসী দপ্তরের ইন্‌স্‌পেকটরের সৌজন্যে। জেনেও ওরা বেঠবেগারি দেওয়া বন্ধ করে নি। কেননা, বেঠবেগারি আদায়কারী উত্তমচাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা ওদের দ্বারা হবার নয়, তা ওরা জানত। সেই কারণে ডালটনগঞ্জ যাওয়া কি সম্ভব? উকিল কোথায়? ওদের বুদ্ধি পরামর্শ দেবার লোক কোথায়? আদিবাসী-কল্যাণ-দপ্তরও ওদের নাগালের বাইরে। দপ্তর শহরে। ওরা গ্রামে। রেল বা বাস-পথের ওপরের জানা-জানতি গ্রাম নয়। মাত্রই সতেরটি পরিবারের ছিয়াত্তর জন মানুষ নিয়ে গ্রাম। স্বাধীনতার পর তৃতীয় নির্বাচন অবধি ত ওদের অস্তিত্বই সরকার জানত না। ভোট দিচ্ছে ওরা চতুর্থ নির্বাচন থেকে। ভোটের সময়টা ভালো। উত্তমচাঁদ বলে, সেই জঙ্গল হতে ভোট দিতে আসবি? যা, একটা করে টাকা নিয়ে যা বাপ সকল, মায়েরা। আমিই ভোট দিয়ে দিব।

চতুর্থ নির্বাচনের সময় থেকে এই ব্যবস্থাই চলছিল। এই সাতাত্তরেই সব পালটে গেল। ঝুঝার গ্রামে আসতে থাকল নিকটতম প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। বালকিষণ সিং। সেই ওদের তুইয়ে-তাইয়ে গ্রাম থেকে তিনটি ছেলেকে স্কুলে নিল। সেই বোঝাল, ষষ্ঠ নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওরা যেন নিজেরা ভোট দিয়ে আসে। মাথা-পিছু টাকা? তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার কাজ বালকিষণের উদ্যোগে হল। ঝুঝার গ্রামে পঞ্চায়েতী কুয়ো। মস্ত কুয়ো, অনেক জল। এতদিন নদী থেকে জল নিতে হত, আর গ্রীষ্মে জল পেতে জান বেরিয়ে যেত।

উত্তমচাঁদ প্রথমে চটে ভোটের ব্যাপারে।

ভোটের পর নতুন মন্ত্রিসভা। পুরনো দপ্তর ও পুরনো অফিসারদের নতুন ভূমিকায় অবতরণ। ঝুঝার গ্রাম অবধি পায়ে-চলা পথ ছাড়া কোনো পথই নেই। সেই পথেই সংগঠিত যুবকদল এল, ও ঝুঝারের কোন্ পরিবার কি ঋণ শুধতে বেঠবেগারি দেয়, তা লিখে নিল। পূর্তি মুণ্ডা গ্রামের সব চেয়ে ভোকাল ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। গ্রামের মধ্যে ও একমাত্র লোক, যে রাঁচি ও ডালটনগঞ্জ দেখেছে, এবং ধানবাদে কুলি খেটে এসেছে। সর্বত্র তার আর্থিক অবস্থা একই থেকেছে বলেই সে বহির্জগতে থুথু ফেলে ঝুঝার ফিরে আসে।

সে বলল, আমাদের শুধায়ে লাভ কি? উত্তমচাঁদের খাতায় সব লিখা আছে। তারে শুধা তুরা।

—বেঠবেগারি বেআইনী, তা জান?

—আমরা জেনে লাভ কি? না দিলে মহাজন ধার দিবে না।

—এবার মহাজন জব্দ হবে।

—তুরা দেখ্।

—তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

—চল্।

পূর্তি মুণ্ডার সামনে উত্তমচাঁদকে ছেলেরা বলে, এবছর থেকে এ অঞ্চলে কোনো আদিবাসী বেঠবেগারি দেবে না। যদি কারুকে বাধ্য করা হয়, তারা যাতে আইনের মারফত প্রতিকার পায়, তা আমরা দেখব।

—তাই হবে।

উত্তমচাঁদ বলল, এবং কাজেও এ-অনুশাসন মানতে বাধ্য হল। তার জমি চষা থেকেও ঝুঝারবাসীদের নিষেধ করা গেল না। যুবকদল বলে গেল, বারো বছরের বেশি কাল এরা জমি চষছে। আধা ভাগে এদের হক

—আধা ভাগ আমার।

—ফসল উঠলে আপনাকে সামনে রেখে আমাদের সমিতি ফসল ভাগ করে দেবে।

—তাই হবে।

পূর্তি মুণ্ডা বলে বসল ছেলেদের, দুটা টাকা দে। তাড়ি খেয়ে বাড়ি যাই। ই কি দিনটো রে? কার মুখ দেখে উঠেছিলম?

যুবকরা বলল, না। মদ খাওয়া ছাড়ো। ওই মদের নেশা হতে আদিবাসীদের সর্বনাশ।

পূর্তি মুণ্ডা ফেরার পথে ট্যাঁকের আট আনা দিয়ে তাড়ি খেল ও ভাঁড়টিতে হাত বুলিয়ে বলল, সর্বনাশ! বাবুরা বুঝে কি? তো হতে মোরা পেটের জ্বালা ভুলে থাকি?

উত্তমচাঁদ কিন্তু পরাজয়গুলি মেনে নিয়েও শোধ নিতে বদ্ধপরিকর হল। ও বলল ওদের নুনে মারব।

এ-হেন উদ্ধত ঘোষণা ওরই সাজে। কেননা ঝুঝারের লোক হাট করতে আসে পালানি বা মুরু। দুটি হাটে সব বেনেতি সওদার দোকানই উত্তমচাঁদের।

উত্তমচাঁদ বলল, নুন বিনা ঘাটো খেয়ে কেমন লাগে দেখুক? এত-কাল আমার খেয়ে পরে এমন নিমকহারামী?

হাটে নুন না-পাবার ব্যাপারটিকে প্রথমে পূর্তিরা গুরুত্ব দেয় নি। যখন দিল, তখনি ওরা ডালটনগঞ্জ ছুটল। যুবকদলের আপিসে। আপিসে বসে জনৈক যুবক ট্রানজিস্টার শুনছিল। সে সব শুনেমেলে বলল, এটা আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। যার দোকান, সে না বেচলে আমরা কি করতে পারি বল? এখন দিকে দিকে ছুটতে হচ্ছে। আরও অনেক বড় সমস্যা নিয়ে।

পূর্তি ও বাবুদের মনের গতিপ্রকৃতিতে কোনো আদান-প্রদান নেই, থাকে না। পূর্তি কিছুতে বোঝাতে পারল না, নুন ছাড়া জীবন তাদের অচল। নুনের টাকনা দিয়েই ওরা ঘাটো খায়।

প্রমাদ গণে, ওরা বাস ভাড়া বাঁচিয়ে দশ কিলো নুন কিনল। এবং আঠার মাইল হেঁটে গ্রামে ফিরল। গ্রামের ঘরে ঘরে নুন বেঁটে দিয়ে বলল, বাঁচায়ে বাঁচায়ে খা।

কিন্তু দশ কিলো নুন অজর-অমর নয়। এবার পূর্তি বনবিভাগের ঠিকাদারকে ধরল। আমাদের কাজ দাও। পয়সা দিও না, নুন দিও।

—নুন দিব ?

এখনো, এত দাম বাড়ার পরেও, নুনই যেহেতু আজও ভারতে সস্তাতম বস্তু সেহেতু নুনের মজুরিতে কাজ করার প্রস্তাবে ঠিকাদার ভির্মি খায়। তখনি তার মনে হয়, লোকগুলোর বিষয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। উত্তমচাঁদের জমি চষে, অতএব ঠিকাদারটি উত্তমচাঁদের কাছেই যায়। গিয়ে যা শোনে, তাতে বিশ্বাস হয়, লোকগুলো বেদম খচড়া। শহরের লড়াকু যুবকদের সঙ্গে রেখে তবে চিরকালের চেনা বেনের সঙ্গে সংগ্রামী ফয়সলা করে। এদের কাজ দিলে ঠিকাদার জরুর ফাঁস যাইয়ে গা। অতএব ঠিকাদার পূর্তিদের ভাগিয়ে দেয় ও কালো কালো মানুষগুলি মাথা নিচু করে সাদা বালি পেরিয়ে চলে যায়।

অত পর এরা ফসলের মৌসুমে ফসল দিয়ে নুন কিনতে চেষ্টা করে। ফলে ফসল চলে যায়, নুন সামান্যই মেলে। এখন পূর্তিকে সবাই দোষী করে ও বলে, মহাজনের কাছে ওরা যেতে বলল তুমি গেলে ? এখন আমাদের নিমক পাবার ব্যবস্থা কর ? তখন ত খুব প্রমাণ করতে গিয়েছিলে নিজেকে মরদ বলে ! লীডার হতে গিয়েছিলে !

—না গেলে বেঠবেগারি বন্ধ হত ?

—না হয় দিতাম ?

—ফসলে হক হত ?

—না হয় উপোস করতাম ?

ঝুঝার গ্রামবাসীদের কাছে এখন বেঠবেগারি দেবার, ফসল না-পাবার দিনগুলিকে অনেক সুখের মনে হয়। তারা মনে মনে দাঁড়ি-পাল্লায় হিসাব কষে কালো ও নোংরা ঢেলা নুনই ওজনে ভারি হয়। তার কাছে বেঠবেগারি বন্ধ্ ও ফসলে হক হাল্‌কা হয়ে যায়।

গাঁওবুড়া বলে, নয় আলুনি ঘাটো খেলাম। কিন্তু বুকে হাঁপ ধরে কেন ? হাত-পা নড়তে চায় না ?

সকলেরই মনে হয়, এজন্য লবণ নিমিত্ত, আসলে দেওদেওতা রুষ্ট। গাঁওবুড়া নিশ্বাস ফেলে বলে, সবারই হতেছে। এবার পূজা দিতে হবে

হরম্ দেওর থানে। আমার ঘরপালা মুরগি দুটা, করেস্‌গার্ডের কাছে বেচে নুন আন্ পূর্তি। একদিন আমরা নুনের সোয়াদ পাই।

ফরেস্ট গার্ড এহেন আশ্চর্য প্রস্তাবে খুবই খুশি হয়। বলে, স্টোর হতে নুন এনে দিব, দাঁড়া।

—মুরগি দুটা সস্তায় কিনলেও আট টাকার কমে পাবি না।

— তা বটে।

— আট টাকায় কত নুন হয়?

—ষোল কিলো।

—তাই আন্।

খুবই কড়কচ কালো নুন।

—এত কালো?

—হাতি খায়, হরিণ খায়, তারা সাদা-কালো বুঝে?

—নুন খায়? নুন?

— হাঁ রে বেটা। ওদের তরে নুনমাটি দিতে হয়।

—নইলে কি হয়?

—শুকায়ে যায়।

—কোথা দিস?

—ঠাঁই আছে।

পূর্তি ভাবতে ভাবতে নুন নিয়ে গ্রামে ফেরে। হাতি ও হরিণ সল্টলিক থেকে নুন খায়। সংবাদটিতে সে অত্যন্ত বিভোর থাকে বলেই বোঝে না, পিঠের বস্তায় নুনের ওজন কোনোক্রমেই ষোল কিলো নয়। পুজোর দিনে খাসী কেটে খুব খাওয়া-দাওয়া হয়। পরে পূর্তি এসে নদীর ধারে বসে। একাই সে মদ খেতে খেতে বনের দিকে চায়। হাতি চরে বেড়ায় খুব ভোরে ও সন্ধ্যায়। দিনমানে ওদের দেখা যায় না। নুনমাটি ওরা কোথায় খায়, এবং কখন? জঙ্গলটি বিশাল। জঙ্গল চিরে চিরে পূর্তি দেখবে, নুন কোথায় মেলে।

হাটুরে দোকান ওদের নুন বেচছে না। খবরটি সংগঠিত যুবকদল একেবারে ফেলে দেয় না। তাদের মনের কোথাও প্রসঙ্গটি লেগে থাকে,

এবং একজন জনৈক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভকে ধরে জিজ্ঞেস করে, মানবদেহে লবণ কতখানি ওম্নিপোটেন্ট। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভটি সগু কাজে ঢুকেছে এবং যে-সব বিগ্যে শিখে এসেছে, তা ঝালাবার কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। সে যা বলে, তা শুনে যুবকটি ভির্মি খায়।

বক্তব্যটি এইরকম . নুন ও জল শরীরের ইন্অর্গানিক বা মিনেরাল উপাদান। প্রাণের পক্ষে এরা অপরিহার্য এবং দেহকোষ ফাংশানে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রধান লবণ হল, ক্লোরাইড, কার্বনেট, বাইকার্বনেট, সালফেট, ও ফসফেট। এগুলি সোডিয়াম, পোটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম, ক্লোরাইড সহ লৌহ, সি. ও. টু, সালফার ও ফসফরাসের যৌগিক। সাধারণভাবে বলা যায়, লবণ সকল জীবদেহে এই-সকল কাজ করে থাকে—১. দেহের আস্রবণ অবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করে ঠিক রাখা। ২. দেহে জলের ভারসাম্য ও রক্তের ভল্যুম ঠিক রাখা। ৩. দেহের অ্যাসিড-বেস্-ভারসাম্য ঠিক করে রাখা। ৪. দেহকলার আবশ্যিক উপাদানগুলি যোগান দেওয়া, বিশেষ অস্থি ও দাঁতকে। মাংসপেশী ও নার্ভসেল-এর প্রপার ইরি-টেবিলিটি রক্ষণাবেক্ষণেও লবণ আবশ্যিক। আবশ্যিক রক্ত-তঞ্চন বা কোআগুলেশনের ক্ষেত্রে। ৫ লবণ হল কয়েকটি এন্জাইম-সিস্টেম শ্বাস-প্রশ্বাসিক পিগমেন্ট ও হরমোনের আবশ্যিক উপাদান। ৬. লবণ জীবদেহে সেল্‌মেম্‌ব্রেন ও ক্যাপিলারি পারমিয়েবিলিটি নিয়ন্ত্রণে রেখে থাকে, ও চালায়।

এতগুলি কঠিন কথা জেনে যুবকটি ফার্দার ভির্মি খায় ও বলে কা ইয়ার? ম্যয় কেয়া ইম্‌তেহানকে লিয়ে পুছা?

—তবে কেন?

—নুন না খেলে কি কি ক্ষতি হতে পারে?

—ক্ষতি আবার কি হবে? হাই ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাও না, সামান্য নুনেই কাজ হবে।

—আরে, এমন লোকও ত আছে, যারা কোনো ক্যালোরির ধার ধারে না।

—হাঁ হাঁ, ভারতীয় লোগোঁকো ফুড হ্যাবিট ঠিক না হ্যায়।

—আরে, আমি যাদের কথা বলছি···

যুবকটি বুঝতে পারে সে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ে মনের গাত্রে ব্যথা ধরাচ্ছে। ডালটনগঞ্জের চায়ের দোকান, ঝুঝার গ্রাম থেকে কিছু লক্ষ যোজন দূরে নয়। কিন্তু দুটি জায়গা মহাবিশ্বের দুই নক্ষত্রে স্থাপিত, এবং কে না জানে, আকাশের তারাগুলি নিয়ে যত গান ও কবিতাই লেখা হোক না কেন, ওগুলি কোটি-কোটি সূর্যের চেয়েও তাপবিশিষ্ট এবং তাদের মধ্যবর্তী কালো আকাশ আসলে কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে উক্ত ক্রুদ্ধ ও চংক্রমান নক্ষত্রদের তফাতে রেখেছে। ডালটন-গঞ্জ গরম, কাঠের ব্যবসার গরমে। ঝুঝার গরম, হতভাগ্য ও আধুনিক ভারত থেকে নির্বাসিত কিছু আদিবাসীর বঞ্চনার উত্তাপে। পূর্তি মুণ্ডার সমস্যা এই টেরিক্লথ ও পাউডার শোভিত ঝকঝকে ছেলেটিকে বোঝানো ছায়াবাজির শামিল এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

—কাদের কথা বলছ?

—তারা খায় শুধু ঘাটো বা মাড়োয়া বা ভুট্টা সেদ্ধ। তরকারি বা ফল বা মাছ মাংস···

—তারা নুন খায় না? কেন?

—পায় না।

—গপ্প কথা! নুন হল সব চেয়ে সস্তা জিনিস।

—ওদের লবণ বেচছে না···

—ঝুট!

—লো-ক্যালোরির সিরিয়াল খায় যারা, তারা লবণ না পেলে কি হবে?

—কাদের? য়ো নয়া ফিল্ম দেখেছ?

—না। বল না!

—অ'রে আনাড়ীকে বোঝাই কি করে।

—নইলে তুমি পণ্ডিত হয়েছে কেন?

—লবণ শরীরের ফ্লুইড কন্ট্রোল করে, রক্তেরও। লবণ না পেলে

রক্তের কোআগুলেশন বেড়ে ঘন হবে। হাট সে ঘন রক্ত পাম্প করতে কষ্ট পাবে, নিশ্বাসে চাপ আসবে। মাস্‌লে ক্র্যাম্প ধরবে। শরীর চালনা করতেও খুব স্ট্রেন্ হবে। শরীরের হাড়ের ও দাঁতের ত ক্ষয় হবেই। জেনারেল ডিকে হবে বডিতে। ছোড়ো ফজুল্ বাত! চলো, ফিল্মটা দেখে আসি।

ফিল্মটিতে দুর্ধর্ষ গানম্যান, বন্দুকবাজি, উত্তুঙ্গ যৌবনা টাঙ্গাওয়ালী এবং অমিতাভ বাচ্চন্ ছিল। কিন্তু আমজাদ খাঁ আইনের হাতে শাস্তি পাবার পর, বনারসী পান খেয়ে ঘরে ফিরেও যুবকটি ঝুঝারের সমস্যা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। পরদিন সে টাহাড়ে উত্তমচাঁদের বাড়ি গেল।

তার অভিযোগ শুনে উত্তমচাঁদ বলল, আদিবাসীরা আগে মিছে কথা বলত না। এখন বহোত খচড়াই হয়ে গেছে।

—কেন?

–আমি পূর্তিদের লবণ বেচছি না?

—না।

—আরে আমি কারুকে লবণ বেচছি না। লবণে কুছু নাফা নেই। আমি গত হাট থেকে লবণ আনছি না হাটে। এর আগে ওদের লবণ বেচি নি? কা আজীব বাত! অল্প লবণ বেচি নি? কা আজীব বাত! অল্প লবণ, উঠে গেছে হয়ত দোকান থেকে।

—লবণ বেচছেন না? কেন?

– নাফা নেই।

– এটা কি ঠিক হচ্ছে?

—আমি যখন উত্তমচাঁদ, বানিয়া, যখন আগে কাংগ্রেসকো মদত দিয়েছি, তখন আমার সব কথাই ত খারাপ কথা, সব কাজই বেঠিক কাজ।

— উলটো বুঝলেন যে!

– না বাবুসাব। কাংগ্রেসকো মদত দিয়েছি, যখন যে সরকার চালায় তাকে মদত না দিলে আমার মতো গরিব গেঁয়ো বেনে বাঁচে না। আপনারা বলছেন, আমি বেঠবেগারি বন্ধ করে দিলাম, ফসলে হকও

ছেড়ে দিলাম। কাংগ্রেসের ছেলেরা বলে নি এ-সব কথা। বললে তখনও দিতাম। তবে এখন যা বলছেন, তা করি কি করে? যে চীজে নাফা নেই, তা বেচতে বললে জবরদস্তি হয়ে যায়।

—ওরা ধার নিতে আসছে?

—না না, ধার ওরা নেবে কেন? ফসল পাচ্ছে। আর আমাকে ত দিল হাতপোঁছা এতটুকু।

—ও জমিতে কি হয় বলুন?

—না হলে বা কি করব? জমি কম-ফল্‌নি হলে তাও কি আমার দোষ? আর কি জানেন? ধার ওরা নিলেও আমি ধার দেব না।

—কেন?

—এই দেখুন! ধার দিলে ধার শোধ নিতে হয়, আর তা আপনাদের সরকারে বেআইনী। দেখুন, বেশি নাচলেই গণেশ পুজো হয় না। এ আইন আগেও ছিল। কাংগ্রেসী সরকার চোখ বুজে থাকত। কেন কি, কাংগ্রেসী সরকার মানুষের দুঃখ বুঝত। তারা জানত, মহাজন ধার না দিলে আদিবাসী জংলী লোক ভুখা মরে। আপনারা তা বুঝেন না। ভালো! যা করছেন, ভালো হবে বলেই করছেন। সব ভালো যার শেষ ভালো। ধার ওদের দেব না।

যুবকটি হার মেনে ফিরে আসে ও শুভ সংকল্প করে, প্রথম সুযোগে ঝুঝার বেল্‌টে জনতা-দুকান খুলবার ব্যবস্থা করবে। সংকল্পটি মনে কিছুদিন থাকে। তার পর মদের বেআইনী দোকান নিয়ে গণ্ডগোল মেটাতে সে অন্যত্র চলে যায় ও ঝুঝারের কথা ভুলে যায়।

যুবকদের সকল শুভেচ্ছা সত্ত্বেও পূর্তিরা পড়ে থাকে আলুনি আঁধারে। পূর্তি অবশ্য নিশ্চেষ্ট থাকে না। প্রত্যহ সে জঙ্গলটি কুম্‌ করে নিঃশব্দে। হরিণের সল্‌টলিক জঙ্গল-আপিসের কাছাকাছি। অতঃপর সে একদিন একটি খরগোশ তাড়া করতে গিয়ে হাতির সল্‌টলিক আবিষ্কার করে। দৃশ্যটি খুবই দ্যোতক। প্রাণভয়ে পূর্তি গাছের ডগায়। অদূরে হাতির পাল নুনমাটি খাচ্ছে। পাথুরের লবণ। পাথরের ওপর সামান্য মাটি মিশিয়ে ছড়ানো।

—লবণের খেত করা দিছে!

পূর্তি মনে মনে বলে। তার পর আঁধার ঘনালে হাতিরা স্থানত্যাগ করে। বেতলার হাতিরা 'শো বিজনেস' বোঝে। সন্ধ্যার মুখে জীপ চড়ে টুরিস্টরা জীবজন্তু দেখতে বেরোন। তাঁরা বাঁশগাছ ভক্ষণ-নিরত হাতির পাল দেখে অভ্যস্ত। হাতিরা সেদিক পানে যায়।

সব হাতি চলে গেলে একটি দাঁতাল বৃদ্ধ হাতি আসে। জানান দিয়ে। তার চালচল্তিতে গেরস্ত ভাব নেই, যদিও হাতি অত্যন্ত সংসারী জন্তু। 'একোয়া!' পূর্তি মনে মনে বলে, ও ভয়ে গাছে লেপটে থাকে। কোনো যুবক হাতি একে দল থেকে বের করে দিয়ে যূথপতি হয়েছে। এমন হাতিকেই 'একোয়া' বলে এবং 'একোয়া' সকলেরই আভিয়ডেব্ল। 'একোয়া' কি করবে তা জানা নেই। যূথপতিত্ব এবং দল থেকে নির্বাসনের কারণে এদের ব্যবহার ও আচরণও ইরেস্পন্সিব্ল।

একোয়াটি সল্টলিক মূত্রে ভাসিয়ে চলে যায়। পূর্তি বোঝে, ও ওর বুদ্ধিমতো খচড়াই করে চলে গেল।

হাতির পেচ্ছাপ বাঁচিয়ে নুনমাটির কোঁচড়ে বেঁধে ও ঘরে ফেরে। জল গরম করে তাতে নুনমাটি ফেলে দেয়। বউকে বলে, কাল দেখতে হবে, মাটি নিচে থিতালে কতটা লবণ থাকে।

— জলে লবণ?

—হ্যাঁ।

সকালে দেখা যায় মাটি ও লবণ একসঙ্গে নিচে পড়ে আছে। পূর্তি নিশ্বাস ফেলে বলে, তবু লবণ! শালা এখন হাটে লবণ বেচেই না।

সে নোনা, নোংরা জলই কাপড়ে ছেঁকে খায় পূর্তি, সংবাদটি অন্যদের বলে, এবং 'একোয়া' হাতিটি বিষয়ে সকলকে সাবধান করে। এখন গাঁওবুড়া বলে, খুব সাবধান! সেবার কি হল?

সকলেরই মনে পড়ে। প্রতি বছর সারাণ্ডা ফরেস্ট থেকে এক পাল হাতি বেতলায় আসত ও ফিরে যেত। কয়েক বছর আগে কোনো অবিবেকী আদিবাসী যুবক তীর ছুঁড়ে একটি বাচ্চা হাতি মেরে ফেলে।

ফলে হাতিগুলি খেপে যায় ও মৃত বাচ্চাটি ঘিরে যেন মানুষের বোধাগম্য কোনো প্রতিজ্ঞায় হাঁটতে থাকে।

তার পর তারা প্রতিহিংসার যুদ্ধে নেমে পড়ে। ঝুঝার ও কোল্না গ্রামের অধিবাসীরা পালায়। প্রথম বছর দুটি গ্রাম তছনছ করে চলে যায় তারা।

পরের বছর সারাণ্ডা থেকে এসে তারা জঙ্গলে কাজ নিরত জঙ্গল-কুলিদের দু-জনকে মেরে ফেলে।

তৃতীয় বছর বেতলা জঙ্গলবাংলার নিচে একটি বাস ও গাড়ি তারা ভেঙে ফেলে উল্‌টে দিয়ে।

তিন বছরে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে তৃপ্ত করে তবে তারা ক্ষান্ত দেয়। তাদের 'রোগ্' বলে ঘোষণা করে মারা যায় নি। কেননা সর্বদা তারা যূথবদ্ধ হয়ে ঘুরত ও বয়স্ক হাতিরা রেট্রিবিউশনের কাজ করত। বর্তমানে বেতলায় সর্বত্র কাঁটাতারের বেড়া। হাতির বুদ্ধি খুব বেশি এবং এই কাঁটাতারের নিষেধ তারা বোঝে ও মান্য করে।

গাঁওবুড়া বলল, আর যা করিস, হাতি খেপাস না। তায় একোয়াটা। ওরা ভুলে না।

যুবকরা অবসন্ন শরীর নিয়ে আর পারছিল না। তারা শুকনো মুখে বলল, সাবধানেই যাব। পূজা দিয়েও কিছু হল নাই। দম ছুটে যায়. বোঝা টানতে হাত-পা দুখায়।

সাবধানেই গেল ওরা। সাবধানেই নুনমাটি চুরি করল। 'গাছ থেকে নামবি না আগে, দেখে নিবি সকল হাতি চলে গেছে কি না।' পূর্তির কথাটি মনে রাখল।

তার পর, সম্ভবত একোয়াটির কারণেই সল্‌টলিক শিফটেড হয়। দু তিন জায়গায় সল্‌টলিক তৈরি করা হয়। অনেক পরে একোয়া+ঝুঝারের আদিবাসী+সল্‌টলিক—এই জটিল অঙ্কের উত্তর তলব করলে পরে বনবিভাগের কৈফিয়তটি খুবই যুক্তিসহ ছিল।

একোয়া বা যূথবদ্ধ, এলিফ্যান্ট পপুলেশনের দায়িত্ব বনবিভাগের। এই একোয়াটি খচড়া। এ সল্‌টলিক থেকে নুনমাটি চেটে মুতে দিয়ে

চলে আসে। স্থানে স্থানে সল্টলিক স্থাপন করলে, বনবিভাগের আশা ছিল, একোয়া একটি জায়গায় গেলে, অন্যত্র যেতে পারবে হাতির পাল।

একোয়াটি খুব হিসেব গণ্ডগোল করে দিচ্ছিল। একবার এখানে আরবার ওখানে যাচ্ছিল। যূথে না থাকায় ওর সময়জ্ঞানও পাল্টাচ্ছিল। সন্ধ্যা বা ভোর ছাড়াও ও বে-টাইমেও সল্টলিকে যেত। স্বভাব পাল্টাচ্ছিল। সম্ভবত ও বুঝছিল, নুনমাটি চুরি যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। জীপের আলো পড়লেও নড়ত না। জীপ ঘুরিয়ে নিতে হত। ও কি মানুষকে সন্দেহ করেছিল? শুঁড়ের রেডার চালিয়ে ও কি মানুষের গন্ধ খুঁজত?

বনবিভাগে এক ধরনের টেন্‌শন হাতিটিকে ঘিরে গড়ে ও বেড়ে উঠছিল। এ ধরনের একোয়া হঠাৎ বেগড়বাঁই আচরণ করতে পারে। বনবিভাগের বিপদ হল, 'ম্যানকিলার বা রোগ্‌' বলে আখ্যাত না হলে, সে বিষয়ে প্রমাণ না পেলে, সংরক্ষিত হাতিকে বিনষ্ট করা যায় না।

পরোক্ষে সকলে টেন্‌শনের ফলে কোনো বিস্ফোরণ ঘটার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বনবিভাগের কুলিরা বলছিল, একোয়াটি থাকলে ওরা কাজে যেতে ভয় পায়। ওরা দেখেছে, একোয়াটি দূরে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করছে ও কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। একোয়াটির মনে সন্দেহ ঢুকেছিল। সল্টলিকে যারা নুন রেখে আসে, তাদের মনেও। নুনমাটি খাবলে-খুবলে নিঃশেষ, এ-রকম কাণ্ড তারা কখনো দেখে নি। নুনমাটি-হেন জিনিস কেউ চুরি করবে? না। তারা রিপোর্ট করে নি। রিপোর্টযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হয় নি। নুন-হেন জিনিস! স্টোরে কতই আছে।

এলিফ্যান্ট পপুলেশনও বিভ্রান্ত এবং অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। সল্টলিক আছে, নুনমাটি থাকছে না, তারাও বুঝছিল না কিছু। সবই যেন গোলমেলে।

এর কারণ, এই সমগ্র অবস্থাটির কারণ, পূর্তি ও আরও দুজন যুবক।

প্রথমটা তারা সাবধান থাকত, খুবই সাবধান। বিকেল থেকে গাছের গায়ে লেপটে, মগডালে থাকত নিঃসাড়ে। হাতির পাল ও

একোয়াটি চলে গেলে নুনমাটি নিত। সম্ভবত এই লবণের যোগানে তাদের মাংসপেশী ক্ষিপ্রতর ও স্বাভাবিক গতিক্ষম হয়, দেহের অস্‌মোসিস্ স্থিতাবস্থা ফিরে পায়, রক্তে জলীয় পদার্থ বাড়ে বলে হৃদ্‌যন্ত্র বেশি চাপ না দিয়ে স্বাভাবিক চাপেই শরীরে রক্ত পাঠাতে পারে আবার, শরীরের ইলেক্‌ট্রোলাইট অবস্থা ঠিক হয়ে যায়।

সম্ভবত। এবং তৎক্ষণাৎ মানুষী ফিচলে বুদ্ধি-সকল আগার মাথায় গজায়। তারা সাবধানতা ভোলে। বিকেলবেলা হাতি আসার আগেই এসে নুনমাটি নিয়ে যেতে থাকে। ওরা জানতেও পারে না, একোয়াটি ওদের দেখেছে।

হঠাৎ বনে একোয়াটির দেখা কম মেলে। জানা যায় সন্ধ্যার মুখে, নদীর সাদা বালির বুকে দাঁড়িয়ে একোয়াটি দূরে কি যেন দেখছে।

—কি দেখছে ?

—নদী পেরিয়ে আদিবাসীরা যাচ্ছে।

খবরটি কিছু স্বস্তির নয়। কিন্তু একোয়াটি তার মনোযোগের টার্গেট বদলেছে, এতেই বনবিভাগীয় টেন্‌শন রিল্যাক্‌স্‌ড হয়। তবে বলে দেওয়া হয়, হাতিটি কি করে, তা জানতে পেলেই যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।

কিছুদিন বাদে আবার খয়ের গাছ সংক্রান্ত কাজ পরিত্যাগ করতে হয়। কেননা খয়ের গাছের বন, জঙ্গলের বুকে অবস্থিত, প্রাচীন পলামু কিল্লার পথে। জানা যায়, প্রাচীন পলামু কিল্লার কাছে একোয়াটি ঘুরছে।

এই প্রাচীন পলামু কিল্লা, পালামৌয়ের একদা স্বাধীন রাজাদের দুর্গ। বেতলার গহন জঙ্গলে এই বিশাল, পর্বতসমান উঁচু পাথর ও ইঁটের ভাঙা কেল্লার দৃশ্য রীতিমতো ভয়ংকর। প্রকৃতিসৃষ্ট বনস্পতিময় জঙ্গলে, উচ্চতম শালগাছের চেয়ে অনেক উঁচু। মানবসৃষ্ট এতবড় স্ট্রাকচারের জন্য চোখ প্রস্তুত থাকে না। থাকে না বলেই কেল্লাটি দেখলে ভয় করে।

জঙ্গলকুলিরা দেখে, বাঘের চেয়েও নিঃশব্দে, শুকনো পাতা এড়িয়ে

একোয়াটি কেল্লা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে ও শুঁড় বাড়িয়ে কি যেন খুঁজছে। দেখেই তারা চলে আসে।

পূর্তি মুণ্ডাদের এ-সব কথা জানার কোনো অবকাশ স্বভাবতই হয় নি, কেননা বনবিভাগের লোকজনের আঁচ পেলেই ওরা জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। বনবিভাগের লোকদের কাছে ওই নুনটুকু কিছুই নয়। কিন্তু ওই নুনের কারণেই পূর্তিরা ভাবছিল, কখনোই দেখা দেওয়া নয়। দেখলেই বনবিভাগের লোকেরা ওদের 'নুন চোর' বলে ধরবে। এইসব ভুল বোঝাবুঝি ঘটে যাচ্ছিল এবং একোয়াটি, তার চাটবার ও মুতে ভাসাবার নুনে বঞ্চিত হয়ে অপরাধী-নির্ণয়ে নেমে পড়েছিল—ঠিকই বুঝেছিল সে। সল্টলিক ও ঝুঝারের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। তাই সে সাদা বালিতে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে ঝুঝার পানে চেয়ে থাকত। দৃশ্যটি খুবই প্রতীকী। নদী, বালি, আকাশ, রাত, পলামু কেল্লার দৃশ্যপট, নিঃসঙ্গ হাতি। খুবই প্রশান্ত ও চিরকালীন। শুধু তফাত হল, উক্ত হাতির মাথায় যেসব অভিসন্ধি পাক খাচ্ছিল, তা খুব শ্বেত-কপোত ওড়াবার মতো নয়।

এইভাবেই কয়েকদিন যায়। তারপর এক রাতে কারুকে সাক্ষী না রেখে, হাতিটি জল ও বালি ভাঙতে ভাঙতে ঝুঝার চলে যায় ও দাঁড়িয়ে থাকে কুয়োর কাছে। সকাল হতে সকলেই দোর খুলে প্রাতঃকালীন সদভ্যাসের জন্যে যে-যার মতো বেরোয় এবং কুয়োর পাশে দণ্ডায়মান একোয়াটির পিছন দিয়ে সূর্য উঠতে দেখে যে-যার দরজা বন্ধ করে এবং নিঃসাড়ে বসে থাকে ভয়ে পাথর হয়ে। জানলার ফোকর দিয়ে ওকে নজর করে পূর্তি মুণ্ডা ও মনে মনে জপে, হেই আবা! কেও জানি বাণ না মারে! হেই আবা! কেও জানি বাণ না মারে!

কেউই বাণ মারে না এবং হাতিটি যেন কোনো সংশয়ের উত্তর পেয়ে গ্রাম ছেড়ে নদী পেরিয়ে চলে যায়। সে জঙ্গলে বিলীন হতে তবে সবাই ঘর থেকে বেরোয় এবং গাঁওবুড়া বলে, যা বলেছিলাম তাই হল? নিশ্চয় তুরা অসাবধানে গিয়াছিস, উ দেখেছে। নইলে এল কেনী?

—দেখে নাই। দেখলে আমরা জানতাম না. না ওরে দেখতাম না? হাতি কি খরগোশ?

—হাতি পিঁপড়া—হাতি প্রজাপতি—হাতি বাতাস! অত বড় দেহ, চায় যখন অলখা হয়ে এসে মাথার উপর পা চালাতে পারে. তুই জানবি না। ওরে বোকা! ওরে গু-পোকা! তু ওরে দেখিস নাই. উ তুদের দেখেছে। নইলে এল কেনী?

—যা হবার হয়েছে, এখন বিধান বল।

—পূর্তি! তোরে কি শাস্তি দিলে মন উঠে তা জানি না। যে আদিবাসী কয়লাকাজে, কুলি কাজে শহরে যায়, সে সেথা রয়ে যায়। তুই তা র'লি না। এলি লাথ খেয়ে, ভাব'লি খুব জ্ঞানী হয়া এলি। তা হতে উত্তমচাঁদের সাথ বিবাদ উঠালি। সে বাঘ। তা বাদে হাতি ডেকে গ্রামে ঢুকালি।

—বিধান বল।

—কেউ নুন আনতে যাবে না। যে যার ঘরের চাল ফুড়াও। হাতি দেখলে পলাবে।

পূর্তি বলল, কাঁটাঝোপ কেটে বেড়া দিব? বনে দেয়। তাতে হাতি ডরায়।

—হা হা পাথরামাটিতে গ্রাম! কোথা বেড়া দিবি? কোন্ দিক আটকাবি?

—তবে?

—নুন আনতে যাস না। তাতে যদি ও ভুলে।

গাঁওবুড়ার কথা শুনেছিল পূর্তিরা। আর ওরা নুন আনতে গেল না। আশ্চর্য, হাতিটিও আর এল না। একদিন পূর্তি জঙ্গলের বিট-অফিসারকে বলল, উ একোয়াটা সিদিন গাঁয়ে গিছিল বটে। আমরা খুব ডরালাম।

—আমরাও ভয় পেয়েছিলাম। এখন আর দেখছি না বেটাকে। বোধ হয় চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে বলেই মনে হল সকলের। যেন মিলিয়ে গেল সবুজ

বলে ধূসর প্রাণীটি। জলাশয়ে জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখে জীব-জন্তুর পরিসংখ্যান তৈরি হয়। জলাশয় বা কমলদহ দেখে বা না দেখেই বনবিভাগকে তো দিল একোয়াটির উত্তর।

একোয়াটি নদীর বাঁকে, যেখানে বাঁশবন ঝুঁকে পড়েছে, সেখান থেকে সবই দেখছিল ও বুঝতে চেষ্টা করছিল। সল্টলিকে এখন কারো হাত পড়ে না; পরিবেশে সে গো থাকে না মানুষের অশুচি গন্ধ। এটা কি নতুন কোনো আক্রমণ কৌশল? ও যেন জানছিল, মানুষ বেসিকালি ইর্‌র্যাশনাল প্রাণী। একোয়াটিকে কষ্ট করে নুনমাটি নেওয়া ইর্‌র্যাশনাল কাজ। কারণ ওরা র‍্যাশনাল। কিন্তু মানুষ বেশিদিন যুক্তিসহ কাজ করতে পারে না। পূর্তিরাও তো পারবে না, তা যেন একোয়াটি জানত।

পূর্তিরা সেই ইর্‌র্যাশনাল কাজই করল। সব চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হল, যখন করল, তার এক সপ্তাহ আগে থেকে 'এনাফ ইজ এনাফ' স্থির করে উত্তমচাঁদ হাটে চালাও লবণ বিক্রি শুরু করেছিল। পূর্তিরা সে খবর জানত কিনা, তাও জানা যায় নি। হয়ত জানত না। হয়ত জানত, তবু বিশ্বাস করে নি উত্তমচাঁদ ওদের লবণ বেচবে। হয়ত একোয়াটির নাকের ডগা দিয়ে অথবা একোয়াটিকে ধোঁকা দিয়ে নুনমাটি চুরি করতে ইচ্ছা হয়েছিল ওদের। তারাও যে পুরুষ এবং কৃতবর্মা, তা প্রমাণ করবার জন্য ওই কাজ করাই ওদের কাছে খুব বীরত্বের কাজ মনে হয়েছিল। হয়ত। কিংবা বনবিভাগকে আউটউইট করতে ইচ্ছে হয়েছিল। কি মনে হয়েছিল পূর্তিদের, তা জানা যায় না। তবে অনেক জেরার পরে জানা যায়, ভোর রাতে পূর্তি ও আর দু জন যুবক বোরা নিয়ে বেরোয়। বলে যায়, সাবধান, সাবধান, চেঁচাস না বউ। সাবধানেই যাব আর আসব। সূর্য উঠলে হাতি চলে যাবে, তখন যাব। ওরা যায় এবং একোয়াটিও অগ্রসর হয়। হাতি গুরুত্বে স্থলচর প্রাণী। কিন্তু বোধ বুদ্ধি যখন মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে নামে, তখন ইচ্ছে হলে পিঁপড়ের চেয়েও নিঃশব্দে চলতে পারে এবং প্রতিটি শুকনো পাতা সন্তর্পণে পা ফেলে চরাচর সতর্ক করে। তাই তাকে দেখে পূর্তির মনে হয়েছিল প্রাচীন পাহাড় বোধ হয়

এগিয়ে এসেছে। খুব কাছ থেকে হাতিকে, যত্ত বড়, তার চেয়েও বড় দেখায় বটে।

হাতিটি নিঃশব্দে শুঁড় ও পা চালিয়েছিল, কিন্তু মানুষ তিনটি ভীষণ, ভীষণ চেঁচিয়েছিল। তাদের আর্তনাদে দূরদূরান্তের হস্তীযূথগুলিও চঞ্চল হয়ে ওঠে, হরিণগুলি ছিটকে পালিয়েছিল। মানুষের আর্তনাদ ঝপাঝপ কাটা পড়ে নৈঃশব্দ্য হয়ে যায়। তার পর হাতিটি প্রায় মানুষী উল্লাসে তীক্ষ্ণ চিৎকারে আকাশ ফেড়ে ফেলে বনভূমি দলিত করতে করতে চলে যায়।

কেন এ-রকম হল তা সঠিক জানা যায় না. পূর্তিদের বক্তব্য। দলিত ও পিষ্ট মানবশরীর কোনো সাক্ষী বা এজাহার দিতে পারে না।

—নুনমাটি চুরাতে এসে মরল? নুনমাটি?

সকলের সেই কথাই মনে হয় ও পূর্তিদের সমগ্র আচরণ খুব দুর্বোধ্য ঠেকে। অবশেষে দারোগা বলে, নিশ্চয় মদের নেশায় মাতাল হয়ে কবে থাকবে।

সকাল, মদ খেয়ে আদিবাসীদের মাতাল হবার সময় কি না, এ কথা কেউ বলে ব্যাপারটি জটিল করে না। এই নুনমাটি চুরির ব্যাপারটি এত দুর্বোধ্য! নুন-হেন সস্তা জিনিস! মদ খেয়ে মাতাল না হলে এমন ইর‍্র্যাশনাল কাণ্ড পূর্তিরা করবে কেন?

—হাতির নুনমাটি চুরি করতে গিয়ে মরল! দারোগার কথা কয়টি পূর্তিদের এপিটাফ হয় এবং ঝুঝারবাসীরা যে কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা প্রমাণ হয়ে যায়। তৃণভোজী প্রাণীর নুন দরকার, সে নুনও যদি মানুষ চুরি করে! মানুষের হাত থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ যে কত কঠিন তা যেন পূর্তিদের এই অস্বাভাবিক কাজে আবার মনে পড়ে যায়।

একোয়াটির অজান্তে সে 'রোগ্' ডিক্লেয়ার্ড হয় এবং যেহেতু তার নিধনে হস্তীযূথ রুষ্ট হবে না, সে একলা, সেহেতু জনৈক কমিশনড শিকারী তাকে গুলি করে মেরে ফেলেন। ঘটনাটি কাগজে ছোট্ট সংবাদ হয় ও নিহত একোয়া দেখতে ঝুঝারবাসীরাও আসে। গাঁওবুড়ার, হাতিটিকে দেখে অস্বচ্ছভাবে মনে হয় এ ঠিক হল না। প্রত্যক্ষ সত্য, হাতিটি

পূর্তিদের মেরেছে, ফলে সে মরেছে। পরোক্ষ সত্য যেন অন্য কিছু। নুনের জন্যে এত! তারা নুন পায় নি। নুন কিনতে পারলে তিনটি মানুষ ও একটি হাতি মরত না। অন্য কেউ দায়ী, অন্য কেউ। যে নুন বেচল না সে? না অন্য কোনো নিয়ম? অন্য কোনো ব্যবস্থা? যে নিয়ম ও ব্যবস্থার প্রচ্ছায়ে থাকলে নুন না-বেচলে উত্তমচাঁদের কোনো দোষ হয় না? তার চিন্তা খুব অস্বচ্ছ এবং কথ্য শব্দভাণ্ডার খুব পরিমিত বলে সে কিছুই বোঝাতে পারে না কারুকে।

—এ ঠিক কাজ হল না হে। বাবুদের উদ্দেশে এইটুকুমাত্র কথা কয়টি ছুঁড়ে দিয়ে সে গ্রামবাসীদের নিয়ে স্থানত্যাগ করে ও সার বেঁধে সাদা বালি পেরিয়ে ঝুঝারে ফিরে যায়। মাথা নাড়তে নাড়তে। নুন যে জান লড়িয়ে দেবার মতো সমস্যা হতে পারে, তা বাবুরা কোনোদিনই বুঝবে না এবং ব্যাপারটি তাদের কাছে অবাস্তব থেকে যাবে তা সে জানে। জানে বলেই একবারও পেছন ফিরে চায় না। বালির বুকে ওদের চেহারা ক্রমেই ছোট হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি হাঁটে। নিজেদের জীবনে ফিরে গেলে তবে ওরা স্বস্তি পাবে, যে জীবনে অবিশ্বাস নেই, পূর্তিদের মৃত্যুর সহজ ব্যাখ্যা নেই, সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে ওদের একজিস-টেন্সের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা নেই। সেই জীবনে।

বিছন

কুরুডা ও হেঁসাডি গ্রামের উত্তরে জমি ঢেউখেলানো, একেবারে শুকনো। রোদে জ্বলা। বৃষ্টির পরও এখানে ঘাস জন্মায় না। মাঝে মাঝে ফণীমনসার জঙ্গল ফণা তুলে থাকে, কয়েকটি নিমগাছ। এই দগ্ধ ও আন্দোলিত প্রান্তর, যেখানে মোষ চরতে দেখা যায় না, তারই মাঝামাঝি একটি ডোঙা-আকারের নাবাল জমি। জমিটি আধাবিঘা হবে। উঁচু পাড়ে উঠলে তবে জমিটি চোখে পড়ে এবং সবুজের সমারোহ দেখে ব্যাপারটি ভূতুড়ে লাগে।

আরো ভূতুড়ে লাগে, জমির মাঝে কাঠের খুঁটির ওপর মাচা ও ছাউনি দেওয়া ঘর দেখে। এই জমিতে ঘর খুব অস্বস্তিকর। দর্শকের চোখে। কেননা এ রকম ঘর থাকে ফসল পাহারা দিতে। এ জমিতে শুধু আনারস গাছের মত সকন্টক এলো গাছ। মোষেও খায় না। এলোর আঁশ থেকে পৃথিবীর অন্যত্র অত্যন্ত মজবুত দড়ি হয়। ভারতে এলো গাছ বুনো ঝোপ বলে গণ্য।

সব চেয়ে ভূতুড়ে দৃশ্যটি দেখা যায় সন্ধ্যায় মুখে। কুরুডা গ্রামের দিক থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে একটি মানুষ এদিক পানে আসে। কাছে এলে দেখা যায় সে বুড়ো, চামড়া পাকানো-পাকানো, কোমরে কপ্নি, কোমর থেকে একটি কাঁথার বটুয়া ঝুলছে। হাতে ওর লাঠি থাকে ও এলো গাছের গায়ে এলোপাথাড়ি লাঠি মারতে মারতে ও মাচানের কাছে যায়। গাছের ডাল-কাটা, অত্যন্ত নড়বড়ে এক মই ধরে ও ওপরে ওঠে। চকমকি ঠুকে বিড়ি ধরায়, বসে থাকে মাচানে। প্রত্যহ। অন্ধকার ঘনালে কোনো এক সময়ে ও চাট্টি পেতে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রত্যহ।

প্রত্যহ কুরুডা গ্রামে দুলন গঞ্জুর বুড়ি স্ত্রী ওর উদ্দেশে গাল পাড়ে সে সময়ে। স্বাধিকারে। কেননা বুড়োর নাম দুলন গঞ্জু। এই গাল পাড়ার ব্যাপারটি ওর ছেলে-বউ-নাতি-নাতনীর পছন্দ নয়। কিন্তু

কিছু করারও নেই ওদের। কিছু বললে বুড়িও ওদের গাল দেবে। আর ধাতুয়াকে মাইয়ার গাল দেবার, ঝগড়া করার ক্ষমতা তল্লাটে কিসিতে। ঝগড়া কোঁদলে ও দক্ষ ও পেশাদারী কোন্দলক্ষমতাকে আহ্বান জানানো হয়। ও গিয়ে প্রতিপক্ষের ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষের প্রথম পুরুষকে ধরে গাল দিতে শুরু করে। সাধারণত ও তৃতীয় পুরুষে পৌঁছলেই প্রতিপক্ষ রণে ভঙ্গ দেয়।

সবাই ওকে সমীহ ক'রে। জরুরী অবস্থায় যখন তামাডিতে হাঙ্গামা বাধে, এ গ্রামেও পুলিস এসেছিল জিজ্ঞাসাবাদ করতে। ধাতুয়ার মা পুলিসকে আগুন ছিটিয়ে গাল দিতে দিতে গ্রাম ছাড়িয়ে ছাড়ে। পুলিস যাদের খোঁজে এসেছিল তাদের একজন গোয়ালের মাচায় লুকিয়েছিল। ধাতুয়ার মা, 'আয়, সব ঘর দেখ, আয় মড়াখেকোরা' ব'লে এমন চেঁচায় যে চেঁচানিতেই প্রমাণ হয় গ্রামটি একেবারে নিরাপদ।

তাতেও ক্ষান্ত হয় না ও, বলে, দেখ্‌ এখন গ্রামে পাবি শুধু বুড়ো বুড়ি আর ছেলে। তাদের দেখবি? তাদের ধরবি?

পুলিস চলে গেলে পর ধাতুয়ার মা পলাতক ছেলেটিকে ধুইয়ে দেয় বাক্যবাণে রোতোলি। চিরকাল তোর আন্ডবুদ্ধে বুদ্ধি। একটা বুড়ি বকরির তোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে। সে রাজপুত মহাজনের গায়ে টাঙি মেরেছিস, বেশ করেছিস। গলায় মারলে প্রাণ যেত। তা পালাবি তো বনে? জঙ্গলে পালিয়ে থাকবি তো? গ্রামে কেরে কোন্ বোকাটা? যা বনে যা!

ধাতুয়ার ক্ষমতাও নেই, সে আর লাটুয়া মাকে বলে, বাপকে গাল পেড়না।

তাহলেই মা জ্বলে উঠবে। বুড়ো এখন ছেলেদের বড় ভালবাসায় জম হয়েছে। মা বুড়ি বকরি, অকেজো। বাপের স্বরূপ জানবে ছেলেরা? মা জানে।

চার বছর বয়সে যার বিয়ে হয়। চোদ্দয় পড়তে মা 'গওনা' সম্পন্ন করতে আসে। মা হাতেহাতে জানে ও বুড়োর স্বভাব। কাঁটাবুনো জমির জমিদারি যে রাজ্য পাহাড়, তার জমা, তারা আগে কাটত না

বাঘে খেলে বিধবা হবে কে ? ধাতুয়া আর লাটুয়া ? বুড়ো মরলে সংসার টানবে কে ? লাটুয়া আর ধাতুয়া ? তাদের মুরোদ আছে, ওই আকলা জমি দেখিয়ে বছর বছর বিছন আনার ? সরকারী সার এনে বেচে দেবার ? পহানের হাল-ভৈষা দেখিয়ে বছর বছর হাল-বলদের টাকা বের করার ?

ছেলেরা চুপ ক'রে যায়। মা ঘন ঘন হুঁকো টানে ও 'আমি না মরলে তোরা আমার দাম বুঝবি না,' এই মোক্ষম কথাটি ব'লে শুয়ে পড়ে। বউরা ফিস্‌ফিস্ ক'রে ছেলেদের বলে, যাক, একটা দিন কাটল।

মা অন্ধকারকে উদ্দেশ ক'রে বলে একদিন মরে থাকবে ওখানে। দেখতেও পাব না।

ছেলেরা জানে, এলো বন পাহারা দিতে মাচানে রাতে-থাকা ব্যাপারটি খুবই অবাস্তব, স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাবাকে ওরা স্বাভাবিক মানুষের হিসেবে ফেলে না। বাবা অত্যন্ত জটিল, অন্ধকার স্বভাবী, দুর্বোধ্য। গঞ্জুদের কাজ, মৃত পশুর চামড়া ছোলা। বাবা একবার, দুর্ধর্ষ রাজপুত মহাজন, দশটা বন্দুকের মালিক লছমন সিংয়ের কয়েকটা মোষ মেরে ফেলে সেঁকো বিষ দিয়ে। লছমন সিংয়ের গ্রাম তামাড়িতে বসে। তারপর চামড়া ছুলে বেচে দিয়ে আসে। লছমন সিং স্বভাবতই নিজের শরিকী ভাই দৈতারি সিংকে সন্দেহ করে। ফলে যে গৃহযুদ্ধ লাগে, এখনো তা সম্পূর্ণ থামে নি।

তারপরেও বাবা টিকে আছে। তাতেই প্রমাণ হয়, বাবা অন্য মাপের মানুষ। বেঁচে থাকার কৌশল ভাবতে ভাবতে বাবা কোনোদিন ছেলে বা নাতির সঙ্গে কথা কইতে সময় পেল না।

মাও কম যায় না। মা'র হাড়পাকা শরীরে খাটবার ক্ষমতা এত বেশি, সাহস, জেদ, রাগ এত বেশি, যে মা-ও সাধারণ মাপের বাইরের মানুষ।

বাবা ও মাকে ওরা জীবনে বসে কথা কইতে দেখে নি। কিন্তু বাবা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, তখন মাকে ডেকে উঠোনে বসায়।

হুঁকো ধরিয়ে দেয়, বলে, এ ধাতুয়াকে মা! একটা বুদ্ধি বাত্‌লা। তোর বুদ্ধি গ্রামে সবাই নেয়, পুলিস তোকে ভয় পায়।

—কি খচড়াই কথা ভাবছ? কাকে ধোঁকা দেবে না যথ্‌ দেবে?

মার কথায় চড়াগুর থাকে, ঝাঁজ থাকে না তখন। দুজনে নিচু গলায় সলা-পরামর্শ করে। এ রকম ঘটনা বছরে-দেড়বছরে একবার ঘটে।

অন্য সময়ে বাবা মায়ের সঙ্গেও কথা বলে না। মা বলে, এর চেয়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।

বাবা ধূর্ত হেসে আস্তে বাতাসকে বলে, হ্যাঁ। টুরা গ্রামে তোর বাবার মস্ত মকান।

মায়ের বাপ-মা-ভাই কেউ নেই। মা তা জানে। তবু বলে আর বাবাকে ধূর্ত হেসে টিপ্পনী কাটবার সুযোগ দেয়।

এরকম বাপ আর মা ধাতুয়া ও লাটুয়ার, কিছু করবার নেই। পাহাড়টা কেন পশ্চিমে, কুরুডা নদী কেন বয়ে চলে, তা নিয়েও কিছু করার নেই যেমন। শনিচরী বলে, তোর বাবা আর মা দুজনেই পাগলা। বাবা তোর পুরো পাগল। পাগল না হলে, যখন থেকে জমি পেল, পাহারা দিচ্ছে, অথচ ধান বোনে না?

কথায় বলে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। ও জমিটা পাওয়া জমি, কিন্তু ওতে চোদ্দ পয়সার ফায়দাও ওঠার নয়।

জমিটি উক্ত লছমন সিংয়ের। বেশ কয়েক বছর আগে সর্বোদয় কর্মীরা অঞ্চলটিতে জমি মালিকদের দোরে দোরে ঘুরতে থাকেন। তাদের বেলাও শনিচরী বলত, বাবু জাতের পাগল এরা। জমি মালিকদের মনে এরা আফসোস আনবে। জমি মালিক আপনা হতে বলবে, ইশ! আমার এত জমি, আর এদের মোটে জমি নেই? তখন তারা জমি দিয়ে দেবে। যেদিন দেবে সেদিন আমি চৌকিতে বসব, মাট্‌ঠা মাখন খাব, দুবেলা ভাত রাঁধব।

কিন্তু জমি মালিকরা তখন স্বশ্রেণীর জমিমালিকদের হজ্জিমত দেবার উদ্দেশ্যে নিষ্ফলা-পথুরে-বন্ধ্যা জমি দিতে থাকল কিছু কিছু। পাঁচশো-

সাতশো—হাজার-হাজার বিঘা আবাদী জমি সকলেরই আছে। ধান-ভুট্টা-গম-মাড়োয়া-সর্ষে-অড়হর সবাই চাষ করে। চীনেবাদামের চাষ এখন খুব লাভজনক। কিছু অনাবাদী জমি দিয়ে দিলে এসে যায় না কিছু।

জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। জমি দেওয়া হল। সর্বোদয়ী নেতারা ও কর্মীরা ভারতভূমে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মুখ রইল। কুরুডা—বেল্টের রাজপুত-কায়স্থ জোতদার-মহাজনরা কি জমি দিল না? তাহলে তাদের হৃদ-পরিবর্তন ঘটেছে? নিশ্চয়। ব্যস্। সর্বোদয়ী মিশন সার্থক। তারপরই তারা মধ্যপ্রদেশে ডাকাতদের হৃদ-পরিবর্তন ঘটাতে যান। জমিমালিক ও ডাকাত দু শ্রেণীর হৃদয়ে অনুশোচনা না আসা পর্যন্ত তাদের মিশন সম্পূর্ণ হয় না।

জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। বাঁজা জমি বেরিয়ে গেল। গ্রহীতাদের কিনে রাখা গেল। সরকারের কাছে নিজেদের খুঁটি আরো শক্ত হল। শেষপাতে রসগোল্লার মত সর্বোপরি রইল নিজেকে করুণাময় ভাবার আনন্দ।

সে সময়ে দুলন গঞ্জু উক্ত জমিটি পায়। জমিটি সে নিতে চায়নি। কিন্তু লছমন সিংয়ের প্রতাপ অত্যন্ত বেশি। সে চোখ রাঙিয়ে বলল, একেই বলে ছোটলোক। আজ আমার মনে ভাল ভাব এসেছে দিচ্ছি। ব্যাটা কাল কি আর ভাল থাকব?

দুলন বলল—হুজুর মা-বাপ।

তবে? নাবাল জমি, বর্ষায় জল হুড়হুড়িয়ে নামে, যা চষবি তাই হবে।

বর্ষায় পাড়ধোয়া রাঙা জল নামে ও থিতোয়। কিন্তু চতুর্দিকে যে বন্ধ্যা পাথর। সেই কাঁহা মুলুকে গিয়ে কে চষবে জমি? কর্জনা জমি হলে লছমন সিং ফেলে রাখত। দুলন গিয়েছিল টাকা কর্জ করতে। জমি মালিক হয়ে ফিরে এল।

গ্রামের সবাই বলল—বড়লোকের বদখেয়াল। ঘিয়ের পরোটা খেয়ে খেয়ে এর মাথা গরম হয়েছে। কাল ভুলে যাবে।

যদি না ভোলে ?

আরে ফেলে রাখবে। আরা-ছাপরায় সর্বোদয়ীদের কথায় এমনি জমিই সব দিয়েছে। যারা নিয়েছে, তারা আবার মহাজনকে জমি বেচে দিয়েছে, বাঁধা দিয়েছে। তুমিও দেবে।

ও জমি নেবে কে ? মহাজন তো নিজের নামে কিনছে, ওটা ঘাড থেকে নামাচ্ছে।

তুলন আরো কথা বলত। পহান ওকে ভীষণ ধমক দিল। অনেক সমস্যা আছে ওদের। তুলনের ঘাড়ে ওই বিদঘুটে জমি চাপাবার সমস্যা তার কাছে কিছু নয়।

তুলন গজর গজর করল।

ওর বউ বলল, ও! জমি থেকে ফায়দা ওঠাবে কি করে, তাই ভাবছে। মুখে কত নাকারা। কোনদিন কেউ ইদিস দেয় না ওর।

এই জমি থেকে ফায়দা ?

শনিচরী পরদিন সব শুনেমেলে বলল—কেন ? এ ধাতুয়াকে মাইয়া! জমি পেলে ধাতুয়ার বাপ চলে যাবে তোহরিং বিডিও আফিসে। জমি চাষের খরচ, বিছন স—ব দিবে সরকার।

একথা শুনে তবে তুলনের মুখে হাসি ফুটল। চোখ দুটি স্বপ্নে ধূসর হয়ে গেল ওর।

কোন কোন রূপকথায় গাই গাভীন না হয়েও দুধ দিয়ে চলে। তুলনের মত মানুষও বোঝে নি, আধলা জমিটি কিভাবে তার সংসার চালনায় সাহায্যে আসবে।

জমি একদিন দলিল-পত্তর হয়ে তার হাতে এল। গঞ্জু পাড়ায় দুটি টানা ঘর একই দালানের কোলে. সেই ঘরেই বাস; রান্নাবান্না, সব। এই ওর পৃথিবী। দালানের একপাশে আগড় দিয়ে স্বামী স্ত্রী ঘুমোয়। এ হেন নিসম্বলে লোক কোমরভাঙা হয়। চারদিকে ওর রাজপুত জোতদার ও মহাজন। টাহাড়ের হনুমান মিশ্র ব্রাহ্মণ। তিনি এ অঞ্চলের বিশেষ প্রভাবী মানুষ। এ হেন জায়গায় বাস করে, সর্বদা উচ্চ বর্ণের শাসনে থেকে, তুলনের কোমর ভেঙে থাওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু বাঁচবার তাগিদে ও, জোর খাটিয়ে নয়, ফিচলেমি করে সর্বদা প্রতি পরিস্থিতি থেকে ফায়দা তুলে নেয়। বলে নয়, কৌশলে ও ছলে ওকে প্রবল সব প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে চলতে হয় বলে ঘাঁৎ-ঘোঁৎ ওর নখদর্পণে।

ধাতুয়ার মা বলল, খুব বড় জমি, খুব ফল্না জমি, ফসল রাখতে গোলা করতে বল বাপকে, অ ধাতুয়া। লাটুয়া রে, তেরা বাপ জমিদার বন্ গেইল্, জমিদার!

এ সব কথা বলল বটে, কিন্তু গ্রামের লোকরা এবং ও, দু-দলই অপেক্ষা করতে থাকল। ঢুলন কি করে তা দেখার জন্যে।

ঢুলনের একক এবং সুকৌশলী লড়াই গ্রামের লোকরা খুব তারিফের চোখে দেখে। লছমন সিংয়ের মোষের মামলা সবাই জানত, কেউ বলে দেয়নি। দৈতারি সিংয়ের বাড়িতে একটা কুমড়ো বেচে ও একবার দৈতারির বউ, একবার দৈতারির মার কাছে দাম নেয়। লছমন সিংয়ের বাড়ি থেকে যখন ছট্ পরবের কলা-মুলো-সবজী-ফল গরুর গাড়িতে চাপিয়ে কুরুডা নদীর পারে আনা হয়, ও পাশে গিয়ে নিজেই সঙ্গে হাঁটে ও কাল্পনিক পাখি তাড়ায় চেঁচিয়ে এবং সমানে কিছু কিছু সরায়। গ্রামের লোককে ও জীবনেও কিছু দেয় না। তবু গ্রামবাসী ওকে খাতির করে। ওরা যা পারে না, ও তা পারে।

জমি পেতেই ঢুলন লছমন সিংয়ের হাঁটু ছুঁয়ে বলল, মালিক পরোয়ার! জমি দিলে তো চাষ করি কি করে? বি ডি. আপিস থেকে কিছু পাব না। আহাহা, অমন জমি, পেয়েও কাজে লাগবে না।

কেন? বি. ডি অফিস তোকে সব দেবে।

না হুজুর। ছোট জাত।

ছোট জাত তো একশোবার। মনে থাকে না তোদের, তাতেই জুতোলাথি খাস। সে তো আছিসই। কিন্তু আমি যাকে জমি দিচ্ছি, তাকে মদত দেবে না? কে বি. ডি. বাবু?

কায়স্থ হুজুর। বলে রাজপুতরা গাঁওয়ার, মূর্খ। খুব রেডিও শোনে আর বাঁ হাতে ধরে জল খায়, চা খায়।

রাম রাম! ছি ছি ছি।

দেখে এলাম হুজুর।

আমি লিখে দিচ্ছি।

লছমন সিং লেখাপড়ায় মহাপণ্ডিত। ভকিল রাখে ও। ভকিল তুলনের হাল-বলদ কেনার দফা-দফা ঋণ, সার ও বিছন পাবার ন্যায্যতা বিষয়ে কায়েথী হিন্দিতে অত্যন্ত জবরদস্ত এক আর্জি লিখে দিল। বি. ডি. ও তোহরিতে থাকতে পারেন,—তোহরি, লছমনের গ্রাম তামাড়ি থেকে দূরেও বটে, কিন্তু তাঁর ধড়ে মাথা একটি। লছমনের সঙ্গে ও হনুমান মিশ্রের সঙ্গে কোন ঠোকাঠুকি না করতে তাঁকে বলেছেন স্বয়ং এস. ডি. ও।

তখনি তিনি মেনে নিলেন সব। নেংটি পরা তুলনকে অত্যন্ত নরম গলায় বোঝালেন, বিছন তুলন পাবে, সারও পাবে। হাল-বলদের টাকা একবারে পাবে না। খানিক টাকা বায়না করে হাল-বলদ এনে দেখাতে পারলে বাকি টাকা পাবে।

তুলন গ্রামে এসে পহানকে বলল, সরকার কানুন করে, কিন্তু বুঝে না কিছু। হাল-বলদ লোকে টাকা দিয়ে কেনে। দফায় দফায় টাকা নিয়ে বেচে কে? তোমার হাল-বলদ দাও।

সেই হাল-বলদ দেখিয়ে তুলন টাকা নিয়েছে। এক বছর অন্তর-অন্তর। যে বার টাকা নেয়, সেবারই বলে, মরে গেল হুজুর।

টাকা নেয়। সার নিয়ে তোহরিতেই বেচে দিয়ে আসে। বিছনের বোরা কাঁধে বয়ে আনে।

বিছন ও খায়।

বিছনের ধান সিজিয়ে চাল করা চারটিখানি কথা নয়। তাই করে ও। প্রথমবারই বউ বলেছিল, এত বিছন! কত জমি তোমার?

সে জমি মাপলে মাপা যায় না।

সে কি?

আমাদের পেট। খিদের কি মাপ হয়? পেটের জমিন বাড়তে থাকে! তুই আঁদলা জমিতে যেয়ে ধান বুনব? পাগল তুই?

কি করবে ?

সিজা, ভান, খাব।

বিছন খেয়ে মরবে ?

এততে মরব কাম নাই। আকালে ইঁদুর খেলাম কত ! বিছন খেয়ে মরব ? মরলে জানব, ধানের ভাত খেয়ে মরেছি। স্বর্গে যাব।

একবার কিছনেরা ভাত খেয়েছে ধাতুয়ার মা বুঝল, এর চেয়ে মিষ্টি জিনিস সে জীবনে খায়নি।

ছুঁচাটির কথা সে গ্রামে সগর্বে বলে বেড়াল। কে এমন সধবা আছে গ্রামে, যে বলতে পারবে তার মরদ কত বুদ্ধি ধরে, কত কৌশলে গোরমেনকে বোকা বানিয়ে বিছনের ধানের ভাত খাওয়ায় পরিবারকে ?

গ্রামের সবাই খুব খুশি হল। গোরমেন তাদের কোনদিন কোন দেখভাল করে না। গোরমেনের বি. ডি. ও তাদের কোনকালে চাষে মদত দেয় না। গোরমেনের কমিয়াদী স্কুলে তাদের ছেলেরা কখনো ঢুকতে পায় না। লছমন সিং বা দৈতারি সিং ওদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পেটভাতায় বা চার আনা রোজে ফসল কাটিয়ে নেয়। এ নিয়ে যথেষ্ট [illegible] চলছে। কেননা পাশের ব্লকের গঞ্জ-প্রসাদ-খেরিয়া-লাথ [illegible] ভাত দুই পাচ্ছে। আট আনা রোজ ও পঁচিশ পয়সা বাড়াবার জন্য গ্রামবাসীরা খুব আগ্রহী। সব জেনেও হাকিমরা বাইরে থেকে সি. আর. পি. ও পুলিস নিয়ে এসে গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে যান। লছমন সিং বা দৈতারিকে কিছু বলেন না।

গোরমেন লছমন সিংয়ের। গোরমেন লছমন সিং, দৈতারি সিং, হনুমান মিশ্রের। এ হেন গোরমেনকে বোকা বানায় যে, সে যদি তুলন ধাঙ্গু হয়, তাহলে তাকে গ্রামের লোক তারিফ করবে বইকি।

জমিটি কামধেনুর মত তুলনকে বছরে বছর ছটাকা দিতে থাকল। কিন্তু তখনো তুলন ঘরেই ঘুমোত। দাওয়ার কোণে, মাচানে, ধাতুয়ার মার পাশে। ধাতুয়ার মার কাশি ও হাঁপানি আছে। মাচানের নিচে আমছাগল বেঁধে রেখে ঘুমোয়। ছোট ঘরটা ছেলের। ধাতুয়া ছেলেপুলে নিয়ে। গামছা, বোরা, ভুট্টা, দোয়া; হাঁড়ি, কলসি, আমাদের কাঠ, কাই

তুই ঘরে। জমির আয়ে সব সময়টা চলে যায়। তখন বাপ ও তুই ছেলে জনখাটে, বেগার খাটে। আলুর খোঁজে, তাহেরি গিয়ে মাল টানে। মিশ্রজাত বাগিচায় যায়। আবার ক্ষেত।

এরই মধ্যে চলে এল তামাদির করজা। তুসাদ বাহেরাও শাসদার আদমি। লছমনের খেতে মজুরী খাটত। মালিক পরিবারের সঙ্গে মজুরীর লড়াই করতে যেয়ে জেহেল চলা গিয়া। জেলে, হাজারীবাগ জেলে ও বিহারের আরো আরো বন্দীদের সঙ্গ পায়।

তারা ওকে "তুসাদ" বলে ঘেন্না করেনি। সম্মান করেছে লড়াকু বলে। অবাক হয়ে জেনেছে, কোন সংগঠনের মদতে নয়, অন্যায় শোষণে খুব দাঁড়িয়ে ওরা। তুশো কিষাণ, দুর্ধর্ষ লছমন সিংয়ের পাকা গম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারা ওকে বোঝায়, এইভাবে লড়াই গড়ে ওঠাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। লড়াইয়ের প্রয়োজনে লড়াই গঠন। সেজন্যে নিজের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে লড়াই করা।

যারা বলে; তারা নির্যাতিত হত, মাঝে মাঝে অনশন করত। তখন কর্তৃপক্ষ তাদের পেটাত। মেরে মেরে মেরে ফেলত কতজনকে। তবু, তারপরেও ওরা করণকে বলত লড়াকু, ঠিক কাজ করেছ তুমি, কখনো লড়তে ভুল না।

ফলে করণ তুসাদের মনের স্তরে প্রচুর ভাঙচুর হয়। যে করণ, লছমন সিং অবস্থা মরিয়া ক'রে তুললে তবে লড়াইয়ের কথা ভেবেছিল সেই করণ, বেরিয়ে আসার পর সকলকে বলে, লড়াইয়ের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে আছে। ও অবস্থা সৃষ্টি করবে। যখন বুকে দাঁড়াব, তখন গুলি খাব, তখন জেলে যাব কেন? আগে থেকেই ছোট বাঁধব। সব মজুর নিয়ে নেব। ওর সঙ্গে নিকল কাটার সময়ে তুলিককে ও ফকে বলব। আমাদের দাবি ঠেক খুব জামসও। আমরা হরিজন ও আর আদিবাসী এই জগা জায়গায় আমরা জলল মজুরী চার টাকা আট আনার লড়াইটাই করব। খেতে বন্দ হয়ে যেটে সেখানে সবকে কোমা, আমরা কত দাও ঠিকারা আম। দেড় দিচ্ছি চারবাজির চার। মাঝে মাঝে এ আমাদের লড়াই...

খবরটি শুনেই তুলন করণকে কুরুডায় ডাকে। সন্দেহী মন ওর। কথা বলে লোকজন থেকে দূরে ওর সেই জমির পাড়ে বসে। করণ তুসাদ বয়সে প্রৌঢ়, রোগা, ছোটখাট মানুষ। হাজারীবাগে বন্দীদের সঙ্গে দু বছর থাকার ফলে নতুন-অর্জিত ব্যক্তিত্ব তার।

জাত-পাঁত সব ঝুটা। বরামভন ঔর বড়া আদমি কো বনা হুয়া য়ো ছুতাছুত।

এ কথা ব'লেই ও তুলনকে ঘাবড়ে দেয়। তুলন মনে মনে পলকের জন্যে ঘাবড়ায়। তারপর, ঘাগু লোক তো! বলে, ও তো লিখাই-পড়াই বাবুরা বলেই থাকে। এখন কাজের কথা শোন। ও লছমন সিং আর বি. ডি. আর এস. ডি. ও. আর দারোগা চার গেলাসের ইয়ার। আগে তুই তোহ্‌রির আদিবাসী দফতর আর হরিজন-সেবা সঙ্ঘে যা। ওদের জানিয়ে রাখ। ওরাও তোর সঙ্গে থানা-এস. ডি. ও. করুক।

কেন? আমরা কি কমজোরী?

বহোৎ কমজোরী করণ। ভুল করিস না। সরকারী সবাই লছমনকে মদৎ দেবে। সে বন্দুক ফুটালে দেখবে না, তোরা লাঠি উঠালে ধরবে। হরিজন সেবা সঙ্ঘে মদনলালজী আছে। সাচাই আদমি। সবাই চেনে। সঙ্গে রাখ।

করণ কথাটি মানে। মদনলালের ভোটের পুল বেজায় জোরদার। অতএব এস. ডি. ও. এবং দারোগা আগে লছমনের সঙ্গে গোপন বৈঠক সারেন। পরে মদনলালের কথায় রাজী হন।

অত্যন্ত নির্বিঘ্নে ভুট্টা কাটা ও তোলা হয়। আট আনা মজুরী মেলে। করণ তুসাদ হিরো বনে যায়। রূপকথা সত্যি হয়।

তারপর লছমন হঠাৎ তুলনকে বলে, কাল জমিতে থাকবি। কেউ যদি জানে আমি এ কথা বলেছি, লাশ ফেলে দেব তোর।

উক্ত কাল যখন রাত পোহালে আজ হয়, সেদিন এস. ডি. ও. যান রাঁচি, দারোগা যান ডাকাত ধরতে সুদূর বুরুডিহা।

বিকেল না ফুরোতে, অস্ত রবির রশ্মি আভায় লছমন সিং অন্যান্য রাজপুত জ্ঞাতিভাইদের নিয়ে তামাডির তুসাদ পাড়া আক্রমণ করে।

আগুন জ্বলে, মানুষ পোড়ে, ঘর ভাঙে।

রাতে তুলনের সামনে নবোদিত চন্দ্রমা এক অপার্থিব নীরব চলচ্চিত্র মেলে ধরে। ঘোড়ার পিঠে লছমন সিং। দুটি ঘোড়া পাশাপাশি রেখে, পিঠে মাচান ফেলে একাধিক লাশ। দশ জন অনুচর লছমনের।

করণ ও তার নির্বিরোধী ভাই বুলাকির লাশ, লছমনের বন্দুকের নির্দেশে তুলন জমিতে পোঁতে। সভয়ে, মাথা নিচু ক'রে কোদালে কুপিয়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে। লছমন পাড়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করে ও পান চিবোয়। তারপর বলে, একটা কথা বলবি তো কুত্তা, করণ দুসাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। শিয়াল-লাকড়াকে বিশ্বাস নেই, লাশ উঠাবে। কালই এখানে মাচা বাঁধবি। রাতে থাকবি। করণ যে আগুন জ্বালিয়েছে, আমি রাজপুতের বাচ্চা, এখন থেকে লাশ পড়বে। তুলন মাথা নাড়ে। বেঁচে থাকার তাগিদে ও বলে, তাই হবে।

পরদিন পুলিস আসে। খুব হইচই হয়। শেষে জানা যায়, ঘটনাস্থলে করণ ছিল না ওখানে। রিপোর্টাররা কিছুতেই "এ ট্রু হরিজন স্টোরি" লিখতে সক্ষম হন না। লছমনের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলে না। অগ্নিসংযোগের জন্যে লছমনের এক অনুচরের কিছুদিন জেল হয়। সরকার থেকে গৃহহারা পরিবারগুলির গৃহনির্মাণে যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য আসে।

সেই থেকে তুলন জমিতে থাকে। প্রথমে এটি খ্যাপামি বলে গণ্য হয় ও ছেলেরা ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে। কোনো কথাই, এই স্টেজে তুলনের কানে যায় না। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলে ও রক্ত চোখে চেয়ে থাকে ঠোঁট এঁটে। তারপর মাথা নেড়ে হাতের খেঁটে তুলে বলে, বাত না উঠাস ধাতুয়া! মাথা ভেঙে দেব তোর।

বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে ওর মনের স্তরে, ধস্ নামে, স্তরবদল ঘটে যায়। সোজা, এত সোজা সব লছমনদের কাছে? তুলন জানত, মানুষের জন্ম যেমন বহু আচারে-নিয়মে জড়িত, মৃত্যুও তাই। কিন্তু লছমন সিং এই সব প্রাচীন ও সম্মানি রীতিনীতি কত নগণ্য, তাই প্রমাণ ক'রে দিল। কত সোজা। ঘোড়ার পিঠে দুটি লাশ, এবং

নিশ্চয় তামাডির দুসাদদের নাকের ডগা দিয়ে অসীম ঔদ্ধত্যে লাশ আনা হয়। লছমন জানে, লাশ আনার ব্যাপার লুকোবার দরকার নেই। যারা দেখল, তারা কিছুই বলবে না। তারা লছমনের নীরব ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পেরোয়ানা পড়েছে, যো মু খোলেগা, য়ো ভি লাশ বনেগা। এরকম আগেও ঘটেছে। আবারও ঘটবে। আকাশে আগুন ও আর্ত মরণোন্মুখদের চীৎকার ছুঁড়ে দিয়ে মাঝে মাঝে হরিজন বা অচ্ছুতদের বুঝিয়ে দিতে হয় সরকারী কানুন—অধিকার নিয়োগ ও সংবিধানের ঘোষণা কিছু নয়। রাজপুত রাজপুতই থাকে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকে, দুসাদ-চামার-গঞ্জু-ধোবি এরা থাকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-রাজপুত-ভুঁইহার-কুর্মিদের নিচে। রাজপুত বা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা ভুঁইহার বা যাদব বা কুর্মি, স্থানবিশেষে হরিজনদের মতই, হরিজনদের চেয়েও গরীব হতে পারে। কিন্তু জাতের কারণে তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয় না। খাণ্ডবকানন দহনে কিছু অরণ্যবাসী ব্রাত্য কৃষ্ণাঙ্গকে ভক্ষণ থেকে অগ্নিদেব অচ্ছুত নরমাংসে আজও আসক্ত।

সমগ্র ব্যাপারটি তুলনের মনে বিপর্যয় ঘটায়। এর আগে ওর ছিল সারফেস্ ধূর্তামি। টিকে থাকার জন্য। এখন ওকে মনের নিচে দুটি শবদেহ লুকিয়ে রাখতে হয়। শবদেহগুলি মনের নিচে পচতে থাকে। জমিতে মাটির নিচে প্রোথিত করণ ও বুলাকি মাংসের ওজন হারিয়ে ক্রমে নির্ভার হয়। তুলনের মনোজগতের মৃতদেহের ওজন বাড়ে। তুলনের চেহারা বিবর্ণ হয়, মুখের কথা আরো কমে। কাউকে বলতে পারে না ও গুরুভার বহন করছে নিয়ত। বেঁধে মার খেতে হয়। মুখ খুললে কুরুডার দুসাদপট্টিতেও আগুন জ্বলবে বাতাসে ছাই উড়বে, পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ।

ক্রমে দুদিক থেকে করণ ও বুলাকি, দুটি মানুষ যে নিখোঁজ হয়ে গেল, তা সবাই খাড়া হয়ে ভুলে যায়। তোহরি থেকে এদিকে বুরুডিহা, ওদিকে [illegible] পর্যন্ত [illegible] আদিবাসী ও হরিজন [illegible] অত্যাচার [illegible] [illegible] এখনি তদন্ত ও ব্যবস্থা করার জন্য [illegible] তৈরি [illegible] আদালতে পেশ করার [illegible] এসডিও [illegible]

বুঝে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ঢাই গ্রামে পঞ্চায়েতী কুয়ো খোঁড়া হয়। ঢাই নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী গ্রাম। অঞ্চলটি এইভাবে আধুনিক সময়ের কাছে আসতে চেষ্টা করে খোঁড়া পায়ে।

ফলে লছমন সিংয়ের প্রতাপ আরো বাড়ে। সরকারী নির্দেশ উড়িয়ে দিয়ে সে খেতমজহুরদের চল্লিশ পয়সা মজুরী দেয়, হনুমান মিশ্রের মন্দিরে শিবের মাথায় সোনার গোখরো সাপ গড়িয়ে দেয়। বি. ডি. ও. কে স্কুটার, দারোগাকে ট্রানজিস্টার কিনে দেয় এবং করণ ও বুলাকির নিজস্ব দেড় বিঘা জমি পুরনো ঋণের দায়ে দখল করে।

এ ব্যবস্থায় সবাই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু সহসা খেতমজহুর বিষয়ে সরকারী সার্কুলার আসে এবং আসেন জনৈক নতুন এস. ডি. ও। ইনি বামপন্থী ব'লে অভিযুক্ত এবং এঁকে অন্তিম বাঁশ দিয়ে সাস্‌পেন্‌ড করাই যেহেতু প্রশাসনের শুভেচ্ছা, সেহেতু এঁকে ফসল কাটার দেড় মাস আগে তোহরিতে বদলী করা হয়।

তোহ্‌রি অঞ্চলটির কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী হরিজন ও আদিবাসী। জমি মালিক জোতদার ও মহাজন উচ্চবর্ণ। অঞ্চলটির বিশেষ সমস্যা হল মালিক বিষয়ে খেতমজহুরদের গভীর অবিশ্বাস। সেই কারণেই কৃষিতে প্রার্থিত উন্নতি ঘটছে না এবং মাথাপিছু আয় বাড়ছে না। আয়-ব্যয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সমাজচেতনা সবই থেকে যাচ্ছে সাব-নর্মাল স্তরে। এখানে প্রয়োজন আলোকপ্রাপ্ত, দরদী, মানবিক হৃদয় অফিসার।

এস. ডি. ও. বোঝেন, এভাবে তাঁকে বাম্বু দেওয়া হল। তিনি শ্বশুরকে বলেন, আপনার জিত হল। ব্যাঙ্কের কাজটা দেখুন। এগ্রো-ইকনমিক্‌সের ছাত্র, পেয়ে যেতে পারি। নইলে যেখানে পাঠাচ্ছে, সেখানে থাকলে আপনার একমাত্র মেয়ে বিধবা হবেই হবে।

বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে আসেন বলেই এস. ডি. ও অত্যুৎসাহে খেতমজহুরদের জানান, তোমরা পাঁচ টাকা আশি পয়সা মজুরী পাবার অধিকারী। উক্ত মর্মে তিনি জোতদারদেরও জানান। লছমন সিংয়ের জমি-ফসল ও খেতমজহুর, সুবিস্তৃত তামাড়ি-বুরুডিহা-কুরুডা-হেসাড়ি-চামা-ঢাই সকল গ্রামে। বুরুডিহার গ্রাম-মোড়লের ছেলে, আসরফি

মাহাতো বলে, করণের কথা মনে আছে। তিন বছরেও ভুলি নাই। কিন্তু এস. ডি. ও. এখন ভাল লোক। তবে কেন মোরা চল্লিশ পয়সা পেট ভাতায় ফসল কাটি? পাঁচ টাকা আশি পয়সা! পেটভাতা চাই না, পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সা দিয়ে পুরা মজুরী দিক।

একদা করণকে যেমন, আজ আসরফিকেও তেমনি যত্নে বোঝায় চুলন। বলে, করণ চেঁচাল বিস্তর। তাতে তামাড়ির তুসাদপট্টি জ্বলে গেল।

করণ কোথা? বুলাকি কোথা?

কে জানে?

বেঁচে নাই।

এ কথা বলিস কেন?

মেরে জঙ্গলে গাঢায় ফেলে দিয়েছে।

জানি না। তবে হাকিম সামনে রেখে কাজ করিস।

করব।

হাকিম যেন পরের মদতটা দেয়। সেবার মজুরী দিল। পরে আগুন জ্বালাল।

বলব।

প্রতি অঞ্চলে প্রতি সংঘর্ষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে প্যাটার্নিস্টিক। লছমন সিং বলে, অত দেব না। দু টাকা নাও, জল খাই।

মজুরী দিন হুজুর পরোয়ার।

দেব?

লছমন সিংয়ের চোখ অত্যন্ত নরম ও দরদী হয়ে উঠল। সে বলল, ভেবে দেখি! তোমরাও ভাব। দেওয়াটা যে উচিত, তা তো গাধাতেও বোঝে। তবে কি জান? তুমি তো এস. ডি. ও.-র কথা বলছ? তাঁকে বোল, এ তল্লাটে মথখন সিং, দৈত্তারি সিং, রামলগন সিং, হুজুরী প্রসাদ মাহাতো কেউ দিচ্ছে না। আমি একা মার খাব? আসরফি ভীরু অথচ জেদী হেসে বলল, মার খাবেন হুজুর? গম পেষাই কল আপনার, আপনার মকান কত দূর থেকে দেখা যায়, আপনি মার খাবেন?

হাসিটিকে লছমন সিং ধরে নিল উদ্ধত তাচ্ছিল্য বলে এবং বলল যে দু' টাকার কথা বললাম ত আমরা বলে-কয়ে নিয়েছি। জমি রেখে আমরা সরকারের কাছে চোরদায়ে ধরা পড়েছি যেন। তোমাদের যার যেটুকু জমি আছে, সরকারী মদত পাও। আমার জমি দিয়েছি ঢুলনকে। ও হারামী চাষ করে না, অথচ বছর বছর বিছন নেয়। জানবর! বিছন খায়। সে খাক্ গে। আমরা কোন মদত পাই? সার-বিছন-ফসলের পোকামারা ওষুধ, সব কিনতে হয়। আমার কথা এস. ডি. ও-কে বোল।

ঢুলনকে আসরফি বলে—সাবধান! ও হারামী জানে চাচা, যে তুমি জমি চষ না, ফসল উঠাও না।

ঢুলনের মনে শবদেহের ভার আরো ভারি হয়। লছমন সিং তাকে বলেছে ও জমিতে বিছন ফেলে বছর কয়েক চাষ করিস না ঢুলন।

ঢুলন অত্যন্ত দুঃখে আসরফির জন্যে আন্তরিক উদ্বেগে বলে, উসিকো বিশোয়াস মৎ যাইও বেটা। তোহার বাবা হামানি কো ধাতুয়া-লাট্টুয়াকো জনম-কাম কি থা।

—নায় চাচা।

আসরফি যথেষ্ট ঘুরচক্কর মারতে থাকে এস. ডি. ও. এবং লছমনের মাঝখানে। ঢুলন আরোই বিষণ্ণ হয় ও কোন দুর্যোগ আশঙ্কা করে ছেলেদের খিঁচিয়ে বলে, ছোটলোকের ছেলে ছোটলোকই থেকে যায়। জমি ভাঙিয়ে বুড়ো বাপ যা আনছে তাই খাচ্ছে। অন্য কোন ছেলে হলে কাছাকাছি কোন কলিয়ারিতেও চলে যেত। কেন মাটি কামড়ে পড়ে আছিস?

ধাতুয়া ভাসা ভাসা শান্ত চোখ তুলে সবিস্ময়ে বলে, এবার আমরা ডবল মজুরি পাচ্ছি বাবা।

ঢুলন আর কিছু বলে না। তোহ্‌রি চলে যায়, ব্লক আপিসে, বলে —এবার ফসল তুলে রবি দেব। মদত চাই।

বি. ডি. ও সম্ভবত যে জমি চষা হবে না তার জন্যে বিছন দিয়ে চলার অকাট্য কারণ জেনেছেন। তিনিও এই চক্রান্তে লছমন ও ঢুলনের দলে চলে আসেন ও দেঁতো হেসে বলেন, দেখব।

দুলন দেখে ওঁর বাড়িতে একটি সুউচ্চ পেঁপে গাছ। এত উঁচু পেঁপে গাছ দেখা যায় না।

সে বলে, য়ো পাপিতা গাছ এত্তা উঁচা কৈসে হুইল? হাঁ বাবু?

বি. ডি. ও. গভীর আত্মপ্রসাদে হাসেনি। বলেন, ও জায়গাটা পরে আপিসের কম্পাউণ্ডে পেয়েছি। গরমের সময়ে পাগলা কুকুর মেরে ওখানে গর্তে ফেলত। পচা হাড় মাংসের সার পেয়েছে, বড় হবে না গাছ?

—সে সার ভাল?

—খুব ভাল। মুসলমান গরিব লোকের কাঁচা গোরের উপর ফুল গাছ কেমন ঝাঁপালো হয়?

কথাগুলি দুলনের মনের শবদেহ-ভার কিঞ্চিৎ লঘু করে। গ্রামে ফিরে দুলন ভরদুপুরে জমি দেখতে যায়। হ্যাঁ সত্যিই তো। করণ ও বুলাকি তাহলে ঐ পুটুস ঝোপ ও এলো গাছগুলি! চোখ ফেটে জল আসে ওর। করণ, তুই মরেও মরলি না। কিন্তু পুটুস গাছ, এলো গাছ তো কারো কাজে লাগে না, মোষে-ছাগলে খায় না। আমাদের হক নিয়ে লড়তে গেলি। গম হয়ে, ভুট্টা হয়ে, মাড়োয়া হয়ে রইলি না কেন? নিদেন পক্ষে চীনা ঘাস? চীনা ঘাসের দানা সিজিয়ে ঘাটো রেঁধে খেতাম।

সুগভীর দুঃখে ও তামাডিতে গেল ও লছমন সিংয়ের সজ্জি বাগানে কেউ নেই দেখে মাঠের দিকের বেড়া ও তার উপড়ে ফেলে দিল। হর্-হর্-হর্ শব্দ করে কয়েকটি মোষকে ঢুকিয়ে দিল খেতে। তারপর ঘুর পথে এসে সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকে লছমন সিংকে বলল, মালিক পরোয়ার। এক খৎ লিখ দিয়া যায়। হাসপাতালে ভর্তি হব। খাঁসি আর বুকে-ব্যথা।

—ফসল কাটা হয়ে গেলে খৎ দেব।

—বহোৎ আচ্ছা জী পরোয়ার।

আবার দুলনের বুকে শবদেহ গুরুভার হল। নিজের মনের অতলকে চিন্তার খন্তায় খুঁড়তে খুঁড়তে ফিরল। করণ ও বুলাকিকে সরে জায়গা ছেড়ে দিতে বলল।

—ফসল কাটা হয়ে গেলে! তবে করণ ও বুলাকির সেথো হয়ে আসছে কেউ?

ধান কাটা চলছে চলছে। বহু বিতর্কের পর আড়াই টাকা রোজ ও জলখাই। ঘোড়ায় চড়ে স্বয়ং লছমন তদারক করছে। পুলিস আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়িয়ে দেখে গেল শান্তিপূর্ণভাবে ধান কাটা হচ্ছে। সাতদিনের দিন মজুরি মিলল সবাকার।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এস. ডি. ও. পুলিস নিয়ে ফিরে গেলেন।

আট দিনের দিন ঝড় উঠল। বাইরের মজুরা নিয়ে ধান কাটাচ্ছে লছমন সিং। আসরফি ও অন্যরা বিপন্ন, ভয়ে ও জেদে রুক্ষ।

—এ আপনি করতে পারেন না।

—কে বলে পারি না? পারছি তো। কুত্তার বাচ্চারা দেখে নে পারছি।

—কিন্তু—

—দিয়েছি ফসল কাটতে, দিয়েছি মজুরি। বাস্—খেল খতম!

মারমুখী আসরফিদের দেখে বাইরের মজুররা কাস্তে নামায় ও এক জায়গায় জড়ো হয়। গুলির শব্দ। বাইরের মজুররা পালাচ্ছে, পালাল। গুলির শব্দ।

গুলিতে কটা লাশ পড়েছিল তার হিসেব নেই। তুলনদের হিসেবে এগারোটি। লছমন সিং ও পুলিসের হিসেবে সাতটি। আসরফির বাপ একবারে নিষ্পুত্র হল। দু ছেলে, মোহর ও আসরফি নিখোঁজ। খোঁজ মিলল না চামা গ্রামের মহুবন কৈরি ও বুরুডিহার পারশ ধোবির। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। এস. ডি. ও. আসতে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে নিহত ও নিখোঁজদের বাপ মা-বউ-ছেলেমেয়ে। এস. ডি. ও.-র মুখে পাথর-পাথর কাঠিন্য। লছমন সিংয়ের নামে পুলিস কেস করবেন বলে গ্রামবাসীদের কথা দিচ্ছেন। রিপোর্টারদের সব বলছেন, ঘুরে দেখাচ্ছেন। ওয়ারেণ্ট বের করে না আনা পর্যন্ত লছমন সিং ইজ নট টু লীভ হোম।

এবং জ্যোৎস্না রাতে, হিমেল বাতাসে মধুময় পরিবেশে লছমন সিং

আসে। এ অঞ্চলের সবই প্যাটার্নিস্টিক, এবং মহত্তম পশু চতুষ্পদ ঘোড়া চারটি ঘোড়া চারটি লাশ আনে। এবার তুলনের সঙ্গে লছমনের অনুচররাও হাত লাগায়। গভীর. গভীর গর্ত দরকার। জমি বর্ষার জলে ও শরতের হিমে সরস। চারটি লাশ পড়ে ঝপাঝপ। তুলনের অন্তরে গুরুভার গুরুতরো হয়।

আরো আজীব মানুষ হয়ে যায় তুলন। বি ডি. আপিস থেকে ঝগড়া করে আরো বেশি বিছন আনে। হাল-বলদের টাকা। তারপর এক মাস যেতে না যেতে কয়েকটি এলো গাছকে দেখে সান্ত্বনা পায়। অনেক সতেজ, অনেক সবুজ কয়েকটি এলো ও পুটুস গাছ ভারতের জরুরী অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব বিহারের এক অবহেলিত, অনাদৃত অঞ্চলে খেতমজদুর কাম হরিজন হত্যার নীরব দলিল হয়ে প্রত্যাহের সূর্যের প্রণাম নেয়। লছমন বেকসুর খালাস পায়। জরুরী অবস্থা। এস. ডি. ও. ডিমোটেড হন মালিক-খেতমজদুর এর শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে উস্কানি দিয়ে খেতমজদুরদের প্ররোচনা দেবার জন্য। লছমন ও অন্যান্য জোতদার-মহাজন হনুমান মিশ্রের মন্দিরে বর্বর ধুমধামে পুজো দেয়, রূপোর বিল্বপত্র একশো আটটি এবং ঘোষণা করে, যে টাকা-টাকা মজুরীতে, বিনা জলখাই, ফসল কাটবে, সেই কুত্তার বাচ্চা ও কুত্তীর বাচ্চি যেন আসে। অন্যথায় বাইরের কিষাণ আসবে। জরুরী অবস্থায় সর্বত্র হাহাকার। কংগ্রেসী মস্তান লোগ. বাইরের কিষাণ আনার ঠিকাদারী নিয়েছে। এবার খেলা আরো তুরন্ত মজার। প্রত্যেকের মজুরী থেকে উক্ত ঠিকাদারকে চার আনা দিন দিন দিতে হবে। ঠিকাদারের লোক হও বা না হও। উক্ত মস্তানরা কথা দিয়েছে, বন্দুক হাতে ওরা ফসল কাটিয়ে নেবে এবং যে ট্যাঁ-ফোঁ করবে, তার চামড়ায় পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে এ অঞ্চলে বদমায়েশি চিরতরে ঘোচাবে।

তুলন মনে গুরুভার নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এবং ধাতুয়া-লাটুয়ার মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, ছেলেদের নিয়ে পালাবে না কি? কোথায় যাবে? মাতৃভূমি দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে কোথায় তুলন গঞ্জু নিরাপদ? কোথায় বহিরাগত লছমন সিং নেই?

হোলির দিনে ও কান পেতে গানও শোনে না। কিন্তু হঠাৎ হোলির উল্লাস থেমে যায় কোনো আশ্চর্য গান শুনে। মৌয়ামাতাল ধাতুয়া টুইলা বাজিয়ে চোখ বুজে গাইছে :

'কোথা গেল করণ ?

বুলাকি কোথায় ?

কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন ?

তারা পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে।

কোথায় আসরফি হাজাম ?

তার ভাই মোহর ?

মহুবন আর পারশ কোথায় ?

কেউ তাদের খোঁজ দেয় না কেন ?

তারা পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে।

করণ লড়েছিল পঁচিশ পয়সার লড়াই

আসরফি লড়েছিল পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সার লড়াই

বুলাকি আর মোহর

দাদাদের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল।

মহুবন জানত নেশা ধরানো মৌয়া বানাতে

পারশ জানত হোলির দিনে নাচতে,

ওরা সবাই পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।'

গান শেষ হল। সবাই নিশ্চুপ। হোলির রং খাক্ হয়ে গেল, হোলির নেশা কেটে গেল। দুলন উঠে দাঁড়াল।

—কে এই গান বাঁধল ?

—বাবা, আমি।

দুলন হোহো করে কেঁদে উঠল। বলল, ভুলে যা ও গান। তুইও খোয়ে যাবি পুলিসের খাতায়।

দুলন চলে এল ওর জমিতে। নেমে গেল জমির মাঝখানে। অসম্ভব ফিস্‌ফিসে গলায় বলল, তোরা গান বনে গেলি। শুনতে পাচ্ছিস ? গান বনে গেলি। আমার ছেলে ধাতুয়ার বাঁধা গান বনে

গেলি। গান ব'নে গেলি, গান ব'নে গেলি, ধান বনলি না, বনলি না চীনা ঘাস—এখন আমার কলিজা হতে নেমে যা রে, আমি আর পারি না!

দোলপূর্ণিমার চাঁদের আলোয় এলোগাছের সতেজ পাতা ও পুটুস ফুলের গুচ্ছ হেসে লুটোপুটি খেল। এমন হাসির কথা ওরা কখনো শোনে নি। তুলনের বুকের নিচে ধাতুয়ার জন্যে অজানা ভয়। মাচানে উঠতেই ও ধাতুয়ার গানটি শুনতে পেল। এখন সবাই গাইছে। কিন্তু পুলিসের খাতায় হারিয়ে যায় নি ওরা। তুলন কোনোদিন সব কথা বলতে পারবে না। লছমন সিংয়ের থাবা।

একদিন জরুরী অবস্থার অবসান হয়।

একদিন ভারতের মুক্তিসূর্য মজা দেখতে গদি ছেড়ে নিচে নামেন ও কিছুকাল দম নিয়ে পুনর্বার গদিতে ওঠার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করেন। একদিন আবার লছমনের ফসল পাকে।

দু বছর আকাল-খরা-শস্যহানির পর এ বছর ধান ঢেলে দেয় মাটি। আদিগন্ত ধানখেতে মাচান বসে সার সার। পাখ-পাখালি রাতেদিনে পাকা ধানে এসে পড়ছে।

দু' বছর আগে যে ছিল কাংগ্রেসী এবং মাস্তান এবং খেতমজুর যোগাবার ঠিকাদার—সেই এবার নাম থেকে "কাংগ্রেসী ও মস্তান" ডক্টরেট দুটি বাদ দিয়ে খেতমজদুর যোগাবার ঠিকাদার হয়ে দেখা দেয়। তার সঙ্গে তারই মত টেরিক্লথশোভিত, কালো চশমা পরিহিত, বন্দুক-উঁচনো সঙ্গী চতুষ্টয়। অমিতাভ বাচ্চনের গলায় এই মার্সেনারি লছমনকে বলে আপনাদের দিন খতম এখন। স্ট্রাইক ভাঙা, খেতমজদুর যোগান দেওয়া ও ফসল কাটানো, সবই পেশাদারীদের হাতে চলে এসেছে। সাউথ-ইস্টার্ন বিহারে আমি মার্সেনারি সার্ভিস দিই। আপনি না চাইলেও আমিই দেব। পাঁচ হাজার টাকা। আগাম।

—পাঁচ হাজার?

—তা হলে সরকারী মজুরী দিন।

—না না।

—সরকারী মজুরী না দিয়ে নাফা করবেন আশি হাজার। পাঁচ হাজার দেবেন না?

—দেব।

—ব্যস্‌। গ্রামের নাম, মজহুরদের নাম দিন। কোই হাংগামা উঠানেবালা হ্যায়?

—না।

—ঠিক আছে। আমাকে মখ্‌খন সিং আর রামলগন সিংকেও সার্ভিস দিতে হবে। ঠিক সময়ে চলে আসব আমি। আর হাঁ ওদের মজুরী দেবেন পাঁচ সিকা। আমার বাট্টা চার আনা।

—টাকা-টাকা।

—পাঁচ সিকা। আমি, অমরনাথ মিশ্র, বেশি কথা বলি না।

—টাহাড়ের মিশ্রজীর আপনি কে লাগেন?

—ভাতিজা। আমার সার্ভিসের প্রথম ক্যাপিটাল চাচাজীই দিয়েছেন। এইভাবে সব কথা হয়ে যায়। পরে হনুমান মিশ্র লছমন সিংকে বলেন, হাঁ হাঁ, আমারই ভাতিজা। ছেলেদের সারফেস কলিয়ারি কিনে দিলাম, বললাম তোকেও দিই? না, ও নাখারা কাম ও করবে না। খুব এলেমদার ছেলে। ওর সার্ভিস ইলেকশনের ক্যাণ্ডিডেট নেয় হরতালী-কারখানার মালিক নেয়। সারফেস কলিয়ারিতে লেবার যোগায় ও। খুব এলেমদার! তিনটে বিয়ে করেছে। তিন টাউনে তিনজনকে রেখেছে। সকলকে মকান্‌ ক'রে দিয়েছে। আগেকার সরকারে ওর খুব কদর ছিল। আমার একটা ছেলেও ওর মত এলেমদার হল না।

লছমন সিং খুবই বর্বর রাজপুত। স্বরাজ্যে সঞ্জয়। কিন্তু লছমনও বোঝে, ভাড়াটে মার্সেনারি যখন নিজের সার্ভিস চাপিয়ে দেয়, তখন তাকেও মেনে নিতে হবে। না দিলে লছমন, মখ্‌খন ও রামলগনের কাছে বোকা বনবে।

ধান কাটা শুরু হয়। বাইরের মজুর নয়, নিজেরাই কাটছে ধাতুয়ারা। পাঁচ সিকা রোজের ওপর জলখাই মকাইয়ের ছাতু-লঙ্কা-

লবণ। ধাতুয়ার মা তুই ছেলের জন্তে বুনো করমচার আচার দিয়ে দেয় সঙ্গে।

তুলন মাচানে বসে থাকে। বসে থাকে কিসের প্রতীক্ষায়। ধানকাটা চলছে, চলছে। গান গেয়ে ধান কাটছে মেয়েরা, দূর থেকে ওদের গান একঘেয়ে ঘুমপাড়ানী গানের মত শোনায়। কিন্তু তুলনের ঘুম আসে না।

'কে কেড়ে নিয়েছে তুলনের ঘুম ?

ঘুম পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে।'

ধাতুয়া ও লাটুয়া ফেরা অব্দি তুলন বাড়িতে থাকে। তারপর আসে জমিতে। বৃষ্টিতে পাড়ধোয়া জল পেয়ে শরতের হিমে ভিজে সরস মাটিতে এলো গাছগুলি বন্য ও উদ্ধত। পুটুস ফুলে গাছ ফেটে পড়ছে। তুলনের চোখে ঘুম আসে না।

প্রত্যাশিত গণ্ডগোল বাধে মজুরি মেটাবার দিনে। অমরনাথ সেদিন তার বাট্টা দাবী করে। লছমন বলে, কোন খুনজখম করবে না। আমার সঙ্গে তোমার বাট্টা কেটে নেবার কথা নেই। ওদের সঙ্গে ফয়সালা কর।

—কতজনের সঙ্গে ? অমরনাথ হায়নার মত হাসে, আপনি দিয়ে দিন।

সব চেয়ে রুখে ওঠে ধাতুয়া, তুলনের ছেলে। সেজন্যই লছমন সিং বাট্টার ব্যাপারে ঢুকতে চায় না। ও অছুতকে বন্দুক তুলে জব্দ করতে জানে শুধু। এক একজনকে ও গুলি করতে চায় না। তুলন ওর কাছে প্রয়োজনীয়।

অমরনাথ বলে, কুত্তাদের সঙ্গে আমি বলব কথা ? পাঁচশো লোকের পাঁচ সিকা থেকে রোজ এক সিকে হিসাবে পনের দিনে হয় আঠার শো পঁচাত্তর টাকা। দিয়ে দিন।

—না হুজুর ! আমরা দেব না। ধাতুয়া চেঁচিয়ে ওঠে। লছমন নিশ্বাস ফেলে। আবার প্যাটার্নিস্টিক হতে হবে ওকে। আবার বন্দুক তুলতে হবে। ফয়ল যায়, আসরফি আসে, আসরফি গেল, ধাতুয়া।

—পনেরো দিনের পনেরো টাকা নিয়ে ঘরে যাব? আঠারো টাকা বারো আনা পাব না? সে কথা হয়নি? দিন তো বেশি টানিনি আমরা?

—ধাতুয়া বুঝে কথা বলিস।

টাকা দেয় অমরনাথকে লছমন সিং। তারপর বলে, কথা বলিস না ধাতুয়া। চলে যা।

করণ ছিল দাবী জানাবার লোক, আসরফি ছিল রুক্ষ। ধাতুয়া কোনদিন জানে নি ওদের মজুরি কেটে অমরনাথকে বাট্টা দেবার ব্যাপারে ও এরকম জেদের সঙ্গে দাবী জানাতে পারবে। বেরিয়ে এসে ও বলে, তোরা যা। আমি ফয়সালা করে তবে আসব।

আবার ও লছমন সিংয়ের সামনে আসে। বলে, ঐ পঁচিশ পয়সার হিসাব চুকিয়ে না দিলে আমরা কাল থেকে ধান কাটব না। ভাল খেতগুলো বাকি আছে। নিজেরা কাটব না আর কাউকে কাটতে দেব না।

—পুলিস তার বাট্টা নিতে এসেছে বলে এখন বেঁচে গেলি ধাতুয়া।

—পুলিসকে আপনি ডরান?

ধাতুয়া চলে যায় কিন্তু ওর শেষ কথাটি লছমনকে জ্বালিয়ে রেখে যায়। তবু, ধাতুয়া দুলনের ছেলে বলে এবং দুলন লছমনের অত্যন্ত গোপন করবার মতো কাজের সহায়ক বলে লছমন একটা দিন ছোট-লোকেদের সময় দেয়।

পরদিন সবাই আসে এবং কেউ কাজ করে না। লছমন ব্যর্থ ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। মার্সেনারিদের পাওয়া যাবে না। তারা মথখন সিং ও রামলগন সিংয়ের কাছে মদত দিতে গেছে। নিমেষে বাইরের লেবার মেলাও সহজ নয়। বিকেলের আলো ঢলে পড়তে লছমন তার সঙ্গীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। তরসালে কাজ হয় যদি, গোলি মৎ চালাও। পাকা ধানের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চড়ে লছমনের অনুচররা যায়। চম্বলের দস্যুদলের সিনেমা দেখে দেখে ওরাও পরে খাকি সবুজ য়ুনিফর্ম। ওরা এগিয়ে আসে। এরা উঠে দাঁড়ায় এবং অপেক্ষা করে।

—কুত্তার বাচ্চারা কুত্তীর বাচ্চিরা শোন।

—তু হো কুত্তাকে বাচ্চা!

কে চেঁচিয়ে বলে। ওরা বন্দুক তোলে। এরা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ঢুকে পড়ে খেতে। ধানের আড়ালে অদেখা হয়। কিছুক্ষণ চলে কথার মিসাইল। তারপর অনিবার্য গুলি। একাধিক। ধান খাওয়া ছেড়ে পাখির ঝাঁক আকাশে ওড়ে। খেতের ভেতর হয় কার গলায় রক্ত গার্গলের শব্দ। চেনা শব্দ

তারপর ঘোড়ার পায়ে বসে যায় বলতে থাকে ধারাল কাস্তে ও হেঁসো। ঘোড়া ছোটে সওয়ার নিয়ে। ওরা বেরিয়ে ছুটে পালায়। লাটুয়া ও পরম ছোটে তোহরির দিকে।

ভীষণ, ভীষণ কষ্টকর অপেক্ষা করে দুলন। সন্ধে পেরিয়ে গেলে রাত করে আসে লাটুয়া।

—ধাতুয়া কোথায়?

— আমি তো দেখিনি। আসেনি দাদা? আমি তো থানায় গেলাম।

—ধাতুয়া কোথায়?

—পুলিস নিয়ে এলাম আমরা। পুলিস এখানেও আসবে। সেই এস. ডি. ও. বাবা। সে আবার এসেছে। ও ভি আয়েগা।

—ধাতুয়া!

দুলনের অন্তরের অন্তরে শবদেহগুলি নড়ছে কেন? কাকে জায়গা করে দিচ্ছে? কাকে? দুলন সব বোঝে ও উঠে দাঁড়ায়।

—কোথায় যাও?

—জমিতে।

—ছেলেটা এল না, তুমি, তুমি তুমি কি পাগল না পিশাচ?

—চুপ কর হারামজাদী।

দুলন বেরোয়, ছুটতে থাকে। ধাতুয়ার গান, ধাতুয়ার গান,

'কোথায় গেল করণ?
বুলাকি কোথায়?
তারা পুলিসের খাতায় হারিয়ে গেছে।'

ভাসা-ভাসা চোখ, হাতে জরুল। তু মৎ খো যাইও ধাতুয়া, মৎ খো যাইও। এলো গাছ, পুটুস গাছ, তোমরা হেসো না আজ রাতে।

ধাতুয়া আছে, ধাতুয়া আছে।

লছমন সিং। একটি লোক। লোকটির মুখ চোখ রক্তাক্ত। লছমন তাকে মারছে। লাথি মারে। লোকটি পড়ে যায়।

ওরা দুজন, ঘোড়া তিনটে।

লছমন ওর দিকে তাকায়। কাছে আসে, বলে,

—দুলন?

—ধাতুয়া?

—আফসোস, আফসোস দুলন, মানা কী তো য়ে জানবর গোলি চালায়।

লছমন আবার লোকটাকে লাথি মারে। বলে, গোলি চালানেবালা মস্তান!

—ধাতুয়া?

—জংমনে।

—কৌন ডালা?

—ওহি জান্‌বর।

—ও?

—হ্যাঁ। কিন্তু জবান্ খুলবি না দুলন। তাহলে তোর বউ, বেটা, বেটার বউ, নাতি, কেউ থাকবে না। ঔর, ঔর টাকা নিয়ে যাবি। পুলিস ডেকেছে তোর ছেলে। পুলিসকে আমি জরুর কিনে নেব। কিন্তু জানিস, তোর ছেলে বলেই লাটুয়াকে ছেড়ে দিয়েছি। আমার বন্দুকের একটা গুলিও তো আজ খরচ করি নি। লাটুয়াকে একটা গুলিতে ফেলে দিতে পারতাম। দিই নি।

ওরা চলে যায়। সাতটি শব নিয়ে দুলন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পড়ে যায় পাড়ে। গড়িয়ে পড়ে জমিতে। বন্য ও হিংস্র এলো পাতার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে-হতে, গড়াতে-গড়াতে থামে এক সময়ে।

যথারীতি এবারকার তদন্ত শেষ হয় না। এস. ডি. ও. হস্তক্ষেপ করেন। গোলি চালানেবালা মস্তান ও অমরনাথ জেলে যায়।

ধাতুয়া আর ফেরে না।

তুলন শুধু ভাবে আর ভাবে। অবশেষে সম্পূর্ণ পাগল হওয়ার সিদ্ধান্তই নেয় ও। কেন না বৈশাখী বৃষ্টি পেতেই জমি থেকে এলো ও পুটুস নিশ্চিহ্ন করতে থাকে।

—কোথায় গেল? ভর দুপুরে? শুধোয় ওর বউ। লাটুয়ার বউ বলে, কাস্তে আর খন্তা নিয়ে জমিতে গেল শ্বশুর।

—মানা করলি না?

—আমি কথা বলি?

ছুটে যায় বউ শোকতাপ ভুলে। পাড়ে উঠে চেঁচায়, হ্যাঁ তুমি পাগল হলে? ওই জঙ্গল সাফ করতে নেমেছ?

—ঘর যা।

—ঘরে যাব কি?

— ঘর যা।

বউ কাঁদতে কাঁদতে পহানের কাছে যায়। পহান চলে আসে। বলে, . ধাতুয়া আসবে তুলন। পাগলামি করিস না ছেলের শোকে। ভাত লাগবে

তুলন বলে, ঘর যাও পহান। তোমার ছেলে নিখোঁজ হয়েছে, না আমার?

—তোর।

—এ জমি তোমার, না আমার?

—তোর।

—তবে? পাগল হলে হয়েছি, না হলে না হয়েছি। শালার জমিকে দেখছি আমি।

—লাটুয়াকে ডেকে নে তবে।

—না। আমি একা সব করব।

চাষ-কাজ করে না, কিন্তু করলে ওর হাত খুবই ভাল, তা মনে পড়ে

পহানের। পহান ঢুলনের বউকে বলে, চল, ঘরে চল। যা মনে নেয় করুক ও। তোকে তো তোহরি যেতে হবে।

ঢুলনের বউ লাটুয়ার সঙ্গে বার বার তোহরি যায় ও থানায় ধাতুয়ার খোঁজ বিষয়ে খবর নেয়।

কয়েকদিন জঙ্গল সাফ করে ঢুলন। জমি তৈরি করে। তারপর বিছন এনে বলে, এ বিছনে ভাত হবে না। জমিতে রুইব।

—ওই জমিতে!

—হ্যাঁ।

বিছন ছেটাতে ছেটাতে ঢুলন মন্ত্রের মত বলে চলে, তোমাদের এলো আর পুটুস করে রাখব না। ধান বনিয়ে দিব। ধাতুয়া ? ধান বনিয়ে দিব

চারা যখন ওঠে, সবাই দল বেঁধে দেখতে আসে। কোথায় লাগে লছমন, মখখন আর রামলগনের সারালো মাটির চারা। এ চারাগুলি যেমন সতেজ, তেমনি পুষ্ট।

—পোড়ো জমি, নতুন চারা। সবাই বলে। ঢুলন অত্যন্ত বিরক্ত হয়। সকলকে তাড়িয়ে দেয়। ও একা চষবে, একা রুইবে, একা চারার সবুজ লাবণ্য দেখবে।

পহান বলে, লছমন সিং দেখলে হিংসেয় মরে যেত।

—কে ? ঢুলন নিস্পৃহ।

—লছমন সিং।

—কোথায় সে ?

—গয়া গিয়ে বসে আছে। শশুরালে।

—ও!

তারপর ধানগাছ বড় হয়। উঁচু, সুপুষ্ট, সতেজ গাছ। ঝেঁপে ধান হয়। ধান পাকে। এবার ঢুলনের চূড়ান্ত পাগলামি প্রকাশ পায়।

ও বলে, ধান কাটব না।

—কাটবে না ? এই বর্ষা গেল, কত কষ্টে পাড় কেটে জমা জল বের করলে, রাতেদিনে ওখানে রইলে, ঘর থেকে ঘাটো আর জল বয়ে বয়ে আমি মরলাম, ধান কাটবে না?

—না। আর তোরাও কেউ জমিনে আসবি না। আমার কাজ আছে।

—কি কাজ? বসে থাকা?

—হ্যাঁ, বসে থাকা।

যে জন্যে বসে থাকা, তা হল। ফসল কাটার সময়ে লছমন ফিরল। ঢুলনের ধান চাষের কথা ওর কানে গেল। ধাতুয়ার খুনের পর এক বছর কেটেছে। আবার লছমন আত্মস্থ।

লছমন ঢুলনের কাছে এল। ঢুলন জানত, ও আসবে। ঢুলন জানত।

—ঢুলন!

—মালিক পরোয়ার?

—উঠে আয় এখানে।

—এ কি, আপনি একা?

—বাজে কথা রাখ। এ কি?

—কি?

—জমিনে ধান কেন?

—চাষ করেছি।

—কি কথা ছিল?

—আপনি বলুন।

—কুত্তার বাচ্চা, জমিনে তুমি ধান চাষ করবে সেই কথা ছিল? বনঝোপ থাকবে....

ঢুলন নিচে, লছমন ঘোড়ার পিঠে। ঢুলন লছমনের পা ধরে হঠাৎ ভীষণ জোরে টানল। পড়ে গেল লছমন। বন্দুক ছিটকে গেল। ঢুলনের হাতে বন্দুক। লছমন কিছু বোঝার আগেই ওর মাথায় বন্দুকের বাঁট পড়ল। লছমন চেঁচিয়ে উঠল। ঢুলন বন্দুকের বাঁট লছমনের কলার বোনে মারল। খটাস শব্দ।

—কুত্তার বাচ্চা, জানবর · , লছমন সভয়ে দেখল ঢুলনের সামনে ও কাঁদছে। ওর চোখে যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে জল। সে, লছমন সিং মাটিতে,

ভুলন গঞ্জু দাঁড়িয়ে? ভুলনকে পা চেপে ধরতে গেল ও, ককিয়ে উঠল। ভুলন ওর হাতে পাথর মেরেছে। লছমন বুঝল, ডান হাত ওর বহুদিনের মত অকেজো হল।

—জান্‌বর! কুত্তা!

—কি কথা ছিল মালিক? চাষ করব না। কেন করব না? তুমি লাশ পুঁতবে, আমি হব লাশের জিম্মাদার। কেন হব? নইলে তুমি গ্রাম জ্বালাবে, আমাকে নির্বংশ করবে। খুব ভাল। কিন্তু মালিক সাত-সাতটা ছেলে। শুধু বন-ঝোপ-কাঁটাগাছ হবে তাদের গোরে? তাই ধান বুনেছি, জান? সবাই বলে পাগল, আমি পাগলই হয়েছি। আজ আর তোমায় যেতে দিব না মালিক, আর ফসল কাটাতে দিব না। গুলি চালাতে, ঘর জ্বালাতে, মানুষ জ্বালাতে আর দিব না। অনেক ফসল কাটলে তুমি।

—তোকে পুলিস ছেড়ে দেবে?

—না দিলে না দিবে। তোমার লোকজন? তারাও হয়তো মারবে। মারে নি কবে মালিক? পুলিস বা কবে মারে নি? আবার মারলে এবার মরতে হলে মরব। একবার তো সবাই মরে। ধাতুয়া কি আগে মরেছিল?

এ সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় জেনে লছমনের মনে মৃত্যুভয় হল। মৃত্যুভয় হলেও রাজপুত কখনো দক্ষিণ-পূর্ব বিহারের অন্ত্যজ জাতির কাছে নত হতে পারে না। যদি পারত, তবুও অন্ত্যজ জাতি রাজপুতকে সব সময়ে প্রাণদান করতে পারে না। ভুলন পারল না।

লছমন উঠতে গেল সর্বশক্তিতে, চেঁচাতে গেল, বাঁ হাতে পাথর নিতে গেল, ভুলন বলল, কা আফসোস মালিক! গঞ্জুর হাতে মরলে!

পাথর দিয়ে ছেঁচতে থাকল ও লছমনের মাথা। ছেঁচে চলল। লছমন হত্যায় অভ্যস্ত, গুলির দাম জানে, হত্যা ওর ভেতরকে বিচলিত করে না। ও হলে এক গুলিতে ভুলনকে মারত।

ভুলন হত্যায় অভ্যস্ত নয়, পাথরের কোনো দাম নেই, এই হত্যা ওর দীর্ঘদিনের অন্তঃসংগ্রামের পরিণাম। ও পাথর ছেঁচে চলল।

এক সময়ে আর পাথর ছেঁচার দরকার থাকল না। উঠে দাঁড়াল তুলন। একে একে কাজ সারতে হবে। ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে পাছায় লাঠি মেরে ও ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। যেখানে ইচ্ছে যাক। তারপর বন্দুক সমেত লছমনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ও বহুদূর গেল। একটি খানায় ফেলল ওকে। তারপর পাথরের পর পাথর গড়াতে থাকল। পাথরের পর পাথর। ভেতর থেকে হাসি উঠে আসছে। ঘৃণা ওঁরাও-মুণ্ডা হয়ে গেলে মালিক পরোয়ার? পাথরে চাপা পড়লে? পাথরের সমাধি হল?

পাথুরে পাড়ে কাঁকরমাটিতে কোনো দাগ থাকার কথা নয়। কিন্তু পাড়ের পুটুস গাছের সপত্র ডাল ভেঙে ও ধস্তাধস্তির জায়গাটি ঝাড়ু দিল। তারপর মাচানে উঠল।

লছমনের খোঁজ কয়েকদিন ধরে চলে। যেহেতু সে কারো সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিত না, সেহেতু সে তুলনের কাছে আসার কথা কারুকেই বলেনি। না বলাই স্বাভাবিক, কেননা তুলনের ওপর ও যেজন্য নির্ভর করত, তা গোপন রাখার ব্যাপার। ওর শাগরেদদের যারা যারা জানত, তারাও চেপে গেল। মালিক পরোয়ার স্বয়ং যখন নিখোঁজ, ঘোড়া যখন দৈতারির ধানখেতে চরছিল, তখন খুঁচিয়ে ঘা করে লাভ কি? লছমনের চাকর বলল রোজকার মত দুধ-মিছরি খেয়ে ঘোড়ায় বেড়াতে গেলেন। কোথায় গেলেন, কি করে বলব?

খুবই অবাক কাণ্ড, হায়েনাদের চেঁচামেচি শুনে তবে লোকজনের টনক নড়ে। সেও পাঁচ দিন বাদে। পাঁচ দিন ধরে মাংসাশী পশুগুলি পাথরের ফাঁকে মাংসের গন্ধ পেয়ে চেঁচিয়েছে ও অশেষ চেষ্টায় কিছু পাথর সরিয়ে ওরা মুখটি শুধু খেতে পেরেছে। মৃতদেহ লুকোবার কৌশলী ধূর্তামি + ধান খেতে ঘোড়া ইত্যাদি কারণে দৈতারি সিংয়ের ওপর সন্দেহ বর্তায়। লছমনের ছেলে তাতে মদত দেয় এবং প্রাচীন দ্বন্দ্বের ইতিহাস থাকার ফলে দৈতারি কিছুদিন নাজেহাল হয়। প্রমাণাভাবে পুলিস ভঙ্গ দেয় এবং দৈতারি ও লছমন-পুত্র প্রাচীন বিবাদের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলে। কোন পর্যায়েই তুলনে সন্দেহ বর্তায় না। বর্তানো

স্বাভাবিক নয়। কোন অবস্থাতেই ঢুলন লছমনকে মারবে, তা ভাবা যায় না।

ওদিকে লছমনকে নিয়ে খোঁজ তল্লাস চলতে থাকে, এদিকে মাচান থেকে নেমে আসে এক প্রসন্ন, নতুন ঢুলন। পহানকে কি বলে সে। ফলে একদিন বিকেলে পহানের আঙিনায় কুরুন্ডার সবাই সমবেত হয়। ঢুলন বলে, কোনদিন কিছু দিই নাই হাতে তুলে কারুকে।

সকলে বিস্মিত হয়।

ঢুলন বলে, আমার ধান দেখে তোমরা সবে ভাল বললে। সেই ধান কাটলাম না, সবে বললে পাগল আমি। সে চাষ করার কালেও বলেছ। পাগলকে পাগল বলেছ। তা এই পাগলের কথাটা রাখ।

বল।

লছমনের মৃত্যুতে সবাই এক ধরনের স্বস্তি পাচ্ছে। তার ছেলে বাপের ভূমিকায় নামবে কি না, আজই ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

আমার ধান তোমাদের লেগে বিছন। এই বিছন নাও।

দিয়ে দিচ্ছ?

হ্যাঁ নাও, কেটে নাও। কেন এমন হল, সে অনেক কথা—

সার দিয়েছ?

হ্যাঁ সার, খুব দামী সার। ঢুলনের গলাটা যেন ঘুড়ি কাটা সুতোর মত হারিয়ে যায়। তারপর গলা সাফ করে ঢুলন বলে, তোমরা কাট। আমাকেও চারটি দিও। আবার রুইব, আবার।

সময় এলে ওরা খেতে নামবে, ধান কাটবে, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢুলন তার জমির দিকে ফেরে। আশ্চর্য লঘু আজ মন. আশ্চর্য! পাড়ে দাঁড়িয়ে ও ধানগুলি দেখে।

করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংস-মজ্জার সারে পুষ্ট পাকা ধানে আশ্চর্য প্রসন্নতা। বিছন হবে বলে। বিছন মানে বেঁচে থাকা। ঢুলন আস্তে আস্তে মাচানে ওঠে। মনের মধ্যে একটা সুর। অবাধ্য। ফিরে ফিরে আসছে। ধাতুয়া গানটা বেঁধেছিল। 'ধাতুয়া'—বলতে গিয়ে ঢুলনের গলা কেঁপে গেল। ধাতুয়া তোদের হম্‌ বিছন বনা দিয়া।

ধৌলী

বাসটা বিকেলে রাঁচি ছাড়ে ও রাত আটটায় টাহাড় পৌঁছয়। পারশনাথের মুদি দোকান-কাম-চায়ের দোকানের সামনে প্যাসেঞ্জাররা নেমে পড়ে ও যে যার ঘরে চলে যায়। টাহাড়ের মল বা চৌরঙ্গি এই পারশনাথের দোকান-কাম-চায়ের ঢুকান। তার পাশে পোস্ট অফিস। এখানেই চওড়া রাস্তা ও বাইরের জগৎ শেষ। বাইরের জগৎ ও টাহাড়ের যোগসূত্র রোহত্গী কোম্পানির বাস। রাঁচি-হাজারীবাগ, রাঁচি-রামগড় ও রাঁচি-পাটনা রুটে রোহাত্গী কোম্পানির খান কুড়ি বাস আপে যায়, খান কুড়ি বাস ডাউনে আসে। টাহাড় বা পালানি বা বুরুডিহার মত লজ্ঝড় গরিব জায়গার জন্যে ওদের কয়েকটি লজ্ঝড় ও গরিব বাস আছে। সোম-বুধ-শুক্রের হাটে বাসে ভিড় হয়। আদি-বাসীরা চেপে বসে। মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি ও রবিতে বাস ফাঁকা থাকে। ফাঁকা থাকলে বাসে ফায়দা ওঠে না। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় বাস চলে না, বন্ধ থাকে। বর্ষার ক' মাস টাহাড় বৃহত্তর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এবার জুনের গোড়াতেই বর্ষা নামবে মনে হচ্ছে। ধৌলী পারশ-নাথের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। দোকানের আলোতে ওর মুখ ও শরীর দেখা যাচ্ছিল না।

পারশনাথ দোকান বন্ধ করল। তারপর বলল, কি রে ঘর যাবি?

ধৌলী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

—কী কারবার! বৃদ্ধ পারশনাথ বিড়বিড় করে বলল, ও ঘুরে দোকানের পেছনে ওর আবাসগৃহে ঢুকল। ওর বউ বসে বিড়ি টানছিল। পারশনাথ বলল,

—মেয়েটা আজও দাঁড়িয়ে আছে।

—মরবে।

—'দেওতা জানলে পরে…

—মরবে।

তারপর পারশনাথের বউ বলল, মিশ্রিলাল গেছে তা কদ্দিন হল?

—চার মাস হবে।

—ধোলী বা কি ভেবেছে? দোসাদের মেয়ে, অচ্ছুত, ঘর-মকান্ করে নেবে?

—ধরম্ জানে। কিন্তু আভি ও মরেগি।

—কেন?

—য়ো কণ্ট্রাক্টর। য়ো কুলি লাইন।

—মরলে মরবে। রাতে একা যাবে · যুবতী মেয়ে · ডর লাগে না?

—লাকড়া বেরিয়েছে কাল থেকে।

নেকড়ে বেরিয়েছে সত্যিই। কিন্তু ধোলীর সে কথা মনে থাকে না। বুকের নিচে অসহ্য বেদনা। ব্যথাটা বুকের নিচে থাকে। আর তারপর নিচের দিকে নামে। ধোলী ভেবে পায় না কি করবে।

অন্ধকারেই ও ঘরে ফিরল। ডিবরির আলো। ঘরের একদিকে মাচান। ওদের খাট। মাচানের নিচে তিনটে ছাগল। মা বিছানায় শুয়েছিল। মেয়েকে দেখে কোনো কথা বলল না।

ধোলা কলসি ঠেলে দেখল, জল আছে। জল খেল। তারপর দরজা বন্ধ করে ডিবরি ফুঁ দিয়ে নেভাল। তারপর মার পাশে শুয়ে পড়ল। ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। প্রতিকারহীন, হতাশ বেদনার কান্না। মা শুনছে ও জানছে। ধোলী কেঁদে চলল। রাত বাড়ছে, মা এক সময় বলল, গাঁ হতে বের করে দেবে।

—দেবে তো দিক।

—তোর বয়স আছে। আমি কোথা যাব?

—তুই থাকবি।

—তুই যাবি?

—যাব।

—কোথায়?

—যমের দোরে।

—অত সোজা নয় রে! উনিশ বছর বয়সে যমের দোরে মানুষ যায় না।

—আমি যাব।

—শন্‌চরীর কাছে গিয়েছিলি?

—না! ধৌলী চেঁচিয়ে উঠল। বলল, ওর কাছে যাব কেন? পেটের কাঁটা মারব? কখখনো না।

—তবে কি মিশ্রদের বাড়ি যাবি? বলবি, তোমাদের ছেলে আমাকে মা বানিয়েছে, বাচ্চাকে পাল্‌পোষ করতে পয়সা দাও।

—কৈসে? কে আমার কথা মানবে?

—মানতে হবে।

—ও এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যেত।

—কি ঠিক হত? তোকে ও দেখত?

—দেখবে বলেছিল।

—বাচ্চা হবে ও জানত?

—হ্যাঁ।

—বাচ্চাকে পালপোষ করত?

—করবে বলেছিল।

—ওরা তো ওরকম বলে রে। তু তো পহেলী দুসাদ কি বেটি না হায় যিসকো ও মিশির লোক নষ্ট্ কিয়া। দুসাদ, গঞ্জু, ধোবি, গাঁও মে কিসকো ছোড়া?

—ও সে রকম নয়।

—নয়? বরাম্‌ভনের লেড়কা, গাঁও কি হালত আচ্ছা হি জান্‌তা, ও কেন তোর সঙ্গে বেইমানী করল?

—মুঝসে প্যার কিয়া।

—প্যার! তাই চার মাস ধানবাদে গিয়ে বসে আছে, ঘর আসে না?

—মা বাপসে ডরতা।

—একটা চিঠি ভেজল না?

—আমি কি পড়াই জানি ?

—তোর তো প্যার হল। এদিকে আমার ছাগলচরাই কাজ যে কেড়ে নিল ? লাকড়া লে লেই পাট্ঠু কা বাচ্চা। ওরা বলে দিল আমি চোরাই করেছি। এ কি ধরমের কথা হল ?

—আমি কি করব ?

—তোহারি বাতসে গুস্সা হোকে এহি শাস্তি দিল।

—আমাকে তাড়িয়ে দে।

—দেব। এখন ঘুমো।

—তাড়িয়ে দিবি ? "হঁা" বললি তুই ? আমি ছাড়া কে আছে তোর ?

এই নিয়ে তুজনের ঝগড়া রোজ বাধে, আজও বাধত। কিন্তু বাইরে থেকে চৌকিদারের গলা শোনা গেল, আরে ধোলী কি মা ? দিন ভোর তোহর চিল্লাই শুনব, রাতেও ? তুসাদ পট্টিতে তো আরো লোক আছে, তারা জানে দিন হল চিল্লাবার জন্যে, রাত ঘুমোবার জন্যে। তুই একা এহি সাচাই বাত জানিস না।

—যাও, যাও, চুপ করছি।

—কা ঘর মেঁ কুলি-উলি ঘুসায়া ?

—তোহর ঘর মে কুলি ঘুসত।

—রাম রাম ! ই কা বাত !

চৌকিদার চলে গেল। মা বলল, আমি জানি না টাহাড়ের হালচাল ? সবাই দেখছে বাচ্চা হলে মিশ্রিলাল তোকে দেখভাল করে কি না। করলে কেউ তোর গায়ে হাত দেবে না। নইলে তোকে ছিঁড়ে খাবে।

—তোহর গলৎ। স্বামী মরে যেতে শ্বশুরালে ফেলে রেখে দিতিস, যা হবার হত।

—তারা কি রাখল ? তুইও চলে এলি।

—ধরম রাখত না ভাশুর।

—মিশ্রিলাল রাখল।

ধৌলীর বুকে তীর বিঁধে গেল। আর কোনো কথা বলল না সে। কেঁদে কেঁদে চোখের পাতার ভেতরের পিচ্ছিলতা শুকিয়ে গেছে। পাতা দুটো টেনে নামিয়ে সে চোখ বুজল।

ঘুম আসে না। যেদিন থেকে মিশ্রিলাল চলে গেছে। চোরের মত কিছু না বলে ভোরের বাসে পালিয়ে গেছে, সেদিন থেকে ধৌলীর চোখে ঘুম নেই। ভুট্টার পোকা মারা বিষ খেলে তো চিরদিনের মত ঘুমোতে পারে ধৌলী. কিন্তু একবার সে বেইমানের মুখ না দেখে ধৌলী মরে কি করে?

বেইমান? না না। বাপ-মা অত শাসাল বলেই না সে চলে গেল টাহাড় ছেড়ে? বাপ মা কি অত আদরের দুলালকে শাসাত? মিশ্র পরিবারের কর্তা, বুরুডিহার হনুমান মিশ্র শাসালেন বলে না বাপ-মা ভয় খেয়ে গেল? নইলে মিশ্রিলাল কি ধৌলীকে ছেড়ে যেত? কত কেঁদেছিল যেতে হবে বলে. ভাবলে বুক ফেটে যায়, এখনো ফেটে যাচ্ছে।

মা বলে, শনিচরীর কাছ থেকে ওষুধ আন্। পেটের কাঁটা দূর কর।

কেমন করে? এ কি মিশ্রিলালের দাদা কুন্দন আর গঞ্জু বউ ঝালোর সন্তান? লোভ আর দুর্বার মদমত্ততার ফলে যাদের জন্ম?

বরামভন, দেওতা, ধৌলী বাগিচা ঝাড়ু দিতে দিতে কখনো চোখ তুলে দেখে নি। দুপুরে বনে ছাগল চরিয়ে ঝর্ণায় স্নান করছিল ধৌলী, তখনি মিশ্রিলাল ওর গায়ে গাছের পাতাসুদ্ধ ডাল ছুঁড়ে মারে। মিশ্রিলাল হাসে নি, ইতরতা করে নি, বলেছিল, তোর তরে আমি পাগল হয়ে গেলাম। তুই আমার দিকে একবার তাকাস না কেন?

—দেওতা! অ্যায়সা বাত্ ন করো।

—কিসের দেওতা? আমি তোর বান্দা।

—ন বোলো ন বোলো দেওতা!—ভয়ে কেঁপে ধৌলী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

—আজ না শুনলি, একদিন শুনতেই হবে।

ভাবলে পরেও মনের মধ্যে বনের বাতাস বয়ে যায়, পাতার ঝরঝর,

সরসর শব্দ শোনা যায়, ঝর্ণার জলের শব্দ। মিশ্রিলাল চলে গিয়েছিল। বুকের নিচে কি ভয়, কি ভয়! মিশ্রিলালের ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল। সুকুমার সুন্দর মুখ। দেখলে বলে দিতে হয় না দেওতা। ধোলী কি? দুসাদের মেয়ে। বিধবা। জন্মদুঃখী। সংসারে না বাপ, না ভাই, তাতেই কুন্দন মাকে আর জমি চষতে দেয়নি। মা বলেছিল, সরকার। খাজনা আমি দেব। আর আউর দুসাদ লোক জমি চষে দেবে। যো লিজিয়ে, লিজিয়ে গা, জমি দাও। নয় তো ভুখ মরেংগে।

—নায় নায়।

কুন্দনের মা'র সামনে গিয়ে তখন ধোলীর মা মাটিতে শুয়ে পড়ে। দয়া করো মাতাজী! নয় তো মেয়েকে নিয়ে না খেয়ে মরব।

মা ছেলেকে বলে, ওর বর যদ্দিন বেঁচে ছিল, জমি চষেছে, বেগর বেগারী দিয়েছে, এখন রাণ্ডী হয়েছে বলে না খেয়ে মরবে?

—কি করব বল? ও জমি আমি ঝুমন দুসাদকে দিয়ে দিলাম।

—তবে ওরা ছাগল চরাই করবে। বাগিচা ঝাড়ু দেবে, পয়সা দিবি, মাড়োয়া দিবি।

—তুমি যা বল।

দিনান্তের মাড়োয়ার ঘাটোর জন্যে যাদের চরণ ভরসা, তাদের ছেলে ধোলীকে এসব কথা বলে গেল কেন? ধোলী তো জানে তার ভীরু চোখ, পাতলা কোমর, ফুটন্ত পদ্মের মত বুক, সবই তার শত্রু। মোটা, হেটো কাপড়ে গা-মাথা ঢেকে তবে সে বাগিচা ঝাড়ু দিয়ে যায়। কোনোদিন চোখ তুলে দেখে না বাগিচায় কত ফল। পাখি ও বাদুড়ে খেয়ে যে আমরুদ ও সরিফা ফেলে যায়, তাই কুড়িয়ে নিয়ে আসে। তাও কুন্দনের মায়ের অনুমতি নিয়ে।

ঘরে এসে ধোলী পেতলের থালা সোনার মত করে মেজে নিয়েছিল। তাতে মুখ দেখেছিল। মাকে লুকিয়ে। বিধবা, রাণ্ডী হলে, তাকে আর আয়নায় মুখ দেখতে নেই। মুখ দেখতে নেই। গালার চুড়ি পরতে নেই। পরতে নেই মেটে সিঁদুরের টিপ, দস্তার পায়লী। মুখখানা সুন্দর। রাণ্ডীর সুন্দর মুখ দিয়ে কি হবে? আর তো বিয়ে হবে না?

কারো বিয়ে হলে তাকে তো মেয়েরা 'শ্বশুরাল্ চলে সীতা মাইয়া' গাইতে ডাকবে না, বিয়েবাড়ির দেওয়ালে রঙ্গোলি দিয়ে ফুল-লতা-পাখি আঁকতে ডাকবে না। কিন্তু দেওতা-বাড়ির ছোট ছেলে বলল, ওর বান্দা হয়ে থাকবে? বুকের নিচে ভয়, অস্বস্তি।

ধৌলী মাকে বলেছিল, মা। তুই বাগিচা ঝাড়ু দিবি আমি ছাগল চরাব।

—কেন?

—মা! ঝাড়ু দিলেও পাতা-উতা উড়ে, আমি পারি না বাতাসের সঙ্গে ছুটতে।

—কেউ কিছু বলেছে?

—কে কি বলবে?

—ছাগল নিয়ে জঙ্গলের বেশি ভিতরে যাস না ধৌলী। লাকড়া কি গুলবাঘা আছে।

—নায় মৈয়া! হমনি কি খাল নায়?

ছাগল চরাতে চরাতে কতদিনের কত কথা মনে পড়ত। ছোটবেলা বাবার কাঁধে চেপে মেলা দেখতে যাওয়া। দোকানপাট, লক্ষ টাকার সওদা দেখে এক পয়সার তিলুয়া কিনে ঘরে ফেরা। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার আগে শ্বশুরবাড়ি বলতে সেই দুখানা জরাজীর্ণ ঘর, মহাজনের খামারে কাজ, দিনান্তে শাশুড়ি মকাই সেদ্ধ করত। পুরুষরা খেলে ওরা বসত খেতে।

বিয়ের কথা মনে পড়ে না ধৌলীর। তখন ও খুবই ছোট ছিল। শরীরে ফুল ফুটতে 'গওনা' হল। ওরই বিয়ে ও গওনা'য় বাবা মিশ্রদের কাছে ধার করে। সে ধার শুধতে বেগর-বেগারী দিতে দিতে বাবা মরে গেল।

বরটা ভাল ছিল না। ধৌলীকে মারত। বর মরে যায় জ্বরে। শাশুড়ি বলেছিল, মায়ের কাছেও খাটবি, খাবি। আমার কাছেও তাই।

ধৌলীও জানত, জীবন এইরকমই হয়। হেটো, মোটা, কালো পাড়ছাড়া কাপড় পরে মহাজনের খামারে বা জোতদারের খেতে

বা রাস্তা পেটাই কাজে উদয়াস্ত খাটা-খাটুনি। দিনান্তে যা জোটে তাই খেয়ে শাশুড়ির পাশে গড়িয়ে পড়া। কিন্তু ভাশুর এসে পড়ল ভালাতোড় থেকে। ওর ওপর নজর দিল। তখন শাশুড়ি প্রমাদ গনল। চলে এল ধৌলী। বড় একটা দুঃখ রয়ে গেল মনে। চলে এল বলে নৌটংকি দেখা হল না। গ্রামে নৌটংকির দল আসত। মহাজন বায়না করেছিল।

টাহাড়ে এসে ও অন্য কোনো দুসাদ ছেলেকেও আমল দেয় নি। সেই তো দারিদ্র্য আর অনাহার। সেই তো হাড়ভাঙা খাটুনি। তারপর কোলে-কাঁখে বালবাচ্চা। না, তেমন জীবন ধৌলী চায়নি।

বনে ছাগল চরাতে চরাতে কত কথা ভাবত ধৌলী। তারপর আঁচল পেতে আধশোয়া হয়ে জিরোত। লাকড়া বা গুলবাঘার ভয় ধৌলী করে নি। মানুষ যদি জানোয়ারকে ডরায়, জানোয়ার ভি মানুষকে। বনে অনেক শান্তি। মিশ্রিলালের অপ্রত্যাশিত কথাগুলির ফলে মনে যে অশান্তি হয়, তা চলে যাচ্ছিল। খুব শান্তি।

কিন্তু ঝুঝারে মেলা বসেছিল। মেলা থেকে ফিরতে ধৌলী দলছুট হয়ে পড়ে। ভয়ে হন হন করে হেঁটে ও গ্রামে ফিরছিল। মেয়ে ধরে ব্যবসা করে যারা, তারা এ রকম গেঁয়ো মেলাতেও আসে। মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়।

সেখানেই মিশ্রিলাল ওর নাগাল ধরে ফেলে। বলে, তুই শুনতে পাস নি?

—কি শুনব?

—তোকে ডাকছিলাম।

—কেন?

—কেন, তা জানিস না?

—নায়। দেওতা। এইসান্ বাত ন বোলো। হম দুসাদী, তুম্ দেওতা।

—তোকে আমি ভালবাসি।

—নায় দেওতা। ইকরাকে প্যার ন'য় বোলো। তুম্ বরাম্ভন। জওয়ান ভি হো। সাদী হোয়ে, তুল্হন আয়ে···

—তোকে আমি···তুসাদী, তু প্যার ন সমঝৎ ?

—নায় দেওতা। দেওতাসে গঞ্জু-তুসাদ কো ঔলদ হোতা, য়ো তো হোতাহি হ্যায়। লেকিন······

—আমি যে তোকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না ?

—এইসান্ গরিব কো সাথ্ য়ে খেলা মৎ খেলো সরকার।

—খেলা ?

—হাঁ দেওতা। তুম্ খেল্ খেলৎ ভাগ যৈবে, হামানি কে কায় হোগা ? ঝালো কো কা হালৎ ? শন্চরী কো ? নায় সরকার।

—যদি যেতে না দিই তোকে ?

—হ্মানি কো কায় ? য়ো তো মানৈ লেগা। দেওতা লোগ্ কো খায়েশসে জো মাঙেগা ওহি হোগা। আও, লে লৈ হ্মানিকো, ধরম্ নাশ করো।

—না, না ধৌলী না! তু হমে মাফি কর দে, মাফি!

ছুটে চলে গিয়েছিল মিশ্রিলাল। ধৌলী খুবই অবাক হয়। তারপর ফিরে আসে।

তারপর যেদিন ও শোনে, মিশ্রলাল খুব অসুস্থ, যেন দেওয়ানা, ওর মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ওকে মিশ্রিলাল যে কোনো মুহূর্তে পেতে পারে, মিশ্ররা করেই থাকে, তাতে ধৌলীর কিছুই করার নেই। কিন্তু এ কি আচরণ ?

ও নিজেও খুব বিবশ হয়ে পড়ে। তারপর কুয়োতলায় ওকে মেয়েরা চেপে ধরে।

—রাণ্ডী, তোহর কপাল খুলে গেল।

—রাণ্ডীর কপাল কখনো খোলে ?

—দেওতার ছোটছেলে তোর তরে পাগল।

—মিছে কথা।

সবাই জানে।

—ঝুট নায় বোলো।

—ঝুট কাঁয় ? সবে হি মালুম পড়ে।

—নায় নায়।

বিচলিত ধৌলী জল নিয়ে চলে আসে ও ছাগল নিয়ে বনে চলে যায়। এখন তার কি হবে ?

গ্রামে নাম উঠে গেল। কে তাকে ছেড়ে কথা বলবে ? দেওতার এ মতিভ্রম কেন হল ?

ভয়ে সে মিশ্রবাড়ির ধারেকাছেও যায় না। মা'র কাছে শোনে, অসুখ চলছে। ডাক্তার এসেছে ভালাতোড় থেকে। সে বুঝে পায় না, কুয়োতলায় মেয়েরা যা জানে, মা তা জানে কি না। একদিন সে বলে চল্ মা, ভালাতোড় চলে যাই। সেখানে কুলির কাজ করব ?

—পাগল ?

একদিন শোনে মিশ্রিলাল ভাল হয়ে গেছে। ওর বিয়ে হবে। সুন্দর মেয়ের খোঁজ চলছে। বড় দাদা কুন্দনের বউয়ের বেলা রূপের খোঁজ করা হয় নি। এবার না কি রূপের খোঁজ চলছে।

খুব নিশ্চন্ত হয় ও। আবার বুকে ব্যথার বোধও থাকে। একই সঙ্গে বিজয়োল্লাস। সে, ধৌলী, এক দুসাদ মেয়ে, দেওতার ছেলেকে পাগল করে দিয়েছিল।

খুবই নিশ্চিন্ত মনে ও বনে চলে যায় ও ঝর্ণায় নেমে স্নান করে। পাথরে কাপড়টি মেলে দিয়ে আবা শুকোয়, তারপর পরে নেয়। কাপড়টি ফেটে গেছে। এবার মা টাকা পেলে ধৌলী আরেকটা কাপড় কিনবে। আধভেজা কাপড় ও ভিজে জামায় ওকে দেখলে মা মারতে উঠবে। বলবে, তুই কি বিধবা না শহর বাজারের রাণ্ডী ? গা দেখাচ্ছিস ?

সেখানেই মিশ্রিলাল এসে দাঁড়ায় ও বলে, আমি সাদী চাই না ধৌলা তোকে চাই ?

দুপুরবেলা গ্রামের সংলগ্ন বনভূমি বড় আদিম, বড় এলায়িত। মন ও শরীর ধৌলীর, একেবারে অরক্ষিত ছিল। মিশ্রিলালের চোখে ছিল

অসহায় ভিক্ষা, গলায় ছিল বেদনা ও হতাশা। ধৌলী বাধা দিতে পারে নি।

তারপর থেকে দু মাস কেটেছিল আশ্চর্য একটা স্বপ্নের ঘোরে। বন ছিল তাদের মিলবার জায়গা, দুপুর ছিল দেখা করার সময়। বিচারবুদ্ধি ভেসে গিয়েছিল দুজনের। উনিশ ও তেইশ। প্রতিদিন ধৌলী ভয়ে কাঁদত, কি হবে?

—কিসের কি হবে?

—তোমার বিয়ে হবে।

—তোর সঙ্গে।

—ন বোলো দেওতা।

—আমি জাত-পাঁত, ছুয়াছুং মানি না। ঔর, টাহাড় দুনিয়ায় এক জায়গা নয়। ঔর, সরকারী আইনে ভি আমাদের বিয়ে মঞ্জুরী।

—ন বোলো সরকার। তুম্ লড়কপন্ হো। দেওতা, হনুমানজী কা বোলেগা? হম্‌কো গাঁওসে নিকাল দেগা।

—অত সোজা নয়। সরকারী কানুন আছে।

—হমনিকে লিয়ে নায়।

—তুই জানিস না।

বনভূমির নির্জন গোপনে দুঃসাহসিক কথা বলত মিশ্রিলাল এবং সে কথাগুলি বনভূমি-সংশ্লিষ্ট রূপকথাগুলির সঙ্গে মিলেমিশে অলীক হয়ে যেত।

এমনি করে দিন গেলে চলত। কিন্তু চলল না। ধৌলী জানল, সে মা হতে চলেছে।

আশ্চর্য, মিশ্রিলাল খুব আনন্দিতই হয়েছিল। আমিও লেখাপড়া জানি না, তুইও জানিস না। আমার এত বাগ-বাগিচা, খেতি-জমিতে দরকার নেই। চলে যাব ডালাতোড় হয়ে ধানবাদ, তারপর পাটনা। দোকান করব, দিন চালাব।

কিন্তু হনুমান মিশ্র যেদিন টাহাড় চলে এলেন, তাঁর সামনে মিশ্রিলাল এত কথার একটাও বলতে পারে নি।

কুন্দন বলেছিল, মা-বেটিকে কেটে ফেলে লাশ গুম করে দেব।

—না।

হনুমান মিশ্র বলেছিলেন, ঘরের জঞ্জাল সাফা কর। বাহারের জঞ্জাল চলে যাবে।

—জানে মারব।

—মূর্খ।

—মা হারামজাদী শোর তুলে দিল, লাক্‌ড়া পাট্‌ঠি নিয়ে গেছে। ওর ঘরে তিনটে ছাগল কোত্থেকে এল? দুটো ছিল না?

মিশ্রজী বেজায় রেগে বললেন, উল্লু কা পাট্‌ঠে! তোর বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি, তোর সঙ্গে কথ বলতে পারি না।

—মাপ করুন।

—য়ো দোনোঁ কো জানসেঁ মৎ মারো, হোটিসে মারো। কাম ছুটাও। ঔর তোমার ভাই যে কীর্তি করেছে, তাতে সকলের মুখ হেসেছে। মান বাচুক আগে। একটা ছাগল থাকল, কি গেল তাতে কি? তুই তো একটা বড় ছাগল রে। দেখ, ভাইকে আগে সরা।

মিশ্রিলাল বলল, আমি যাব না।

—জীন্দা না যাও, তো তোমার মুর্দা গ্রামছাড়া করব। তোমার মত ছেলে বংশের কলঙ্ক।

মিশ্রিলাল পরে মাকে বলল, মরিয়া হয়েই বলল, মা! ধোলীর পেটে আমার ছেলে।

—তাতে কি? দুসাদ-গঞ্জু মেয়ের পেটে এ বংশের মরদদের ছেলে আগেও হয়েছে। বয়সের গরম তোর। ঝালোর ঘরে কুন্দনের তিনটে ছেলে আছে না?

—ও কি করবে?

—পাপ করেছে, শাস্তি পাবে। না খেয়ে মরবে, মা মরবে, মেয়েও।

—ধোলীর কি দোষ মা?

—দোষ সব ঔরতেরই হয়। ব্রাহ্মণ দেওতার ঘর নষ্ট করেছে, আরো দোষে দোষী ও।

—মা! তুমি তো আমাকে ভালবাস।

—তুই আমার কোলের ছেলে রে?

—আমাকে ছোঁও।

—কেন?

—ছোঁও।

—ছুঁলাম।

—তোমাদের কথা আমি রাখব, চলে যাব, কিন্তু তুমি কথা দাও, ও ভুখা না-মরে, তা দেখবে।

—কথা…দিলাম।

—ঔর, ওকে কেউ যেন তান্ন না করে।

—দেখব।

—কথা না রাখলে মা, আমাকে তুমি জানো, দেওতার সামনে কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমার জিদ্দি খুব। তুমি কথা না রাখলে আমি না ফিরব গ্রামে, না করব সাদী।

—না না, ও কথা বলিস না। আমি ও…দুসাদিনকে · খেতে দেব ·· ঔর দেখ্‌ভাল ভি করব!

ধৌলী সবই জানছিল। ও প্রতিবাদ জানাবার কথা ভুলেও ভাবে নি। দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষই ধৌলীর। এতে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার থাকায় ধৌলী স্ব-সমাজের কাছেও ব্রাত্য। স্ব-সমাজের ছেলেদের সে আমল দেয় নি। না দিক। মিশ্রিলাল ওকে জোর খাটিয়ে নষ্ট করলে দুসাদরা ওকে ফেলত না। মিশ্রবাড়ির ছেলেদের জারজ সন্তান দুসাদ-গঞ্জু-ধোবি টোলিতে অনেক থাকে। এক্ষেত্রে ধৌলী স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে। অমার্জনীয় অপরাধ। দুসাদ-গঞ্জু ছেলেরা, ঠিকাদারের কুলীরা দেখছিল, ব্যাপারটি কোথায় যায়। কোনো সময়ে মিশ্ররা জারজ সন্তান-দের জননীদের কাজ বা মাড়োয়া বা পয়সা দিয়ে আরক্ষা দেয়। উক্ত পর্যায়ের জননীদের ও তাদের অবৈধ সন্তানদের গ্রামসমাজও খাতির করে। কেননা অন্যথায় মিশ্ররা চটবে। আর মিশ্ররা চটলে

কারো রক্ষা থাকে না। সবাই ভাবছিল ধৌলীকে মিশ্ররা আরক্ষা দিলে তারাও চেপে যাবে। নইলে বিধবা, রাণ্ডী ধৌলীকে বেশ্যা বানিয়ে ছাড়বে।

ধৌলী সবই বুঝছিল ও জানছিল। ভয়ে, দুঃখে ও বিবশ হয়ে যায়। সহসা বনভূমি মনোরমণীয়তা হারায়, গাছগুলিকে মনে হয় প্রেতপ্রহরী, পাথরগুলোও যেন তাকে লক্ষ করে। ঝর্ণার ধারে প্রতীক্ষা যায় বৃথা। মিশ্রিলাল আসে না।

মিশ্রিলাল আসে। ধৌলীকে প্রতীক্ষা করে অবসন্ন ও নিঃশেষ করে মিশ্রিলাল আসে। ধৌলী তার মুখ দেখেই নিজের মৃত্যুদণ্ড শুনতে পায়। মিশ্রিলালের বুকে মুখ রেখে সে অঝোরে কাঁদে। মিশ্রিলাল ওর মাথার চুলে মুখ গুঁজে নিজেও কাঁদে। সাবানের গন্ধ। মিশ্রিলালই ওকে সাবান এনে দিত, গন্ধতেল। ছুটো কাপড়ও এনে দিয়েছিল। ছাপা কাপড়, তাই ধৌলী পরে নি। খুবই নিঃস্বতার অনুভূতি মিশ্রিলালের ভীরু হৃদয়ে। ধৌলী, ধৌলী, তুই কেন দুসাদিন হলি?

—ন বোলো দেওতা। ঔর ন ধৌলী বোল, মোরি সহন ন জায়।

—শোন্! এখন কি কাঁদলে চলবে?

—জীউ ভর্ রোনা রহ গেলৈ।

—এখন তো আমাকে যেতেই হচ্ছে, ঔর এরা যা বলছে, সব মেনে নিয়ে যাচ্ছি।

—কেন এত ভালবাসার কথা বলতে?

—এখনো বলছি।

—কাঁয় সরকার? তুমহারি ধৌলী অব মুর্দা বনি। মুর্দা কে পর হাঁস্ ন উঠ সরকার।

—শোন্ পাগলী।

জোর করে ওকে পাথরে বসায় মিশ্রিলাল। দু হাতে ওর মুখ তুলে ধরে ও বলে, একমাস চুপ করে থাকব। সাদীর জন্যে জোর করলে মানব না, এ বলে দিয়েছি, ওরাও মেনে নিয়েছে।

—পরে ভুলে যাবে।

—না না শোন্‌, আমি একমাস হতেই ফিরে আসব। একমাসের মধ্যে কোথায় যাব, ক করব, ঠিক করে নেব। আমি লিখাইপড়াই নই। ভাল নোকরী চাই না। বড় ভাইও নই, যে খেতি ওর বাগান চাইব। কোথাও চলে যাব, দোকান দেব। ব্যবস্থা করতে তো হবে ?

—আমি কি করব ?

—এখানে থাকবি।

—কি খাব ? মাকে চোর বদনামী দিয়ে তোমার দাদা তাড়িয়ে দিল।

মা আমাকে ছুঁয়ে কথা দিয়েছে তোকে খেতে দেবে, দেখ্‌ভাল্‌ করবে। আর ··

ধৌলীর পেটকাপড়ের খুঁটে মিশ্রিলাল পাঁচটা দশ টাকার নোট বেঁধে দিল। বলল, এক মাস ধৌলী তুই মন ঠিক রাখিস।

মিশ্রিলাল চলে যায়। ধৌলীকে আদর করে, ভরসা দিয়ে। ধৌলী আরো কিছুক্ষণ বাদে ফেরে ঘরে। মা মেয়েতে কথা হয় ও টাকা কয়টি ওরা একটি কৌটোয় ভরে মাটিতে পুঁতে রাখে।

মিশ্রিলাল চলে যায়। দু দিন বাদে ধৌলীর মা, মিশ্রগিন্নীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। একটিও কথা না বলে তিনি ওর আঁচলে কিলো খানেক মাড়োয়া ঢেলে দেন ছোঁয়া বাঁচিয়ে। বলেন, তিন দিন বাদে ফের আসিস।

তিন দিন বাদে মাড়োয়া কমে আধ কিলো হয় ও সময়-বিরতি তিন দিন হয়। তারপর ও যেদিন আসে, মিশ্রগিন্নী অন্ধকার মুখে বলেন তুই সেদিন এলি, তারপরই আমার দুধের লোটা পাচ্ছি না।

—নায় মৈয়া। হম্‌ তো···

না না, ছেলে বলেছে, বড় ছেলে, তোকে বাড়ি ঢুকতে না দিতে। দোরের বাইরে দাঁড়াবি, ওর ডাকবি।

ধৌলীর মা উক্ত কথা, বরাস্তন মৈয়ার কথা মেনে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু দোরের বাইরে থেকে যেদিন ডাকে, সেদিন শোনে, মৈয়া চলে গেছেন বুরুডিহা। হনুমান মিশ্রর বাড়ি। ধৌলীর মা মনে মনে

জ্বলতে-জ্বলতে ঘরে ফেরে ও বাড়ি ফিরে ধৌলীকে প্রথমে নির্দয়ভাবে মারে। ধৌলী মুখ বুজে মার খায়। তারপর মা মার থামালে, দা এনে দেয়। বলে, এবার এটা দিয়ে মার। হাতে ব্যথা হবে। আর এটা দিয়ে মারলে আর মারতেও হবে না। শান দেওয়া আছে।

মা ও মেয়ে এখন গলা ধরাধরি করে কাঁদে। তারপর মা বলে ভাল কথা বলি শোন্। শনচরীর কাছ থেকে ওষুধ নে।

—কেন ?

—পেটের কাঁটা দূর কর।

—না মা।

—ও আসবে না রে। লড়কপন ছেলে, ভাল বুঝে ভাল কথা বলেছে, কিন্তু কথা ও রাখতে পারবে না। কথখোন নয়।

—তাহলে আমি বিষ খাব।

—খাবি ?

—খাব।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, ও ঠিকাদার, ও জঙ্গল ঠিকাদার, ওর কাছে যাই। আমাকে তো রেঁধে দিতে বলেছিল।

—আমি যাব ?

—না না আমার বয়স গেছে, আমিই যাব। টাকা দিক না দিক খেতে দেবে। ওর খানা ঘরে নিয়ে আসব।

—তুই যা।

—তুই ছাগলগুলো চরাস্।

সেই ব্যবস্থাই বহাল থাকে। ধৌলীর মা রাঁধার কাজ পায় না, কিন্তু রাঁধার জোগাড় দেয়। যে দিন যে ভাত রুটি পায়, ঘরে আনে। স্ব-সমাজের লোকরা মা ও মেয়ের ওপর নজর রাখে। নজর রাখে ঠিকাদারের কুলিরাও। গাছকাটা কাজ। নগদ পয়সা। কুন্দনের ভাইয়ের রাখ্ওয়ালী বলে যা অসুবিধে। শেষ অবধি কি হয় তাতে তারাও আগ্রহী থাকে। কাঠ কাটার ও চেরাইয়ের কাজ বহুদিন

চলবে। অপেক্ষা করতে কোনো অসুবিধে নেই। বরঞ্চ উত্তেজনা আছে। ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে কেলেংকারি হয়েছে বলে ধোলীর আকর্ষণ মনে বেড়ে গেছে।

এক মাস—দু মাস করে চার মাস গেছে। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসে ধোলী অভ্যাসবশেই। আজ, মাচানে শুয়ে-শুয়ে ধোলী সব কথা আবার মনে মনে ভাবল। স—ব কথা। তারপর চোখ বুজল। পেটে হাত রাখল। পেটের মধ্যে বাচ্চা নড়ছে। খুবই অদ্ভুত সেন্‌সেশন। মিশ্রিলাল বলেছিল, ছেলে হলে নাম দেবে মুরারি। কিন্তু, মিশ্রিলাল, তার আদর, সব যেন রূপকথার মত অলীক হয়ে যাচ্ছে।

॥ দুই ॥

আশ্বিনের শেষে ধোলীর ছেলে হল। শ'নিচরীই প্রসব করাল। নাড়ী কাটল। বলল, ধোলীর ছেলে, তাই এত ফর্সা হয়েছে।

ধোলীর মার সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল শ'নিচরীর। ওষুধ দিয়ে ধোলীর মা হবার ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে হবে। ওষুধ দিল শ'নিচরী। ধোলীকে বলল, খেতে খুব খারাপ, কিন্তু শরীর ঠিক হবে।

ধোলীর মা বলল, মরে তো যাবে না?

—না না। কুন্দন মিশ্রের বউকে দিই নি? সে কি মরে গেছে?

—শরীর জখম হবে না?

—না।

—না হলেই ভাল।

—এখন কি করবি?

— ভগবান যা করেন।

—মিশ্রিলালের তো সাদী হচ্ছে।

চুপ, চুপ, ধোলী শুনতে পাবে।

—তারপর?

—যা নসীবে আছে, তাই হবে।

—তোর দোরে ঢিল পড়বে।

—জানি।

—মিশ্রিলালকে সাদী করিয়ে ওরা ধানবাদেই রাখবে। দোকান করে দিল সাইকেলের।

—ধোলীকে বলেছিলাম।

—আমি তো তোকে বলেছি, ধোলীর দেখ ভাল দেওতারা না করলে আমি জঙ্গলের ওভারসিয়ার বাবুকে ভেটিয়ে দেব।

—এখন ও সব কথা থাক।

শনিচরী গ্রামের মন্থরা ও ওষুধ-বিষুধ জানে বলে, মিশ্ররাও ওকে ঘাঁটায় নি। ধোলীকে দেখে শনিচরীর মনের কোথাও লাগল এবং ও স্ব-স্বভাবমতে ধোলীর সপক্ষে জনমত গড়তে চেষ্টা করল।

মিশ্রগিন্নিকে বাতের ব্যথায় তেলপড়া দিতে গিয়ে বলল, ধোলীর ছেলে হয়েছে।

—হোক্ গে।

—তোমার বেটার মুখ বসানো।

—কে বলে? ঝুট।

—এইসান ন বোল মৈয়া। তোমার ছেলের সঙ্গে ধোলীর ভাব-ভালবাসার কথা সবাই জানে। তোমাদের কত বেটা-বেটি আমাদের ঘরে হয়, কবে কখন হনুমানজী ফয়সলা করতে আসেন?

—বললি যখন, তখন বলি···

—কি?

—ওদের সরিয়ে দিতে পারিস?

—কোথায়?

—যেথা হোক। মিশ্রিলালের যেখানে সাদী হচ্ছে, সে মেয়েও বড়, ঘরও নামী এ সব জানলে তারা রেগে যাবে।

—টাকা দাও, চলে যাবে।

—কত টাকা?

—হাজার টাকা দাও।

—দেখি, বড় ছেলেকে বলি।

—তোমরা দেখলে না, খেতেও দিলে না, এতেও তোমাদের নাম উঠে গেল। কোন্‌দিন গঞ্জুর ঘরে তোমার বড়ছেলে আর স্বামী গোলমাল করেনি? খেতে দিয়েছ সব সময়ে। এবার কি হল যে তুমি ভগবতী হয়ে মুখ ফেরালে?

—ধৌলীর মা লোটা চুরি করল…

—ন বোলো মৈয়া।

—কি করি তাই বল?

শনিচরী তাঁর বৃদ্ধ ও ধোবানীগামী স্বামীকে হাতে রাখতে ওষুধ দেয় বলে তার মুখ থেকে এত কথা সইলেন মিশ্রগিন্নি।

—কিছু তো কর।

—বড় ছেলেকে বলি।

বড় ছেলে, কুন্দন বলল, ও ছেঁড়া কথা ছাড় দেখি? আজ ছেলে হয়েছে, কাল ঘরে খদ্দের ঢোকাবে খচড়াই ঔরত— আমি ব্যবস্থা করছি, সাদী হলেও মিশ্রিলাল এখন আসবে না।

মিশ্রিগিন্নি খুবই নিশ্চিন্ত হলেন ও ধৌলী-প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন।

কিন্তু হনুমানজী বললেন, ও হবে না। সাদী হবে, ঘরে বহু আসবে, তারপর জোড়ে ধানবাদ ফিরবে। কেন আসবে না গ্রামে? ও হুসাদিনের ভয়ে? কা করেগি য়ো?

ধৌলী সবই জানল। জেনে ছেলেকে নিয়ে ঘরে ভাবতে বসল। মা'র কাজ যায় যায় অবস্থা। ছেলেকে নিয়ে সে মায়ের ঘাড়ে। ছাগল-গুলো নয় একে একে বেচল। তাতে কি পেট চলবে? কতদিন চলবে? তারপর? তারপর?

মিশ্রিলাল নামটি ভাবতেই ওর মনের ভেতর অসাড় হয়ে যায়। অত ভালবাসা, অত কথা সবই কি ছিল প্রতারণা? না না, তা হতে পারে না। জঙ্গল ও ঝর্ণা নিয়ে কত কিংবদন্তী থাকে, কত কথা। ওই ঝর্ণায় পরী নামত জ্যোৎস্না রাতে, আর পরী দেখে দুর্ধর্ষ দারোগা

মুখ্খন সিং পাগল হয়ে গিয়েছিল। অলীক, অলীক, অসম্ভব মনে হয় সে কাহিনী। গঞ্জু মেয়ে ঝুলনি তার দেওরের প্রেমে পড়ে, আর পঞ্চায়েতের তাড়নায় দুজনে ওই জঙ্গলে গিয়ে কল্‌কে ফুলের বীজ খেয়ে আত্মহত্যা করে। ধৌলীর চেনা দুজনেই, তবু মনে হয় কাহিনীটি অলীক কি কিংবদন্তী। ওই জঙ্গলে. ওই ঝর্ণার পারে কবে, কোন্ অতীতে এক দুসাদিন্‌কে এক ব্রাহ্মণ দেওতা যুবক বলত, তু মেরা কোইলী। মেরি কালাপন্ দুল্‌হনিয়া? কবে ঝরে পড়া লালফুলের বিছানায় দুজনে দুজনের শরীরে লীন হয়ে যেত? দুসাদিনের পায়ে কাঁটা ফুটলে কবে এক দেওতা সে পায়ের কাঁটা বের করে দিয়ে পায়ে চুমো খেয়েছিল? কোনদিন ঘটেনি এ সব। সবই এখন বিশ্বাস-অযোগ্য কিংবদন্তী। শুধু কোলের এই ঘুমন্ত ছেলেটা সত্যি।

মিশ্রিলাল কথা দিয়েও রাখতে পারে নি, পারল না। কিছু বলার নেই ধৌলীর। এখন কি হবে? ছেলেটাকে দেখে মিশ্রিলাল কি দয়া করবে? খেতী দেবে খানিকটা?

মিশ্ররা এরকম তো দিয়েছে আগে?

ধৌলীর মন বলল নায় নায়।

তবে কি ঘরে ঢেলা পড়বে আর 'নায় নায়' বলতে বলতে পেটের মর্মন্তুদ জ্বালায় একদিন ধৌলী দোর খুলে দেবে? কারো কাছ থেকে মাড়োয়া কারো কাছ থেকে কাপড়, কারো কাছ থেকে চার আনা পয়সার জন্যে?

ধৌলীর মন বলল, নায় নায়।

ধৌলী কুয়োতে জল আনতে যাবে কি করে? মেয়েরা সবাই মিশ্রিলালের সাদী ও বরাতের গল্প করবে যে? বরাত গ্রামে ঢুকলে, তফাত রেখে দুসাদিন্‌রাও নাচে ও গান গায়। মিশ্রবাড়ি গিয়ে চিড়ে-লাড্ডু-ছাতু ও পয়সা নেয়। ধৌলী কি করে নাচতে যাবে? কেমন করে গাইবে, 'মৈ নাচঅত মৈ গাবত. বরাত আইও রি?'

ধৌলী কি করবে?

শনিচরী মিশ্রিগিন্নিকে দু কথা শুনিয়ে দুসাদটোলি গেল। বলল,

দেওতার ছেলে ধৌলীকে নষ্ট করল, তোরাও মুখ ফেরালি, মেয়েটা যাবে কোথায় তোরাই বল ?

— ধৌলীকে কেউ নষ্ট করে নি. ও পেয়ার করতে গিয়েছিল, ঔর জাতপাঁতের ছেলেদের মুখে লাথ্ ভি মেরেছিল। ওর ভালয়-মন্দয় আমরা নেই। যা পারে তা করবে।

—কি করবে ?

—দেখাই যাক। ওর পেয়ারের দেওতা কি করে, কত দেখ্ভাল।

মিশ্রিলাল কিছুই করল না। মাথা নিচু করে বরাতের শোভা হয়ে গ্রামে ঢুকল। ধৌলীদের বাড়ি বাতি জ্বলল না। দুসাদ-গঞ্জু ও ধোবি টোলির ঘরে ঘরে মদ-ছাতু-লাড্ডু বিতরণ হল, নতুন কাপড়। এত ধুম-ধামের বিয়ে এ অঞ্চলে কখনো হয়নি। ঝর্ণার ধারে বসে বসে ধৌলী প্রতীক্ষা করল। প্রতীক্ষাই করল। মিশ্রিলাল এল না।

ধৌলী শনিচরীর পায়ে পড়ে গেল।

শনিচরী মিশ্রবাড়ি ঘুরে এসে বলল, তার খুব গোঁসা হয়েছে।

—কেন ?

—তার মা তোদের দেখ্ভালের যে বন্দোবস্ত করে তা তোরা নিস না।

—এই কথা বলল ?

—হ্যাঁ।

—তবে তুই তাকে ডেকে আন্। বল্, না এলে আমি ছেলে নিয়ে নতুন বউয়ের কাছে যাব। আমাকে মারে তো জানে মারবে বড় দেওতা, তবুও যাব।

মিশ্রিলাল এল। মুখে কথা নেই। চোখে দুর্বোধ্য প্রশ্ন। ধৌলী বুঝল। ওর আকর্ষণ আজও মিশ্রিলালের মনকে টানে। আনন্দ হল। কোনো কোনো আনন্দ মনকে নির্মম করে ও সত্য কথা বলায়।

—তুমি শনিচরীকে বলেছ, তোমার মায়ের দেওয়া ভিখ আমরা নিই নি ?

— মৈয়া ওঁহি বোলা।

—থু! ঝুটা পর থু। তোমার মৈয়া সবসুদ্ধ দু কিলো মাড়োয়া দেয়, তাও দশ দিনে। তারপর আমার মাকে চুরনি বলে তাড়িয়ে দেয়।

—আমি তো তা জানতাম না।

—কেন তুমি আমার সর্বনাশ করলে?

—আমি তোকে পেয়ার ··

—থু। তোমার ভালবাসায় থু! যদি জোর করে ধরম নাশ করতে, এক বিঘা জমি পেতাম। তুমি না-মরদ। তোমার দাদা মরদবাচ্চা। সে ঝালোকে ছেলে দিয়েছে, ওর ঘর মকান-খেতি ভি দিল। তুই কি করলি?

—যা করেছি, তা নিজের ইচ্ছেয় করি নি।

—পরের ইচ্ছেয় সাদী করতে পার, দুকান দিতে পার, নিজের ইচ্ছে পার শুধু গরিবকে জানে মারতে? তোমার জন্মে আমার গ্রামসমাজও গুস্‌সা হয়ে গেল?

—তোকে আমি ·

—টাকা দেবে? কত টাকা? তোমার ছেলেকে মানুষ করব, তত টাকা দাও।

—দুকান থেকে ভেজব।

—তুমি তো মিছে কথা বল।

—সত্যি ভেজব।

—দেখা যাবে।

—এখন···

—দাও।

একশো টাকার নোট ধৌলী আঁচলে বাঁধল। তারপর বলল, একশো টাকায় টাহাড়েও বেশি দিন চলে না এখন। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে যখন তখনি আমি মরেছি। যদি টাকা না পাঠাও, ধানবাদ যাব আর তোমার ছেলে তোমার কোলে ফেলে দিয়ে আসব।

—বল্। তুই যা বলবি তাই মেনে নিতে হবে আমাকে।

—জীবনটায় ছাই ঢেলে দিলে দেওতা, ছুটা কথা শুনতে এত খারাপ লাগছে? না কি পয়সা থাকলে চামড়া অতই নরম হয়?

চলে এল ধৌলী। মাকে বলল, তুই কথা বলে আয়। ভালাতোড়ে মৌসির ঘরে থাকব ঔর তাতে ইজ্জত দিতে হলে দেব।

—এত চড়া চড়া কথা?

—হাঁ। ইজ্জত খোয়ালে সেখানে খোয়াব। ইধর নহী।

—ওখানে বেশি পয়সা?

—আমি জানি?

পরদিন মিশ্রিলাল গ্রাম ছেড়ে ধানবাদে ফিরে গেল বউ নিয়ে। বাসে ওঠার সময়ে ওর শালা বলল, ও মেয়েটা কে?

—কোথায়?

—ওই যে, ছেলে কোলে? তোমায় দেখছে।

ধৌলী। কোলে ছেলে।

—এক দুসাদিন্।

—এত সুন্দর?

—তা হবে, আমি চেয়ে দেখিনি।

বাস ছেড়ে দিল।

॥ তিন ॥

কারো কারো জীবনে বহু আশা পূর্ণ হয়। ধৌলীর জীবনে আশা নেই, আশার চরিতার্থতাও নেই, থাকে না। ধৌলীর মৌসি কোন উৎসাহই দেখাল না। মিশ্রিলালের দেওয়া একশো টাকা ভেঙে খেতে-খেতে ন টাকায় ঠেকল। মিশ্রিলাল কোনো খবর পাঠাল না, না কোনো টাকা। টাকার ব্যাপারটি অবশ্য পরে আরেক রকম জানা যায়। একবার মিশ্রিলাল ড্রাইভারকে দিয়ে কুড়ি টাকা পাঠায়, ড্রাইভার সেটি মেরে দেয়। ধৌলীর মা'র একটা ছাগল চুরি হল। আর দুটো শেষ অবধি বেচতে হল, আর বিক্রেতার গরজ বেশি হলে যা হয়, কোনো দামই পেল না ওরা।

ধোলী বুঝতে পারছিল গ্রামসমাজ, মিশ্র-পরিবার ও ঠিকাদারী কুলীরা ওকে উদগ্র আগ্রহে লক্ষ করবে। ওরা দেখছে ধোলীর ছেলেটা মাড়োয়ার ফ্যান খেয়ে বড় হচ্ছে। দেখছিল, ধোলীর মা জঙ্গলে গিয়ে কচু-কন্দ খোঁজে। দেখছিল, শনিচরী মাঝে মাঝে কোঁচড়ে মকাই ভাজা নিয়ে ওদের বাড়ি যায়। দেখে ওরা জানছিল, ধোলীকে মিশ্রলাল শেষ অবধি নিশেষে হাত ধুয়ে ফেলে দিয়েছে।

একদিন ধোলীর ঘরে ঢেলা পড়ল।

—যে হও, আমি বলোয়া নিয়ে শুয়ে থাকি। ধোলী চেঁচিয়ে বলল। কে যেন শিস দিল ও চলে গেল।

আবার ঢেলা পড়ল। ধোলী নিঃসাড়ে রইল। আবার ঢেলা।

— তোর মা-বোনের কাছে যা। ধোলী চেঁচিয়ে বলল।

মা বিড়বিড় করে বলল, কদিন ঠেকাবি ?

—যতদিন পারি।

—তুই পারিস, আমি যে পারি না।

—আমিও পারি না মা।

—তাহলে কি করবি বল্ ?

—মা, শহরে গিয়ে ভিখ মাংনি হব ?

—কে ভিখ্ দেবে ? তোকে দেখলে পেছনে মানুষ লেগে যাবে না ?

— মা, মানুষ লাগবে, তেমন চেহারা কি আমার আছে ?

—নইলে ঢেলা পড়ে ?

— ওই ছেলেটার জন্যে · ,

—আমার আর সয় না। তুই আর তোর ছেলে! নইলে আমি শনিচরীর ঘরে কবে চলে যেতাম!

— কাল আমি ব্যবস্থা করব।

— কি করবি ?

—খেত গুড়াব।

— সারাদিন সবাই খেত গুড়ায়, কি পায় ? কিছুই না।

—দেখি, কি করি।

ধৌলী সকালে উঠে পারশনাথের দোকানে গেল। বলল, না হয় তোমার দোকান ঝাড়ু দেবার কাজ দাও। না খেয়ে যে মরে গেলাম।

পারশনাথ বলল, এই এক খুঁচি মাড়োয়া নিয়ে যা ধৌলী। কাম কাঁহা? কাম কুছ না হো, ঔর তোকরাকে কাম দেনে সে বড়া দেওতা গুস্‌সা হোগা।

—কাঁয়? হম্‌ উন্‌হি কো কা করব?

— ভাইকে লিয়ে।

মাড়োয়া কয়টি আঁচলে বেঁধে নিয়ে ধৌলী গাছের ছায়ায় বসল। কুন্দন মিশ্র যদি তাকে হাতে না মারে, ভাতে মারবে। ভাইকে ভালবাসার শাস্তি। মাড়োয়া কয়টিতে ক'দিন যাবে? জলের মত ঘাটো রাঁধলে?

মা মাড়োয়া কয়টি দেখে তখন কিছু বলল না। খাবার সময়ে পাত্রটি ঠিক করে নামিয়ে দিয়ে বলল, তুই আর তোর ছুলার খা। আমি চললাম যেদিকে দু চোখ যায়। পেটে শুকিয়ে মরতে পারব না।

—খাবি না?

—না। হতভাগী, আর কিছু না পারিস, মরতে তো পারিস।

—তাই মরব।

মরতেই যায় ধৌলী। সেই ঝর্ণার জলে। ও মরলে মাকে গ্রামসমাজ দেখবে। বাচ্চাটা? ধৌলী মরলে মা পারলে তাকে বাঁচাবে, নয়তো সেও মরবে।

কিন্তু মরা তার হল না। ছাপালুঙ্গি আর শার্ট পরা লোকটা, হেড কুলি, ওর হাত ধরল। বলল, কই, বলোয়া কোথায়?

ধৌলী ওর চোখে চোখে চাইল। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই চোখে ওর।

—হাত ছাড়্।

লোকটা হাত ছাড়ল।

—তুই ঢেলা মারতিস?

—হ্যাঁ।

লোকটা ইঙ্গিত করল। ধৌলী বুঝল, এই ওর নিয়তি। একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।

—দোর খুলে দিবি?

—হ্যাঁ। ঔর…

—কি?

—টাকা আনবি।

—টাকা।

—টাকা আনবি, মকাই আনবি। যদি দুকান খুলি দাম নিব না?

ধৌলী ঘরে ফিরে এল। মাকে বলল ছেলেটাকে নিয়ে শনিচরীর ঘরে যাবি আজ হতে।

—কেন?

—ঢেলা পড়বে। দরজা খুলব।

ধৌলীর মা কাঁদত বোধহয়, কিন্তু ধৌলী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, শোর মচাবি না। ভোর না হতে চলে আসবি।

মিশ্রলালের দেওয়া ছাপা শাড়ি দুটির একটির আজ বউনি হল। শনিচরীর কাছ থেকে তেল ধার নিয়ে চুলে মাখল ধৌলী। স্নান করল, চুল বাঁধল। আর কি করতে হয়? আরো নিশ্চয় করণীয় আছে।

রাতে ঢেলা পড়ল। লোকটা মকাই, লবণ, ডাল এনেছিল, একটা টাকা। ধৌলী ওকে পাইপয়সা অব্দি শরীর দিয়ে চুকিয়ে দিল। বলল, কখনো শুধু হাতে আসবি না।

—ঔর কারুকে আসতে দিবি না।

—যে দাম দিবে সে আসবে।

অনেকে দাম দিল। অনেকে আসতে থাকল। ধৌলী আর মা আবার আস্ত কাপড় পরল। দুবেলা ভরপেট খেল। ধৌলীর আজকাল খদ্দের চলে গেলেই গা ঢেলে ঘুম আসে। কত সহজ অপ্রেমে শরীর বেচা, মাড়োয়া মকাই লবণে দাম নেওয়া। এত সহজ সবকিছু তা আগে বুঝলে শরীরটা বাঁচত আগেই। ছেলেটাও খেয়েমেখে পুষ্ট হত। ধৌলীর মনে হল সে খুব বোকা ছিল।

আরেকজন দেখছিল সব, কুন্দন। কুন্দন বোঝে, যে যোগ্যতম, সেই বাঁচছে। ধৌলী বেঁচে থাকার পথ চিনেছে, তার প্রতিহিংসাকে হারিয়ে দিয়েছে। কুন্দন জ্বলে জ্বলে মরছিল। খুব মোহনীয় দুসাদিন এখন।

একদিন কুয়োর ধারে ধৌলীকে জল নিতে দেখে কুন্দনই শনিচরীকে বলল, ওর ছুঁয়া পানি তোর খাচ্ছিস?

—কার?

—য়ো ধৌলী।

—তাতে তোমার কি, দেওতা? ওর ঘরে এখন জাতপাঁতের সবাই যায়। হমানি লোক মান্‌লি।

—কেন?

—ও কোনো দোষ করেছে?

—রাণ্ডী হয়ে গেছে।

—বেওয়া রাণ্ডী তো ছিলই। তোমার ভাই ওকে রেণ্ডায় রাণ্ডী বানাল। ও না বনলে তোমার ভাইয়ের ছেলে বাঁচত? এখন তো সবাই খুশি আছে। তোমার বেওসালী দোস্ত্‌ ও ঠিকাদারও। তার কুলিরা এখন ইধার-উধার মজা করতে যায় না।

—তোর মুখ খুব বেড়েছে।

—যাও যাও। এই শনিচরী না থাকলে তোমার মৈয়া আর বহু বাঁচত না।

কুন্দন বুঝল, সে হেরে গেল। আর কথা না বলে সে ঘরে ফিরে গেল। শনিচরীর দরকার এ-গ্রামে ঘরে ঘরে। তার ওষুধ বিনে গ্রাম অচল।

কুন্দন ধানবাদে গিয়ে ছোটভাইকে খুব শাসিয়ে এল। বলল, চাস তো ওকে জমি দে, চাই টাকা। গ্রামে খারাপ কারবার ঘুসে গেল তোর জন্যে।

—কেন?

মিশ্রলালের মুখ সাদা হয়ে গেল। কুন্দনের মনে হিংস্র আনন্দ। কস্‌বীটার প্রতি এখনো ভাইয়ের ভালবাসা আছে। এবং সেই

ভালবাসাতেই যা দিতে পেরেছে কুন্দন। শা—বাশ। ছেলেটা লা-মরদ। ব্রাহ্মণ বলে স্বতন্ত্র—কোনো অহংকারও নেই। মরদ হবে মরদের মত। কুন্দন যদি ছোট ভাই হত, তাহলে স্বীয় রাখ্‌নীকে কি হনুমান মিশ্রের কথায় পথে ভাসাত? এ ছেলেটা সেই লা মরদী কাজই করেছে। ওকে মরদ করে তোলা চাই। অচ্ছুতদের পায়ের নিচে রাখতে হবে, কখনো দয়া দাক্ষিণ্যও দেখাতে হবে কিন্তু মরদ হতে হবে। নইলে কুন্দন একা পারবে কেন? এত ক্ষেতি, এত বাগ-বাগিচা এত অবৈধ সন্তান, এত উর্বরা অচ্ছুত রমণী, এত সুদের সাম্রাজ্য, সব সামলে চলতে?

—কেন? তোর পেয়ারী তুসাদিন্, থু। বরাম্‌ভনের সাথ পেয়ার করে বেটার মা হল। এখন, (অসভ্য ইঙ্গিত করে কুন্দন বলল) যে দরজা দিয়ে সিংহ ঢুকেছে সে দরজায় শুওর-ছুঁচো-ইঁদুর – সবাই ঢুকছে।

—না, কখনো নয়।

—হাঁ জরুর হাঁ। ঔর সবাই বরাম্‌ভনকে লিয়ে হাঁস উঠাচ্ছে।

—কখনো নয়।

—একশোবার হাঁ। লা মরদ। ডরপোক! তুই কেন হনুমানজীর মুখের উপর বললি না, আমি ওকে রাখব? ঝালো আমার রাখ্‌নী। ওকে ঘর মোকান দিতে হনুমানজী না করেনি? আমি শুনলাম? থু। তোর পেয়ারের পর থু। তুসাদিন্‌কে প্যার। যাও মজা লোটো, পয়জার সে পঞ্চায়েত ঠিক রাখো। লা-মরদ। লা-মরদ। বরাম্‌ভন নামে তুই থুথু ছেটালি।

—আমি নিজের আঁখসে দেখব, ঔর তবে বিশ্বাস করব। ঝুট হলে······

কুন্দন চতুর, বিজয়ীর হাসি, হাসল। বলল, হমকো মার দেনা? তুসিকো তো বন্দুক কী লাইসেন বনোয়া দেয়া না?

তুষানলে আর সাপের বিষে জ্বলতে জ্বলতে মিশ্রিলাল টাহাড় এসেছিল। বাসস্টপে কোনো ধৌলী অপেক্ষা করছিল না, আর তাকে দেখেনি।

সন্ধ্যারাতেই সে ধোলীর দরজায় ঠেলা মারে, আর সবুজ চুড়ি, লাল কাপড়-পরা, তেলমাখা চুলে বেণী-বাঁধা এক ধোলী তাকে দরজা খুলে দেয়।

মিশ্রিলালকে দেখে সে প্রথমে ভীষণ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শক্ত মুখে, কঠিন গলায় বলে দেওতা। সরকার! কা অন্দর আয়ে গা?

মিশ্রিলাল ঢুকে পড়ে। ডিবরি নয়, লালটিম জ্বলছে। মাচাঙে ভাল শতরঞ্জি আর বালিশ। মাচাঙের নিচে মাড়োয়ার বোরা তেলের টিন।

—তুই রাণ্ডী হয়েছিস?

—জরুর।

—কেন হলি?

—তুমি মজা লুটে পালালে। তোমার দাদা ভাতে মারল। তোমার ছেলেকে বাঁচাতে, ঔর নিজে বাঁচতে?

—এর চেয়ে তুই মরলি না কেন?

—মরতে গিয়েছিলাম। তারপর ভাবলাম, কেন মরব? তুমি শাদী করবে, দুকান চালাবে, দুলহনিয়া নিয়ে সিনেমা দেখাবে, মরব আমি? কেন? কেন? কেন?

—এখন তোকে আমি মারব।

—মারো।

—বরাম্ভনের লেড়কা পাল্‌পোষ করবে অচ্ছুত। যত অচ্ছুত! তোকে আমি মারব।

—না। তুমি লা-মরদ।

—ন বোল্‌ ধোলী, ল-মরদ ন বোল। য়ো বড়াভাই বোলা। তু ন বোল্‌। তুঝকো দিখায় গা কা হম্‌ মরদ ঔর বরাম্ভনের বাচ্চা।

মিশ্রিলাল আর কুন্দন আর হনুমানজী কয়েকদিনের মধ্যেই পঞ্চায়েত ডাকেন। পঞ্চায়েতে কোনো পাঁচজনের মতামত নেওয়া হয়নি। হনুমানজী বলেন, ধোলী গ্রামে বসে বেওসা কারবার চালাতে পারবে

না। ওকে শহরে গিয়ে, রাঁচি গিয়ে নাম লেখাতে হবে। নইলে ধৌলীর ঘর জ্বলে যাবে, মা-মেয়ে বাচ্চা পুড়ে মরবে। গ্রামের বুকে বসে এত বড় অধর্ম চলবে না। এখনো গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস আছে। সে ঘরে রোজ শিব ও নারায়ণের পুজোও হয়।

ধৌলী বলেছিল, বরাম্ভনের ছেলে পালপোষ করতে বরাম্ভন খরচ দিল না কেন?

—চুপ কর্ রাণ্ডী। বলে হনুমান মিশ্র তাকে পায়ের জুতো ছুঁড়ে মারেন।

মিশ্রিলাল বলে, এখন জানলি আমি হাঁ-মরদ আর বরাম্ভনের বাচ্চা।

দুসাদ ও গঞ্জু ধোবিরা সবাই এ মীমাংসা মেনে নেয়। কোথায় শহর রাঁচি, কোথায় যাবে ধৌলী?

কুন্দন বলে, আমার ঠিকাদার ওকে নিয়ে যাবে। কালকেই।

ভোরের বাসে ধৌলী ও ঠিকাদার চড়ে বসে। ধৌলীর হাতে পুঁটলি। চোখ জলশূন্য ও প্রচণ্ড আঘাতে বিমূঢ়। যেন ওর মস্তিষ্ক কাজ করছে না। চলাফেরা সবই যান্ত্রিক। ও পুতুল। অন্যদের দেওয়া দম ওকে চালাচ্ছে।

বাসের পাশে দাঁড়িয়ে ওর ছেলে কোলে ওর মা অঝোরে কাঁদে। ছেলে কিন্তু হাত বাড়ায়। ধৌলী আস্তে বলে, রাতে ওর জন্যে একটু গুড় রাখিস। কাঁদলে মুখে দিস।

মা ফুকরে কেঁদে ওঠে। এর চেয়ে ভাশুরের সঙ্গে থাকলি না কেন?

ধৌলীর মুখে এক দুর্বোধ্য করুণার হাসি ফুটে ওঠে। সে রকম হলে সে হত ব্যক্তিজীবনে রাণ্ডী। এখন সে বেওসা-রাণ্ডী হতে যাচ্ছে। তেমন রাণ্ডী একলা মানুষ। এখন সে যে রাণ্ডী হবে তা এক সমাজের সদস্য। ব্যক্তির চেয়ে সমাজের শক্তি অনেক বেশি, আর যারা তাকে রাণ্ডী করে দিল, তারাই সকল সমাজকে চালায়। সবচেয়ে শক্তিমান তারা। মা এত কথা বুঝবে না, ধৌলী বুঝছে। তাই সে হাসতে পারল, ও বলতে পারল, গুড় রাখিস মা, ঘরে বাতিও রাখিস, অন্ধেরাসে ডরেগা য়ো।

রোহাত্‌গী কোম্পানির ড্রাইভার ধৌলীর দিকে তাকাতে পারছিল না। ও হর্ন বাজাল ও বাস ছেড়ে দিল। ধৌলী একবারও পেছনে তাকাল না, কেননা তাকালেই মিশ্রদের মন্দিরের পিতলের ত্রিশূলটি দেখতে হত।

কুন্দনের ঠিকাদারও ধৌলীর দিকে চাইতে পারছিল না। না চেয়েই সে বলল, থোড়া আরাম কর্‌লে। রাঁচি বহোত্‌ দূর।

বাস স্পীড বাড়াল। রাঁচি ও ধৌলীর মধ্যবর্তী দূরত্ব কমছে, রোদ উঠছে, প্রত্যেক সকালের মতই আকাশ নীলই আছে, গাছগুলিও সবুজ। ও জানল না, দৈনন্দিনতার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি প্রকৃতিতে, সেই আঘাতের যন্ত্রণায় ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সব যে আজ থেকে বদলে যাবার কথা ছিল? স-ব? ধৌলী রাণ্ডী হবার দিনে? না কি, ধৌলীদের রাণ্ডী হওয়ার ব্যাপারটা প্রকৃতিও মেনে নিয়েছে, যে প্রকৃতি মিশ্র পরিবারের সৃষ্টি নয়? এই গাছ-আকাশ-মাটি, এরাও মিশ্রদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে?

রুদালী

টাহাড় গ্রামটিতে গঞ্জু ও দুসাদরা সংখ্যাগুরু। শনিচরী জাতে গঞ্জু। গ্রামের আর সকলের মত শনিচরীর জীবনও কেটেছে অসুমার দারিদ্র্যে। শনিবারে জন্মেছিল বলে ওর কপালে এত দুঃখ, এ কথা একদিন ওর শাশুড়ী বলত। যতদিন বলত, তখন শনিচরী ছিল বউ। মুখ তেমন খোলেনি। শাশুড়ী যখন মরে তখনো শনিচরী বউ মানুষ। শাশুড়ীকে জবাবটা ওর দেওয়া হয়নি। এখন মাঝে মাঝেই ওর কথাটা মনে পড়ে। একা, আপনমনে ও বলে, ওঃ! শনিবারে জন্মালে শনিচরী নাম হয়, বউ অপয়া হয়। তুমি তো সোম্‌রি ছিলে, কোন্ সুখে জীবনটা কাটল? সোম্‌রি, বুধ্‌য়া, মুংরি, বিস্‌রি, কার জীবনটা সুখে কাটে?

শাশুড়ী মরতে শনিচরী কাঁদেনি। ওর বর আর ভাশুর, শাশুড়ীর দুই ছেলেকেই হাজতে পুরেছিল মালিক-মহাজন রামাবতার সিং। এক টাল গম চুরি যেতে রামাবতার এমন ক্ষেপে যায়, যে টাহাড়ের যত দুসাদ, যত গঞ্জু পুরুষ, সকলকেই দেয় জেলে পুরে। শাশুড়ী শোথজ্বরে ভুগে ভুগে, খেতে দে! খেতে দে! বলতে-বলতে, হা-অন্ন! জো-অন্ন! বলতে বলতে মরে গিয়েছিল হেগে-মুতে। ঝিমঝিমে বর্ষার রাত ছিল। শনিচরী আর তার জা মিলে বুড়িকে মাটিতে নামিয়েছিল। রাত পোহালে দোষ লেগে যাবে, ঘরে নেই এক খুঁচি গম, প্রায়শ্চিত্তের কড়ি আসবে কোত্থেকে? রাতের মড়া যাতে রাতে বেরোয় সে জন্যে শনিচরীই সেই বর্ষার রাতে প্রতিবেশীদের ডাকতে বেরিয়েছিল। হাতে-পায়ে ধরে সকলকে আনতে, বুড়িকে দাহ করার ব্যবস্থা করতে শনিচরী এত ব্যস্ত ছিল, যে কাঁদবার সময় হয়নি। হয়নি তো হয়নি? বুড়ি যে জ্বালান্ জ্বালিয়ে গেছে, কাঁদলেও তো শনিচরীর আঁচল ভিজত না।

বুড়ি একলা থাকতে পারত না জীয়ন্তে। মরেও একা থাকতে পারেনি। তিন বছর যেতে না যেতে ভাশুর, জা, সবাই সাফ।

রামাবতার সিং তখন গ্রাম থেকে দুসাদদের, গঞ্জুদের তাড়াবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে। তাড়িয়ে দেবে রামাবতার, সেই ভয়েই শনিচরী তখন কাঁটা হয়ে থাকত। ভাশুর আর জা মরতেও কাঁদা হয়নি। কাঁদবে, না লাশ জ্বালাবার. সস্তায় শ্রাদ্ধ সারবার কথা ভাববে? এ গ্রামে দুঃখী মানুষ সবাই। প্রতিবেশীর দুঃখ বোঝে। তাই টক দই, ভুরা চিনি আর ধেনো চিড়ে পেয়ে খুশি হয়ে যায়। শনিচরী আর ওর বর যে কাঁদেনি, তাতেও সবাই বলে, কাঁদতে কি পারে এখন? তিন বছরে তিনটে মরল। চোখের জল বুকে পাথর হয়ে জমে যাচ্ছে।— শনিচরী মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। মালিক-হুজৌরের খেত ঠেঙিয়ে যে খুদকুঁড়ো আনা, তাই এতগুলো মানুষের সম্বল। দুটো মানুষ মরল, ভাল হল। নিজেরা পেট ভরে খাবে।

স্বামী মরতে কাঁদবে না, তা তো ভাবেনি শনিচরী? অথচ, এমন কপাল ওর, ঠিক তাই ঘটল। তখন ওদের একমাত্র ছেলে বুধুয়া বছর ছয়েকের। শনিচরী ছেলেকে ঘরে রেখে অসীম উদ্যমে, সংসারটা বেধে তোলবার জন্যে, চলে যায় মালিকের বাড়ি। দমাদম্ কাঠ চালা করে দেয়, গরুর ঘাস এনে দেয়, ফসলের মৌসুমে স্বামীর সঙ্গে খেতে গিয়ে ফসল কাটে। ভাশুরকে তার শ্বশুরের দেওয়া জমিটুকুতে ঘরখানা সবে তুলেছে দুজনে। দেওয়ালে শনিচরী চিত্র এঁকেছে। উঠোনে বেড়া দেবে বুধুয়ার বাপ, উঠোনে লঙ্কা-বেগুন আবাদ করবে। শনিচরী হুজুরাইনের কাছ থেকে বকনা বাছুর পালানি নেবে, সব ঠিক। শনিচরীর বর বলল, চল্, তোহ্রিতে বৈশাখী মেলা দেখে আসি। শিবঠাকুরকে পূজাও দেব। সাতটা টাকা তো জমেছে।

মেলা খুব জমেছিল। বড় বড় রহীস লোকরা শিবের মাথায় ঢালছিল ঘড়া ঘড়া দুধ। সেই দুধ কয়েকদিন ধরে মাটিকাটা চৌবাচ্ছায় জমছিল। টক দুর্গন্ধ উঠছিল দুধ থেকে, মাছি ভনভন করছিল। পাণ্ডাকে টাকা দিয়ে সেই দুধ গেলাস গেলাস খেয়ে অনেকের হায়জা হয়, অনেকে মরে। বুধুয়ার বাপও মরেছিল হায়জায়। তখনো আংরেজরাজ। গোরমেনের লোক সব হায়জা রোগীকে টেনে-টেনে

হাসপাতালের তাঁবুতে নিয়েছিল। তাঁবু মাত্র পাঁচটা। রুগী ষাট-সত্তর জন। তাঁবুর চারদিকে ছিল কাঁটাতারের বেড়া। শনিচরী আর বুধুয়া বেড়ার এ পাশে বসেছিল। বসে-বসেই শনিচরী জেনে যায়, বুধুয়ার বাপ মরে গেল। কাঁদতে সময় দেয়নি গোরমেনের লোক। লাশগুলো তারাই জ্বালায়। শনিচরী আর বুধুয়াদের টেনে নিয়ে গিয়ে হাতে কলেরার সুঁই দেয়। তাতে যা ব্যথা হয়, সেই ব্যথাতেই মা-ছেলে খুব কাঁদে। কাঁদতে-কাঁদতে শনিচরী কুরুডা নদীর তিরতিরে জলে স্নান করে মেটে সিঁদুর মুছে, হাতের চুড়ি ভেঙে গ্রামে ফেরে। গালার চুড়িগুলো নতুন। মেলায় গিয়ে পরেছিল। তোহ্রিতে শিবমন্দিরের এক পাণ্ডা বলে, এখান থেকে আত্মপিণ্ড দিয়ে যা। বিভূঁয়ে এসে মরল বুধুয়ার বাপ।—তার কথাতে, পাঁচ সিকে দক্ষিণা দিয়ে বুধুয়ার হাত দিয়ে বালি আর সত্তুর পিণ্ড দেওয়ায় শনিচরী। কিন্তু তা নিয়ে গ্রামে কি কম ঝড় উঠেছিল? মোহনলাল ব্রাহ্মণ, রামাবতারের স্থাপিত বিগ্রহের সেবক, সে বলেছিল, ওঃ! বালির পিণ্ডি নদীর জলে! বুধুয়া যেন রামচন্দ্র। বালি দিয়ে দশরথের পিণ্ড দিচ্ছে!

বরাম্ভোন বলল যে?

তোহ্রির ব্রাহ্মণ জানবে টাহাড়ের মানুষের কিরিয়াকরণের নিয়ম? তার কথায় পিণ্ডি দিয়ে তুই আমার মাথাটা হেঁট করে দিয়ে এলি তো?

মোহনলালকে তুষ্ট করতে, রামাবতরের কাছে "পাঁচ বছর খেত-বেগারী খেটে পঞ্চাশ টাকা শোধ করব" খতে টিপসই দিয়ে কুড়ি টাকা নিতে, সে টাকায় বুধুয়ার বাপের শ্রাদ্ধ করতে, শ্রাদ্ধ মিটতে কচি ছেলে নিয়ে হা ভাত! জো ভাত! করতে এমন ব্যস্ত থাকে শনিচরী, যে বুধুয়ার বাপের জন্যে আর কাঁদা হয়নি। একদিন ঘোর গ্রীষ্মে পুড়তে-পুড়তে রামাবতারের খেতে নিড়িনি দিতে-দিতে শনিচরী হঠাৎ নিড়িনি ফেলে একটা পিপল গাছের ছায়ায় বসেছিল গিয়ে। অন্য মজুরদের বলেছিল, আজ আমি বুধুয়ার বাপের জন্যে কাঁদব। বুক ফাটিয়ে কাঁদব।

আজই কাঁদবি কেন?—দুলন গঞ্জু বলেছিল।

তোরা মজুরী নিয়ে ঘর যাবি। আমি খত লিখে বসে আছি। আমি যাব চারটি ভুট্টার ছাতু নিয়ে। তাই কাঁদব। আমার কান্না পায় না ?

সেই দুঃখে কাঁদবি। এ তোয়াকে টানছিস কেন ?

তু বহোৎ খচড়াই লাটুয়াকে বাপ।

হিসেব করে দেখেছিস ? এক বছর হয়ে গেল।

এক সাল !

হাঁ রে।

এক সাল সে নেই ?

পেটের জ্বালায় সময় যায়।

আমি যদি মরত'ম !

বুধুয়া কোথায় যাবে ? পাগলামি করিস না। শোন্, খত যা লিখেছিস তা লিখেছিস। এখন দেখ্, আমি কাজ করি জিরিয়ে—জিরিয়ে। যদ্দিন কাজ, তদ্দিন মজুরী। তুই জান লড়িয়ে ও হারামীর খেত সাফ করছিস কেন ? জিরেন্ নে। যদ্দিন কাজ, তদ্দিন জলখাই।

সেদিনও শনিচরীর কাঁদা হয়নি।

গ্রামসমাজে সব কিছুই সকলের চোখে পড়ে। শনিচরী যে কাঁদেনি, তা নিয়ে অনেক কথা হয়। শনিচরী সে সব কথা কানেও নেয়নি। রামাবতর সিংয়ের খতের টাকা শোধ হচ্ছিল না, বোধ হয় শোধ হতও না। কিন্তু শনিচরী তখন একটা কালো এঁড়েকে দেখাই-ভালাই করছিল। আসরফির মা ওর হেফাজতে এঁড়েটা রেখে গয়াজী গিয়েছিল। তখনি রামাবতারের খুড়ো মরে, আর মৃত্যুকালে ওই এঁড়েটার ল্যাজ বুড়োকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বৈতরণী পারের অব্যর্থ ওষুধ। শনিচরী দেখে ঘরে অনেক লোক। রামাবতারের কুটুম-স্বজন সব। শনিচরীর মাথায় হঠাৎ খচড়াই খেলে। সে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলে, গোড় লাগি গরিবের মা-বাপ। গরিব শনিচরী আপনাদের সেবায় লাগল আজ। তা একটা আর্জি। সে খতের টাকা শুধে গেছে বলে লিখে দিন।

খুড়ো মরা মানে আরো পঞ্চাশ বিঘা সরেস জমি হাতে আসা। রামাবতার কি জানি কেন, শনিচরীর কথা মেনে নেয়। এ নিয়ে পরে রামাবতারকে অনেক কথা শুনতে হয়। অন্য জোতদার-মহাজনরা বলেছিল, খতের টাকা শোধ গেছে বলে মেনে নিলে যখন, তখন থেকে অছুতদের রবরবা বেড়ে চলেছে। টাকাটা কিছু নয়। নাগরার ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন। কিন্তু খতটা হল সেই জোয়াল, যা কাঁধে নিয়ে বলদগুলো খেটে চলে।

রামাবতার বলত, খুড়ো মরছে, মনে দুঃখ, খুব উদাস লেগে গিয়েছিল ভাই। মনে হচ্ছিল, যে যা চায়, তাকে তাই দিয়ে নিজে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাই।

রামাবতারের ছেলে লছমনের যখন বিয়ে হয়, তখন রামাবতার শনিচরীদের কাছ থেকে বিয়ের বাদ্যিবাজনার খরচ আদায় করেছিল।

এই সব ভাবতে-ভাবতে আর পেটের ধান্দা করতে-করতে শনিচরী কাঁদতে ভুলে যাচ্ছিল। বুধুয়া বড় হল। বাপের মতই দারিদ্র্যের জোয়াল কাঁধে নিল। বিয়ে হয়েছিল শৈশবে। বউ ঘর করতে এল। বুধুয়ারও ছেলে হল একটা। বউটা যেন ডাইনী। হাটের মানুষদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে কি খেয়ে আসত কে জানে। দিনে-দিনে ফুলে ফেঁপে উঠল বউ। রামাবতারের ছেলে লছমনের গমের বোরা বইতে-বইতে বুধুয়াকে ধরল চেনা রোগে। খোঁখী রোগ। যক্ষ্মা। রাতে জ্বর হয়, ভোরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। কাসির সঙ্গে রক্ত। চোখের নিচে কালি। দেখে-দেখে শনিচরীর বুকে চিতার আগুন হা-হা করে আকাশ পানে ছড়িয়ে দেয় যে বাতাস, সেই বাতাস বইত। বুধুয়ার দিকে চাইলেই শনিচরী বুঝতে পারত। বুধুয়াকে আঁকড়ে ধরে সংসারটা বেঁধে তোলার আকাঙ্ক্ষাটাও তার পুরবে না। ছোট আকাঙ্ক্ষাগুলোও পূর্ণ হয়নি ওর। কাঠের কাঁকই কিনবে একটা, কেনা হয়নি। গালার চুড়িগুলো এক বছর হাতে রাখবে, রাখা হয়নি। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার চেহারা বদলায়। ছেলে-বউ কামাই করবে। ওদের মেহনতের অন্ন শনিচরী খাবে। শীতের রোদে বসে নাতির সঙ্গে এক-

সানকি থেকে খাবে ছাতু ও গুড়। এই আকাঙ্ক্ষাটা বড্ড বড় মাপের হয়ে গিয়েছিল কি? সেই জন্যেই কি বুধুয়া এখন তিলে-তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে?

বউয়ের দিকে চেয়ে-চেয়ে, ওকে দোষ দিতে গিয়েও পারত না শনিচরী। বুধুয়ার বউ, নাতির মা তাকে কেমন করে রুক্ষ কথা বলে শনিচরী? বুধুয়া সবই বুঝত। একদিন বলেছিল, মা, ওকে কিছু বলিস না।

কাকে?

তোর বউকে।

এ কথা বললি কেন?

বুধুয়া শীর্ণ ও শুভ্র হাসি হেসেছিল। বলেছিল, মা! ও হাটে সবজি বেচতে গিয়ে পয়সা চুরি করে? এটাসেটা কিনে খায়, সবই তো জানি। ভুখের জন্যে করে মা।

ওকে কি আমি খেতে দিই না?

ওর খিদেটা বেশি যে?

মানুষ কত কথা বলে।

জানি মা। কেন বলে তাও জানি। কিন্তু আমার আর এ নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে না। য়ো কা জানেগী মা, তুই আর আমি কত কষ্টে সংসারটুকু······

বুধুয়া কাসতে শুরু করেছিল। শনিচরী ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল, ভগবানকে আর ডাকি না রে। ভগবান থাকলে তোর ব্যামো আমাকে দিত।

না মা। তুই থাকলে আমার ছেলে বাঁচবে।

আমি যে আমার ছেলের বাঁচা চাই?

কপাল চাপড়ে উঠে গিয়েছিল শনিচরী। উঠোন আলো করে দিয়েছে বুধুয়া। ভিণ্ডি, বেগুন, মুলো, লঙ্কা, কুমড়ো। নানাবিধ সবজি। লছমনের বাগান থেকে চারা এনে, বীজ এনে বুধুয়া এই সবজির খেতটুকু করেছে। বউ তার ডবকা। বউয়ের খিদে বেশি।

বউ খুব ঝুঁকেছিল, সেও যাবে লছমনের খেতে কাজ করতে। তার পেট ভ'তে চায় না। নিজের খাবার যোগাড় সে নিজেই করবে। বুধুয়া সব কথাই শুনেছিল। বলেছিল, ছেলেটা হয়ে যাক। তারপর যা চাস, করবার ব্যবস্থা করে দেব।

বড্ড খেটেছিল বুধুয়া। উঠোন ঘিরেছিল কাঁটাঝোপের বেড়ায়। উঠোন কোদালে কুপিয়েছিল। চুরি করে সার আনত লছমনের খেত থেকে। বাঁকে বয়ে জল আনত নদী থেকে তাতের সময়ে। কয়েক মাসেই সেজে উঠেছিল উঠোনটা। শনিচরী হেসে বলেছিল, এ খুব ভাল হল বুধুয়া। তোর বাপও এ রকম সবজি খেত করতে চেয়েছিল রে।

নাতি হল। নাতির দেড় মাস বয়স হতেই বউ জেদ ধরল সে খাটতে যাবে। বুধুয়া বলল, যাবি। হাটবারে সবজি বেচতে যাবি। মালিকের খেতে যেতে দেব না। মালিকের খেতে কাজ করলে যুবতী মেয়ের ঘরে ফেরে না।

ইশ্ কোথায় যায়?

প্রথমে ভাল ঘরে, তারপর রাণ্ডীটোলিতে। এ নিয়ে আর কথা বললে মাথা নামিয়ে দেব ধড় থেকে।

বউ হাটে গিয়েছিল।

শনিচরী বলেছিল, হাটে পাঠালি বুধুয়া? নয় ও ঘরে থাকত, আমি যেতাম?

না মা। তুই আর আমি খেতে খাটতাম, ও তো ঘরে থাকত। কোনদিন দেখেছিস ও রেঁধেবেড়ে রেখেছে, জল এনে রেখেছে, ঘরদোর ঝাড়ু দিয়েছে?

না।

শনিচরী আর বুধুয়া দুজনেই জেনেছিল, বউয়ের মন বসবে না রোগা বরে, দুখের সংসারে। শনিচরী বউকে বলেছিল, ও আর কতদিন? চোখে মুখে কালি পড়েছে। যতদিন থাকে, একটু সমঝে চলিস।

বউ সে কথা অক্ষরে-অক্ষরে মানে। বুধুয়া "যতদিন" থাকল, সেও ততদিন ছিল। ছেলের ছয় মাস বয়সে তখন। বুধুয়ার সেদিন,

সেদিন কেন, কয়েকদিন ধরেই খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল। বৈদ্যের ওষুধেও কাজ হয়নি। শনিচরী বউকে বলেছিল বুধুয়ার কাছে থাকতে। নিজে গিয়েছিল, দৌড়ে দৌড়েই গিয়েছিল বৈদ্যের কাছে অন্য ওষুধ চাইতে। ওষুধে আর কাজ হবে না জেনেও ওষুধ আনতেই গিয়েছিল ও। বৈদ্যের বাড়ি মাইলখানেক দূরে। মাগো! ভাবলে কেমন লাগে, অতখানি পথ কেমন করে দৌড়েছিল ও? কিন্তু বৈদ্য ছিল না ঘরে, হাটে গিয়েছিল। ঘরে ফিরতেই শনিচরী "ওষুধ দাও, ওষুধ দাও" বলে মাথা কুটেছিল। বিরক্ত হয়ে বৈদ্য বলেছিল, ছোট জাতের ধৈর্য সহ্য থাকে না। ছেলের অবস্থা যদি অতই খারাপ হবে, বউ হাটের দিকে ছুটছে কেন? নিশ্চয় ভাল আছে তোর ছেলে।

ঘরে ফিরে শনিচরী বুধুয়াকে জীবিত দেখেনি, বউকে ঘরে দেখেনি। বাচ্চাটা তার ঘরে কাঁদছিল।

বউ আর ফেরেনি। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বুধুয়ার দাহের ব্যবস্থা করা, বউ পালাবার কেচ্ছা চাপা দিতে ছুটোছুটি করা, এই সব করতে গিয়ে বুধুয়ার জন্যেও কাঁদা হল না। কাঁদতে পারত না শনিচরী। কেমন যেন ধন্দ ধরে বসে থাকত। তারপর চোখ বুজে শুয়ে পড়ত।

গ্রামের মানুষ দেইজি-কেজেতে মেতে থাকে। বুধুয়ার মৃত্যুর পর সেই মানুষেরই আরেক রকম চেহারা দেখেছিল শনিচরী। বুধুয়ার ছেলে হরোয়াকে নিয়ে ও হিমসিম খেত। বুধুয়া যে নেই, তাও যেন ভুলে-যেত শনিচরী। কবে যে বুধুয়া ছিল না তাই ওর মনে থাকত না। যখনকার কথা, যতদিনের কথা মনে পড়ে, ততদিনই বুধুয়া ছিল যেন ওর সঙ্গে। শনিচরী যখন মালিক-মহাজনের খেতে কাজ করত, বুধুয়া ঘরদোর সাফ করে জল এনে রাখত নদী থেকে। খেত কুড়োনো মাটি-মাখা গম বা ভুট্টা নদীর জলে ধুয়ে আনত। শান্ত, বুঝদার, দুঃখী মায়ের ছেলে। সব সময়ে থাকত বুধুয়া, কেমন করে শনিচরী মেনে নেবে, যে আর তাকে রাতে উঠে জল গরম করে খাওয়াতে হবে না বুধুয়াকে? স্বপ্নাদ্য মলম মাখাতে হবে না বুধুয়ার বুকে? বুধুয়ার ছেলেটা পড়ে-পড়ে কাঁদত।

একদিন তুলনের বউ, ধাতুয়া লাটুয়ার মা, এ তল্লাটের বিখ্যাত ঝগড়ুটে মেয়েমানুষ, এসে দাঁড়াল। ছেলেটাকে তুলে নিল বুকে।

কি করিস? অ ধাতুয়ার মা?

হরোয়াকে নিয়ে যাই।

কেন?

ধাতুয়ার বউয়ের কোলে ছেলে। তার দুধ খাবে।

কেনে? আমার নাতি, আমি মানুষ করব।

সবাই সবায়ের ছেলে নাতিকে মানুষ করে, তুইও করবি। কিন্তু ধাতুয়ার বাপ বলল, কাজ ধরেছে একটা।

কোথায়?

গোরমেন রেললাইনে মেরামতী করবে। ঠিকাদারের কাছে ধাতুয়ার বাপ ফুরন নিয়েছে, বিশটা মজুর দেবে।

তুই যাবি নাই?

গৈয়া গাভীন্ হায়। তা ছাড়া মালিকের ঘরে পূজা। জঙ্গল সাফাই, রান্নার কাঠ চ্যালা করা—বেগারী কামও আছে।

তুলন গঞ্জু! বহোত্ শানদার খচড়া বুড্ঢা। কাজে মাতিয়ে আমাকে……

সে যা বুঝিস্।

ধাতুয়ার বউয়ের কাছে দুধ খেয়ে প্রাণে বাঁচল হরোয়া। যতদিন ঠিকাদারী কাজ চলে, শনিচরীর ঘরে উনুন জ্বলেনি। শনিচরীর রুটি ও আচার তুলনের সঙ্গেই দিয়ে দিত তুলনের বউ। যত আটা খরচ হয়, সব পরে শোধ করে দেয় শনিচরী। কিন্তু সব ঋণ কি শোধ হয়?

তুলনরা দেখেছিল, পরভু গঞ্জু বলেছিল, একেবারে একলা হয়ে গেলে। সম্পর্কে জ্যেঠাইন্ হও, না হয় তোমার ঘরের দোর-জানালা-চালা এনে আমার উঠোনে ঘর তুলে দিই?

নাটুয়া দুসাদ শনিচরীর উঠোনের সবজি হাটে বেচে দিত। গ্রামের মানুষ সে সময়টা এইভাবে এসে না দাঁড়ালে শনিচরী কি বাঁচত? বুধুয়ার কসবী বউটার কথা কেউ বলত না। তবে শনিচরী জেনেছিল।

হাটে যারা এক টাকায় চার রকম দাওয়াই বেচে, সেই সব দাওয়াইওয়ালাদের একজনই বউকে বুঝিয়েছিল। বউকে গয়া—আরা—ভাগলপুর দেখাবে—নৌটঙ্কী-সিনেমা সার্কাস দেখাবে—রোজ পুরী-কচৌরী খাওয়াবে। সে লোকের সঙ্গেই গেছে বউ।

ছেলেটাকে নিয়ে যায় নি কেন?

শনিচরীর মনে হত, ছোটবেলায় দেখা মোতির মায়ের কথা। মোতিকে নিতে চেয়েছিল মালিক, মোতির মা দেয়নি। মোতি পালিয়ে যায় লাইনের কুলি যোগাবার ঠিকাদারের সঙ্গে। মোতির মা শনিচরীর মায়ের জাঁতায় গম ভাঙতে আসত আর বলত, মালিকের হাতে মেয়ে দিলে তবু দেখতে পেতাম মুখখানা।

শনিচরী তা বলে না। গেল যখন, ওইভাবে হারিয়ে গেছে। সেই ভাল। নইলে মালিকের ঘরে সে থাকত রানী হয়ে। শনিচরী আর হরোয়া বাইরে গোলাম খাটত, সে ভারি অপমানের কথা হত। তা ছাড়া, শনিচরী আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে জানে। বউ ও কাজ করলে গ্রামের লোক তাকে নামে না হলেও কাজে একঘরে করত। তেমন হলে গ্রামে থাকা চলবে না। নিরন্ন ও রাঁকা দরিদ্রের বড দরকার অন্য নিরন্ন রাঁকাদের মদত। সে মদত না থাকলে মালিকের পাঠানো দুধ-ঘি খেয়েও গ্রামে বাস চলে না।

আস্তে আস্তে শনিচরী সহজ ও স্বাভাবিক হল। হরোয়াকে মানুষ করল সাধ্যমত যত্নে। গ্রামের বুড়োবুড়ি, প্রবীণ ও প্রৌঢ়, সবাই হরোয়াকে বলত, বহোত্ দুখ্ কী তোহ রা নানী। উস্কো দুখ্ মত্ দিয়া করো ও হারোয়া।

হরোয়া মাথা নিচু করে শুনে যেত। ওর বয়স বছর চোদ্দ হতে শনিচরী ওকে নিয়ে গিয়েছিল। রামাবতার সিংয়ের ছেলে লছমন সিং এখন মালিক-মহাজন। হাজার। মালিক পরোয়ার। অন্য জমানা এখন। মালিকও নতুন জমানায় নতুন রকম। লছমন সিং খেতমজুর, ছোট জাত ও কিষাণদের শায়েস্তা করতে এখন মস্তান রাখে। ঘোড়া-চড়া, বন্দুক-চালানো মস্তান। রামাবতার লাথ মারত, নাগরা পেটাত।

কিন্তু মন ভাল থাকলে ওদের সঙ্গে গল্পও করত। লছমন সিং বাপের ওসব আচরণকে মনে করে দুর্বলতা। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চলে ও।

শনিচরী তার কাছেই গিয়েছিল। বলেছিল, সবই তো জানো মালিক। শনিচরীর চেয়ে দুর্ভাগী জন্মায়নি কখনো। এই ছেলেটা আমার নাতি। একে একটা কাজকর্ম দাও। নইলে বাঁচব না।

লছমন সিংয়ের বোধহয় মনটা ভাল ছিল সে সময়ে। সে বলেছিল, হাটে আমার দোকানে মাল বইবে। ঝাড়ু-পানি করবে। মাসে দু টাকা পাবে ঔর পেটখোরাকি।

হুজৌর কা কিরপা।

শনিচরী নাতিকে নিয়ে উঠে এসেছিল। মোহনলালের কাছ থেকে ঠাকুরের প্রসাদ এনে মাদুলিতে ভরে, সে মাদুলি গলায় বেঁধে তবে হরোয়াকে পাঠিয়েছিল হাটে।

অনেক কথা বলেছিল।

হাটে অনেকে গরু-মোষ আনে। সেখানে যাস্ না হরোয়া। ভৈষা লাথ মারলে মরে যাবি।

নায় নানী।

কোনো মন্দ লোকের কথা শুনিস না।

নায় নানী।

প্রথম কয়েক মাস খুব মন দিয়ে কাজ করত হরোয়া। মাইনের টাকা দিত নানীকে। জলপানির ছাতু, গুড়, বয়ে-বয়ে আনত। খেয়ে-মেখে চেহারা ফিরেছিল ক্রমে। ক্রমে মন আনচান্ হল। একবার টাকা দিল না, একটা রঙিন গেঞ্জী কিনল। আরেকবার কিনল একটা প্লাস্টিকের মাউথ-অর্গান। সেবার খুব ধমক ধামক করেছিল শনিচরী। তারপর স্বয়ং লছমন যখন বলল, হরোয়া দোকানে থাকে না, সর্বদা ম্যাজিকওয়ালাদের পেছন-পেছন ঘোরে—তখন শনিচরী হরোয়াকে কসে মেরেছিল। বলেছিল, বেচাল করবি তো তোর পা কেটে দেব। ঘরে বসিয়ে খাওয়াব, তবু কুপথে যেতে দেব না।

আবার কিছুদিন মন দিয়ে কজে করল হরোয়া। তারপর পালিয়ে গেল। নাটুয়া এসে বলল, ম্যাজিক ওয়ালাদের সঙ্গে চলে গেছে হরোয়া।

যাক্ গে।

"যাক্ গে" বললেও, শনিচরী ঘরে বসে থাকে নি। হাট থেকে হাটে, মেলা থেকে মেলায় খুব খুঁজেছিল। নাতির জন্যে কাঁদার কথ মনেই হয়নি ওর। এ রকমই যে হবে, তাই মনে হয়েছিল। সেই সময়ে, হরোয়াকে ফিরে পাবার আশা যখন নেই আর মনে, হঠাৎ দেখা বিখ্নির সঙ্গে। বিখ্নি ওর ছোটবেলার খেলুড়ী। কালো কম্বলের ঘাঘরা পরত বলে সবাই বলত কালীকম্লী বিখ্নি। একটা পোঁটলা কাঁধে হনহনিয়ে হাঁটছিল বিখ্নি। হাঁটতে-হাঁটতে শনিচরীর গায়ে ঠেলা দেয় ও অসাবধানে।

কে রে তুই? চোখের মাথা খেয়েছিস?

চোখের মাথা তোর বাপ খেয়েছে।

কি বললি?

ওই তো শুনলি।

চমৎকার একটি যুদ্ধ বাধছিল। শনিচরীর খুব ভাল লেগেছিল। জমাটি ঝগড়া একখানা করলে মনের বহু জঞ্জাল কেটে যায়, সাফ হয়ে যায় সব। ধাতুয়ার মা সেইজন্যেই কাকচিলের সঙ্গেও ঝগড়া করে। ঝগড়া করলে মন ভাল থাকে, শরীর ভাল থাকে, দেহের রক্ত বন্দুকের গুলির মত দমাদম্ চলতে থাকে। কিন্তু দুজনে দুজনের দিকে চাইতেই বিখ্নি বলেছিল, এ কি? তুই শনিচরী না?

তুই, তুই কে?

বিখ্নি। কালীকম্লী বিখ্নি।

বিখ্নি?

হ্যাঁ রে।

তোর তো সেই লোহারডাগাতে বিয়ে হয়েছিল

আজ কতকাল আছি জুজুভাতুতে।

জুজুভাতু? আর আমি থাকি টাহাড়ে? এক বেলার পথ গো, তবু দেখা হয়নি কখনো?

চল্ বসি কোথাও।

দুজনে একটা পিপল গাছের ছায়ায় বসল, দুজনেই দুজনকে আড়ে-আড়ে দেখছিল। দুজনেই নিশ্চিন্ত হল, ওর অবস্থা আমার চেয়ে ভালো নয়। বিখনিরও হাতে-গলায়-কপালে—শনিচরীর মতই – গয়না বলতে উল্কির দাগ অভ্যাস বশে দুজনেরই কানের ছিদ্রে শোলা গোঁজা। শনিচরী ও বিখনি বিড়ি ধরাল। দুজনের চুলই রুক্ষ।

শনিচরী কি হাটে এসেছিলি?

না রে। নাতিকে খুঁজতে এসেছিলাম।

শনিচরী অতি সংক্ষেপে হরোয়ার কথা, নিজের কথা, সবই বলল। বিখনি সব শুনে বলল, দুনিয়া থেকে মায়া-মমতা চলে গেল না কি? না, তোর-আমার কপাল দোষ?

শনিচরী অনেক দুখে হাসল। বলল, স্বামী নেই, ছেলে নেই, নাতিটা যেখানে থাক, প্রাণে বেঁচে থাকুক।

বিখনি বলল, তিন মেয়ের পর এক ছেলে। ছেলের বাপ মরেছে কবে, বিখনিই ছেলেকে মানুষ করেছে, পরের বাছুর পালানি নিয়ে ক্রমে-ক্রমে চারটে গাই, দুটো দুধেলা ছাগল, স-ব করেছে। বিয়ে দিয়েছে ছেলেকে, আবার ছেলের গওনার সময়ে গ্রামকে দই-চিড়ে-গুড় খাইয়েছে মহাজনের কাছে ধার করে।

তারপর?

মহাজন এখন সেই ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি নিয়ে নিচ্ছে। ছেলে যাচ্ছে শ্বশুরাল।

"শ্বশুরাল" বলে বিখনি থুথু ফেলল। বলল, শ্বশুরের ছেলে নেই। আর দুটো জামাইয়ের মত ছেলেও তার গোলাম হবে। বললাম, গরু বেচে ধার শোধ করি। ছেলে গাই-গরু নিয়ে শ্বশুরাল রেখে এসেছে। আমিও বিখনি। আমি ছাগল দুটো এই হাটে বেচলাম। ছেলে জানে না। বাস, ট্যাঁকে কুড়ি টাকা নিয়ে চললাম।

কোথায় যাবি ?

কে জানে ? তোর ছেলে নামে-যশে নেই। আমার ছেলে থেকেও নেই। চলে যাব ডালটনগঞ্জ, কি বোখারো, কি গোমো ? ভিখ মাঙব টিশনে।

শনিচরী নিশ্বাস ফেলল। বলল, আমার সঙ্গে চল্। তুখানা ঘর, যেন হ-হা করছে। ঘরে-ঘরে শোবার মাচান্। বুধুয়া করেছিল। আজও উঠোনে ভিণ্ডি-মিরচা-বাইগন হয়।

আমার টাকা ফুরোলে পরে ?

তখন দেখা যাবে। তোর টাকা তোর থাকুক। শনিচরী এখনো আধপেটা কামাই করে।

তাই চল্। হ্যাঁ রে, জলের সুখ আছে ?

নদী। পঞ্চায়েতী কুয়োটার জল বড তেতো।

একটু দাঁড়া।

আবার হাটে গেল বিখ্নি, ফিরে এল একটু বাদে। বলল, উকুন মারা ওষুধ কিনে নিলাম। মিট্টি কা তেলের সঙ্গে মাথায় ঘষে মাথা ধুয়ে ফেলব। যত মনের জ্বালা, তত কি উকুনের জ্বালা ?

পথ চলতে চলতে বিখ্নি বলল, নাতনিটা হয়তো রাতে কাঁদবে। আমার কাছে ঘুমোত !

শনিচরী বলল কয়েকদিন। তারপর ভুলে যাবে।

শনিচরীর ঘর দেখে বিখ্নি খুব খুশি। তখনি জল ছিটিয়ে ঘরদোর ঝাড়ু দিল। নদী দেখতে গেল, জল আনল এক গমলা। বলল, আজ রাতে উনোন জ্বালব না। রুটি আর আচার নিয়েই বেরিয়েছিলাম।

বিখ্নি ঘোর সংসারী। ত্ব' দিনেই শনিচরীর ঘর ও উঠোন নিকোল ও। সোডা-সাবানে নিজের আর শনিচরীর কাপড় কাচল। কাঁথা ও মাত্থর রোদে দিল। নিজের সংসারের দখল বউয়ের হাতে চলে যাচ্ছিল বলে ইদানিং ও কোন কাজকর্মে যেত না। সেটা অভিমানে, কিন্তু বউ বলত ওর শাশুড়ী কামচোরা। সংসারের নেশা মানুষকে, বিখ্নির মত তুখী মানুষকেও অবাস্তব স্বপ্নাশ্রয়ী করতে পারে। এখানে কতদিন

থাকবে ঠিক নেই, শনিচরীর সংসার—বিখ্নি একদিন কোদাল নিয়ে উঠোন কোপাতে শুরু করল। বলল, একটু খাটলে সবজি হবে খুব।

উকুনের ওষুধে শনিচরীর মাথা থেকেও শরণাগত জীবগুলি নির্বংশ হল। টানা ঘুমে রাত কাটিয়ে উঠে শনিচরী বুঝল, উকুনের কামড়ে ঘুম হত না, মনের জ্বালায় নয়। মনে যত জ্বালা থাকুক, খাটাখাটুনির শরীরে ঘুম আসে।

বিখ্নির টাকায় দুজনে ক'দিন খেল। ওদের টাকাও ফুরোল, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল শনিচরীর। সেদিনই দুলনের ছোট একটা বাছুরকে নেকড়ে ধরে নিয়ে গেল। লাকড়া তাড়াবার উত্তেজনায় সবাই যখন মেতেছে, তখনি খবর এল স্থানীয় আরেক জোতদার ভৈরব সিংকে কে বা কারা যেন, একটি জমিতে কেটে রেখে গেছে। জমিটি গোটা দশেক দেওয়ানী মামলার জন্ম দিয়েছে। ভৈরবের মৃতদেহ ধারণ করে জমিটি ফৌজদারীতে প্রোমোশান পেল। গ্রামে সবাই সব জেনে যায়। সবাই জানল, ভৈরবের বড় ছেলেই খুনটি করিয়েছে। বৈমাত্র্য ভাইদের প্রতি বাপের অত্যধিক স্নেহাধিক্য দেখে সে নিজের আখের বিষয়ে স্বাভাবিক কারণেই দুশ্চিন্তিত হয়েছিল। ভৈরবের বড় ছেলে পিতৃহত্যার দায়ে সৎ ভাইদের নামে মামলা আনবে বলে শাসাল। সৎ ভাইরা দাদার নামে মামলা করবে বলে লছমন সিংয়ের মদত চাইতে গেল। লছমন বলল, চল, আমি যাচ্ছি। জমিটিতে তারও সবিশেষ লোভ ছিল।

অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে লছমন অকুস্থলে দেখা দিল। ছেলেদের লজ্জা দিয়ে সে মর্মভেদী দুঃখে বলতে লাগল, হায় চাচা! রাজা তুমি, স্বঘরে মরবে। আজ কেন তুমি মাটিতে পড়ে আছ? কিসের দুঃখ তোমার?

ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা কি মানুষ? কে মেরেছে তা দিয়ে কি হবে? চাচা যে মরে গেল সেটাই হল প্রধান ও শেষ কথা। হায় চাচা! তুমি থাকতে ছোট জাত কখনো মাথা তোলে নি। দুসাদ

গঞ্জুর ছেলে তোমার ভয়ে পড়তে যায় নি সরকারী স্কুলে। আজ কে সে-সব দেখ্‌ভাল্‌ করবে?

ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, এখন আসল কাজ হল চাচার সম্মান রেখে সদ্‌গতি করা। ওঁকে ঘরে নাও, পুলিসকে খবর দাও। লেকিন সেখানে কোনো নাম উঠাবে না। লাশ তোহ্‌রি যাবে না চেরাই ফাড়াই হবে না। যে ভাবে চাচা মরলেন, ও হো হো, বীরের মৃত্যু! কিন্তু যে ভাবে চাচা মরলেন, সে ভাবে তো তাঁর মরার কথা নয়? মানুষ অনেক কথা বলবে। তাই সদ্‌গতি আর কিরিয়া কাজ উচিত শোর মচাকে কর। চাচাকে বড পালঙ্কে সাজিয়ে রাখো ঔর আমাদের রাজপুত সমাজকে খবর দাও।

তারপর ছেলেদের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে বলল, নিজেদের বিবাদ ভুলে যাও। আমার বাবা নেই। চাচা গেল তো ইন্দ্র পতন হল। আমাদের সমাজের সকলকে ডাকো। এখন নিজেদের বিবাদ উঠাবার সময় নয়। মখ্‌খন সিং, দৈতারি সিং, গোল পাকাবার মানুষ অনেক আছে।

লছমন সিং এই কাজে মেতে থাকল বলে শনিচরী তাকে ঘরে পেল না। ঘরে এসে গালে হাত দিয়ে বসল ও। তারপর বিখ্‌নিকে বলল, চল্‌, ঢুলনের কাছে যাই। টেঁটিয়া বুড়া, বহোত কিরকিচা আদমি। কিন্তু দিমাগটা খুব সাফাই। ও ঠিক একটা পথ বাতলাবে।

সব শুনে মেলে ঢুলন বলল, কামাইয়ের পথ থাকতে উপোস করে মরে কে?

—কৈছন কমাই?

—বুধুয়ার মা। কামাইয়ের পথ কি থাকে? মালিক-মহাজনের থাকে, দুসাদ-গঞ্জুর থাকে? পথ তৈরি করে নিতে হয়। কত টাকা নিয়ে এসেছিল সহেলী?

—বিশ টাকা।

—বি-শ-টা-কা?

—হ্যাঁ। আঠারো টাকার খেয়েছি।

—আমি হলে এ টাকা হাতে থাকতে থাকতে স্বপ্নে মহাবীরজী পেতাম।

—কা বোলত্? হাঁ লাটুয়াকে বাপ?

—কায়? হমানি কে বোল সমঝত্ নায়?

—কা বোলত্?

—টাকা হাতে থাকতে-থাকতে কুরুডা নদীর পাড় থেকে আমি একখানা ভাল পাথর আনতাম। তাতে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে বলতাম, স্বপ্নে মহাবীরজী পেয়েছি।

—আমি যে ছাই স্বপ্নই দেখি না।

—আরে মহাবীরজী পেয়ে গেলে দেওতার ল্যাজ ধরে স্বপ্ন আপ্সে আসত?

—হায় বাবা!

—তোকে সবাই চেনে। তোকে দিয়ে জুত হত না। তোর সহেলী নতুন মানুষ, ও বললে আমরা মেনে নিতাম। তারপর মহাবীরজী নিয়ে তোহ্রির হাটে বসতিস? প্রণামী মিলত?

—দেওতাকে নিয়ে খচড়াই? এমনিতেই মহাবীরজীর চেলাদের জ্বালায় গাছে ফল থাকে না।

—খচড়াই মনে করলে খচড়াই। নইলে খচড়াই কিসের? তোর হল মহাপাপীর মন। তাতেই ভাবছিস খচড়াই।

—কৈছন? আঁ লাটুয়াকে বাপ?

—কৈছন? বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—বল?

—লছমনের মা বুড়ির বাত রোগ আছে?

—জরুর।

—তিনি আমাকে দশ টাকা দিয়ে বললেন, চাস থেকে দৈবী তেল এনে দে। চাস ভি গেলাম না. ঘর থেকে তেল ভি দিয়ে এলাম দু দিন বাদে, তব্ ভি খচড়াই হল না, কেন কি আমার মনে কোই খচড়াই না থায়। সে তেল মাখল কাল, আজই বুড়ি লোটা নিয়ে আড়র খেতে

পায়খানা করতে গেল। মন চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা। দেখ, বুধুয়াকে মা? পেটের চেয়ে বড় ভগবান নেই। পেটের জন্যে সব কাজ করা যায়, রামজী মহারাজের বাত।

ঢুলনের বউ ওপাশ থেকে বলল। বুঢ়া যদি মালিকের খেত থেকে কুমড়ো ছিঁড়ে আনে, তখনো বলে, এ রামজী মহারাজের বাত।

বিখ্নি বলল, আমাদের বিপদ। তার আসান কিসে হবে? বুদ্ধি দাও একটা, আমরা দুই বুড়ি।

—বারোহি গ্রামের ভৈরব সিং মরেছে?

—হাঁ। ছেলে বাপকে মেরেছে।

—তাতে তোমাদের কি? টাকার ঘরে মা ছেলেকে মারে, ছেলে মাকে মারে। যে মরবার সে মরেছে। আমাদের ঘরে মরলে আপনজন কাঁদে। ওদের নাতেদাররা সিন্দুকের কুঞ্জি সামলায়। কাঁদার কথা ভুলে যায়। যাক, আমাদের মালিক গিয়ে মাথা দিয়েছে। এখন ভৈরবের লাশ দাহ হবে। কাল দুপুরে লাশ বেরোবে। ওদের চাই রোনেবালী রুদালী। দুটো রাণ্ডী এনেছে। মালিক-মহাজন মরলে রাণ্ডী আসে কাঁদতে। রাণ্ডী দুটো হয়তো ভৈরবেরই ছিল কবে, এখন শুকনো কাক। তারা জুতের নয়। তোরা যা, কাঁদবি, লাশের সঙ্গে যাবি। টাকা পাবি, চাল পাবি। কিরিয়া কাজের দিন কাপড় ঔর খাবার পাবি।

শনিচরীর ভেতরে যেন ভূমিকম্প হল। সে বলল, কাঁদব? আমি? তুই জানিস না? কান্না আসে না আমার চোখে? দু চোখ জ্বলে গেছে আমার?

দুলন নিস্পৃহ কঠিন গলায় বলল, বুধুয়াকে মা? যে কান্না তুই বুধুয়ার জন্যে কাঁদিস নি, তা কাঁদতে বলছি না তোকে। এ হল রুজির কান্না। দেখবি, যেমন করে গম কাটিস, মাটি বয়ে নিস, তেমনি করে কাঁদতেও পারছিস।

—আমাদের নেবে কেন?

—দুলন আছে কেন? ভাল মত রুদালী না পেলে ভৈরবের মান

থাকবে কেন? মালিক-মহাজন লাশ হয়ে গেলেও তার সম্মান চাই। ভৈরবের বাপ, রামাবতার, এরা যে রাণ্ডীদের রাখত, তাদের দেখ্‌ভাল্ করত। সেই মমতায় রাণ্ডীরা এসে কেঁদে গিয়েছিল ওরা মরলে। ভৈরব, দৈত্তারি, মথ্‌খন, লছমন এদেরও রাণ্ডী আছে। কিন্তু খেতমজুর ঔর রাণ্ডী, সকলকে এরা পায়ের নিচে রাখে। তাতেই রুদালী জোটে না। খতরনাক খচড়াই সব! সবসে হারামি য়ো গম্ভীর সিং। রাণ্ডী রাখল, সে ঘরে মেয়ে হল। রাণ্ডী থাকতে মেয়েকে হুধে-ঘিয়ে রাখত। রাণ্ডী মরতে মেয়েকে বলল, তোকে পুষব না আর। রাণ্ডীর মেয়ে রাণ্ডী, কাজ করে খা গিয়ে।

—ছি ছি!

—সে মেয়ে তো তোহ্‌রিতে রাণ্ডী বাজারে পড়ে আছে। পাঁচ টাকার রাণ্ডী এখন পাঁচ পয়সার রাণ্ডী। ভাল কথা, বুধুয়ার বউও তো তোহ্‌রিতে। ওই এক হালত্।

—তার কথা কে শুনতে চায়?

হুলন বলল, কালো কাপড় পরবি।

—তাই তো পরি।

হুলনই ওদের নিয়ে গেল। যেতে-যেতে, বিখ্‌নি বলল, এ রকম কাজ মাঝেমধ্যে, তারপর মালিকের খেতী কাম জুটে তো ভাল, নয় পাথর ভাঙার কাজ,—হুটো পেট চলে যাবে।

শনিচরী বলল, গাঁয়ে কথা হবে না?

—হলে হবে।

ভৈরব সিংয়ের গোমস্তা বচ্চনলাল হুলনকে চিনত। লছমন ওকেই শবযাত্রার আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থার ভার দিয়েছে। সব কিছু ইন্তেজাম করা চারটিখানি কথা নয়। বচ্চনের নিজের সংসারে হুটো কোদাল, একটা আলনা আর পেতলের বাটলোই দরকার হুখানা। এগুলো কিরিয়া কাজের ফর্দে ঢোকাতে হবে, মহা হুশ্চিন্তা। শনিচরীদের দেখে ও হালে পানি পেল। বলল, তিন টাকা করে পাবি।

দুলন বলল, মহারাজ মরে গেল, তার রুদালী তিন টাকা? পাঁচ টাকা হুজৌর।

—কেন?

—যা কাঁদবে হুজৌর, শুনলে আপনি বখশিশ দেবেন। লছমনজী বলেছেন, দশ-বিশ যা লাগে, কাঁদবার লোক চাই। এ বাবদে দুশো টাকা মঞ্জুর আছে।

গোমস্তা নিশ্বাস ফেলল। দুলন কেমন করে সব খবর জানতে পারে কে জানে।

—পাঁচ টাকাই দেব। যা, বাইরে গিয়ে বোস্।

—ঔর চাল ভি দেবেন এক পাই।

—গম দেব।

—চাল দেবেন হুজৌর।

—দেব।

—এখন এদের জলপানি দিন পেট ভরে। ভাল করে না খেলে কাঁদতে পারবে কেন?

—দুলন! কটা হারামি মরে তুই জন্মেছিলি তাই ভাবি। যা, বাইরে যা। জলপানি দিচ্ছি।

ভৈরব সিংয়ের বড় ভৈরবী বলে পাঠালেন, যারা রুদালী, তাদের পেট ভরে চিড়ে-গুড় দাও। প্রসাদের বাপ কোনো জিনিসের অভাব রেখে যান নি।

পেট ভরে চিড়ে-গুড় খেতে-খেতে শনিচরী বুঝল, কান্না বেচে তাকে খেতে হবে বলেই চোখের জল তোলা ছিল।

রাণ্ডী দুজন প্রথমে এই দেহাতী বুড়িদের আমল দেয় নি। কিন্তু শনিচরী ও বিখ্নি এমন তারস্বরে কাঁদল, এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলল ভৈরব সিংয়ের গুণের কথা, যে বাজারী রাণ্ডীরা ঘোল খেয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে গেল শনিচরী ও বিখ্নি। কাঁদতে কাঁদতে ফিরল। এ দিনে নগদ বিদায় পাঁচ টাকা ও আড়াই সের চাল একেকজন। বচ্চন বলে দিল, কিরিয়ার দিন আবার আসবি।

—জরুর আসব হুজৌর।

কিরিয়ার দিন মিলল কাপড় ও খাবার। পুরী-কচৌরি-বেসনের লাড্ডু। শনিচরী ও বিখ্নি খাবার বেঁধে নিয়ে গেল বাড়ি। শনিচরী তুলনের বউকে কিছু দিয়েও এল। তুলন সব খবরাখবর নল। বলল, বচ্চন হারামি এ বাবদে দুশো টাকা পেয়েছিল। কুড়ি টাকায় কাজ সারল।

—সে তো হবেই লাটুয়াকে বাপ।

—তোর সহেলীকে বলে দে, হাটে যায়-আসে নিয়মিত। হাটে যাবে, সব দোকানই মালিক-মহাজনদের। দোকানে-দোকানে ঘুরলেই খবর পাওয়া যাবে মালিকদের ঘরে কার অসুখ, কে মরছে। নইলে খবর মিলবে না। এরপর যেখানে যাবি, সেখানে বলবি, আমিই ঔর-ঔর রুদালী এনে দেব।

—কৈছন?

—তোহরি যাবি। রাণ্ডী বাজার।

—হায় ভগবান!

—তোর সহেলী যাবে?

বিখ্নি বলল, যাব।

তুলন বলল, এত রাণ্ডী কি ছিল? এইসব রাজপুত মালিক-মহাজন চারদিকে? তাতেই রাণ্ডীর ছড়াছড়ি।

তুলনের বউ বলল, রাণ্ডী চিরকাল আছে।

—না, চিরকাল এখানে ছিল না। যত মন্দ জিনিস সব ওরা এনেছে। ওরাও চিরকাল আছে।

—না, আগে ছিল এ মুলুক, ছোটনাগপুরের রাজাদের এক শরিকের। তখন এখানে পাহাড়, জঙ্গল, ঔর আদিবাসী লোকদের টোলি। তখন, সে অনেক অনেক আগে। তাই তহশীলে কোল লোকরা বলোয়া করে।

তুলন যে কাহিনীটি বলে, তা খুবই দ্যোতক এবং কেমন করে দুর্ধর্ষ রাজপুতরা এই আদিবাসী ও অন্ত্যজ অধ্যুষিত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে

জমিদার থেকে শুরু করে জোতদার-মহাজন, মালিক পরোয়ার হয়ে বসে, তা বোঝার পক্ষে খুবই সহায়ক। এই রাজপুতরা ছিল ছোট-নাগপুরের রাজার শরিকের সেনাবাহিনীর লোক। শ' দুয়েক বছর আগে, এদের নানাবিধ অত্যাচারে অতিষ্ঠ কোলরা বিদ্রোহ করে। কোল বিদ্রোহ দেখা দিতে না দিতেই রাজা দেন এদের লেলিয়ে। কোল বিদ্রোহ দমন করার পরেও এদের সামরিক জোশ কমে না। এরা মেরেই চলে নিরীহ কোলদের। জ্বালিয়ে চলে শান্ত গ্রামগুলি। হরদা এবং ডোনকা মুণ্ডা তখন আবার কাঁড়ে শান দিতে থাকে। আবার কোল বিদ্রোহ ঘটার উপক্রম ঘটে। তখন রাজা এই রাজপুতদের নামিয়ে দেন বসতিবিরল টাহাড় অঞ্চলে। বলে দেন, মাথার ওপর তরোয়াল ঘুরিয়ে ছোঁড়। যতদূর গিয়ে তরোয়াল পড়ল, ততদূর অবধি জমির দখল নাও। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি তরোয়াল ছুঁড়ে চল। তোমরা সাত সর্দার, এইভাবে যত জমি পেলে, তত জমি নিয়ে চাষবাস কর।

তখনি রাজপুতরা নেমে পড়ে টাহাড়ে এবং সেই থেকে এখানে ওদের জোত। শতক থেকে শতকে এদের জোতজমা বেড়েছে বই কমেনি। এখন এরা জোতজমা বাড়ায়, তবে তরোয়াল ছুঁড়ে নয়। বন্দুকের গুলি মানুষের গায়ে ছুঁড়ে এবং জ্বলন্ত মশাল মানুষের বসতিতে ছুঁড়ে দিয়ে। এখন এ অঞ্চলে যারা আছে, তারা পরস্পরের সঙ্গে একদিন সম্পর্কিত ছিল, আজ সম্পর্কের সূত্র ক্ষীণ। তবে পদমর্যাদায় সবাই সমান হতে চায়।

জীর্ণ খাপরার চাল-শোভিত মলিন মেটে বাড়ির টোলিতে অন্ত্যজদের বাস। আদিবাসীদের বসতিও গরীব চেহারার। এর মাঝে-মাঝে মালিকদের বিশাল মকান। মালিকদের মধ্যে মামলা ও রেষারেষি থাকতে পারে, কিন্তু মালিকশ্রেণী কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এক। লবণ, কেরোসিন, পোস্টকার্ড ছাড়া এদের প্রায়ই কিছু কিনতে হয় না। হাতি, ঘোড়া, মহিষ বাথান, উপপত্নী, জারজ সন্তান, উপদংশ বা অন্য যৌন ব্যাধি—"বন্দুক যার জমি তার" বিশ্বাস সকলেরই অন্নবিস্তর

আছে। গৃহবিগ্রহ আছে অগুনতি। দেবতারা এদের সমর্থক। এরা সকলেই গৃহবিগ্রহদের নামে জমি দেবত্র করে রেখেছে। আবার ব্যক্তি হিসেবে আলাদা বৈশিষ্ট্যও আছে। দৈত্যারি সিংয়ের পায়ে ছয়টা আঙুল। বনোয়ারি সিংয়ের বউয়ের গয়লাদোষ। নাথুনি সিংয়ের বাড়িতে স্টাফ করা বাঘ।

এদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তুলন বলল, এদের মান সম্মান রাখতে রুদালী ঔরত চাই। বাস্, লাইন ধরিয়ে দিলাম, এখন ড়ে যা।

শনিচরী ও বিখ্নি মাথা নাড়ল। ওদের জীবনে সহজে কিছু মেলে না। ভুট্টার ঘাটো ও নিমক যোগাড় করতে জান নিকলে যায়। কি সন্তানজন্মে, কি স্বামীমরণে এরা মহাজনের কাছে বাঁধা। স্বশ্রেণীর কাছে মান রাখবার জন্যে এরা মৃত্যু নিয়ে বর্বর খরচ করে। সে খরচের কিছুটা শনিচরীর ঘরেও আসুক।

শনিচরী ও বিখ্নি লড়ে গেল। সবই লড়াই এ জীবনে। বিখ্নি এ গ্রামের মেয়ে নয়। কিন্তু আশ্চর্য সহজে ও গ্রামজীবনের একজন হয়ে গেল। ফসল বোনা ও কাটার সময়ে ফুরোন খেতমজুর খাটল লছমনের কাছে। অন্য সময়ে চলে গেল হাটে-বাজারে, বাস স্টপের দোকানে। ওই খবর আনলে কে মরছে মালিক বাড়িতে। কার শ্বাস উঠেছে। তারপর দুজনে কালো থান কেচেকুচে নিল। সেই থান পরল। আঁচলে বেঁধে নিল আটা-ভাজা চুরন।

সেই চুরন খেতে-খেতে দুই বুড়ি হনহনিয়ে হাজির মালিক-বাড়ি। মালিকের গোমস্তার সঙ্গে কথা বলল শনিচরী। কথার বয়ানও বাঁধা।

কান্না যা কাঁদব হুজৌর, তাতে রামনাম শোনা যাবে না। পাঁচ টাকা করে নেব, ঔর চাল। কিরিয়াকাজের দিন খাবার নেব, কাপড় নেব। দর কষবেন না, দর কমবে না। আরো রুদালী চান তো এনে দেব।

গোমস্তাও মেনে নিল সব। না নিলে উপায় কি? ভৈরব সিংয়ের শবযাত্রায় এদের দেখার পর সবাই এদেরই চায়। এরা পেশাদার।

দুনিয়াদারী এখন শৌখিনের নয়, পেশাদারের। খেতমজুরদেব হিসেব নয়-ছয় করতে, চক্রবৃদ্ধি সুদের অঙ্ক বাড়াতে গোমস্তাদের দক্ষতা। দশ টাকা মাস মাইনেতেই তাদের চাষ-গেরস্তী, হাল-বলদ, চাইলে একাধিক বউ। অনাত্মীয় মৃতের জন্যে কাঁদাও পেশাদারী কাববার। এ কারবারে বড-বড শহরে পেশাদারী বেবুশ্যেরা লডে যায়। শনিচরী এ অঞ্চলে এ পেশায় এসেছে। জায়গাটি শহর নয়। তোহরিতে বেবুশ্যেও অগণন নয়। তাই শনিচরী যা বলবে মানতে হবে।

শুধু কাঁদলে একরকম রেট।

কেঁদে লুটোলে পাঁচটাকা এক সিকে।

কেঁদে লুটিয়ে মাথা ঠুকলে পাঁচ টাকা দু সিকে।

কেঁদে বুক চাপডে শ্মশানে গিয়ে শ্মশানে লুটোপুটি খেলে ছয় টাকা দিতে হবে।

কিরিয়াতে কাপড় চাই। সে কাপড় কালো থান হলেই ভাল।

এ হল রেট। তারপর, বাজালোক তুমি, চালের সঙ্গে ডাল-নিমক-তেল দিলে না হয়? লক্ষ্মী বেঁধেছ ঘরে, ও চাল-তেল তোমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু শনিচরী তোমার নামযশ গাইবে দিকে-দিকে।

সুন্দর চলতে লাগল কারবার। ভৈরব সিংয়ের শবযাত্রায় যারা কেঁদেছিল, তাদের আনাটা যেন মানের লড়াই হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে লালা এবং সাউরাও ডাকতে লাগল শনিচরীকে। গোকুল লালার বাবা মরতে গোকুল বলেছিল, কিরিয়া অবধি রোজ আসবি যাবি শনিচরী।

রোজই গোকুল ওদের ছাতু ও গুড় দিত। বলত তোদের দিলে পুণ্য হবে।

গোকুল কাপড়ও দিয়েছিল ভাল। মালিক-মহাজনদের মত সবচেয়ে সস্তার জন্তা কাপড় খোঁজেনি। বিখনি সে কাপড় দুটো হাটে বেচে দেয়।

গোকুলের বাড়ি পাওনাথোওনার কথা শুনে দুলন বলল, এ বেশ ভাল কথা মনে হল। এরপর যেখানে যাবি, সেখানে কিরিয়া পর্যন্ত

যাওয়া আসাটা রাখিস। রুদালী দেখলে তারাও কিছু না কিছু দেবে। এ সময়ে কেউ অত হিসাব কষে না।

—হ্যাঁ, তারাও দেবে!

শনিচরী অবজ্ঞা জানাতে তামাকের ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, নিজের বাপ-ভাই মরলে চোখে জল পড়ে না, কিরিয়াব খরচের হিসাব কষে? গঙ্গাধর সিংয়ের মত লোক জেঠা মরতে মুর্দায় ঘিউ মাখাল না, ডালদা মাখাল তা জান?

—ওরা নিজেরা কাঁদলে তোদের কি হবে?

—একটু কাঁদতে ত পারে।

—যাক। কাজের কথা শোন্।

—বল।

—বড়লোকের কাণ্ড! নাথুনি সিংয়ের মা কিন্তু মরছে। নাথুনির ঘর তো দূরে। নাথুনি বলেছে তোদের পাত্তা লাগাতে।

—মরছে! মরে নি তো।

—আরে নাথুনির কথা শুনলে তবে বুঝবি ওদের মনে কত পাপ থাকে। নাথুনি সিংয়ের যত জমিজমা সবই তো ওর মায়ের দৌলতে। ওর মা কে, তা জানিস?

—না। তোমার মত এ তল্লাটের সকলের কুলুজি কুষ্ঠির খবর কে রাখে তাই বল?

—ওর মা হল পরাক্রম সিংয়ের একমাত্র বেটি। পরাক্রম সিংয়ের জুলুম ছিল কত। যখন ছোট ছিলাম, তখন দেখেছি খাজনাই জুলুম উঠিয়ে ওর প্রজা বুড়ো হাঁথিরাম মাহাতোকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে, ঘোড়া ছুট করিয়ে পরাক্রম সিং হাঁথিরামকে মেরে ফেলে।

—আমিও শুনেছি।

—পরাক্রমের সব সম্পত্তি পায় নাথুনির মা। সেই মার দৌলতে ওর যত বোলবোলা আর গরম। সেই মা আজ কতদিন খাঁখীর ব্যামোতে ভুগছে। কাশলে তাজা খুন ওঠে। রোগ না কি খুব ছোঁয়াচে।

—না না, বুধুয়ার তো হয়েছিল।

— বুধুয়া ছিল ভাল লোক। নাথুনির মা নিশ্চয় মন্দ লোক?

— সে যাক্ গে। কি বলছিলে?

নাথুনি এমন যোগ্য ছেলে, যে মাকে উঠোনের ওপাশে একটা ঘর তুলে তাতে রেখে দিয়েছে। খাটিয়ার সঙ্গে একটা রামছাগল বেঁধে রেখে দিয়েছে, বাস্ ওহিতক্ ইলাজ্। না হেকমী না কবিরাজী বৈদ্য চিকিৎসা, না ডাক্তারী সুঁই-ইলাজ। এখনো বুড়ি বেঁচে। নাথুনি চন্দন কাঠ, শাল কাঠ আনাচ্ছে খুব ধুম উঠাকে মাকে জ্বালাবে। মা মরলে কিরিয়াতে দানের কাপড় আসছে গাঁট-গাঁট। কিরিয়াতে ব্রাহ্মণকে খাওয়াবে বলে ঘি-চিনি-ডাল-আটা এনে মৌজুদ করছে। বাসনও দেবে, বাসন আনাচ্ছে।

— হা ভগবান, এখনো তো মরেনি।

মা সারাদিন হেগে-মুতে পড়ে থাকে। বিকেলে একবার মোতি দুসাদিন সাফ করে দেয়। এখন দুসাদিন ছুঁলে মায়ের জাত যাচ্ছে না! একটা দাই ঠিক করেছে। সে রাতে বুড়ির ঘরে ঘুমোয়। মা বেঁচে আছে, তাঁকে বাঁচাতে একটা টাকা খরচ করবে না, কিন্তু মাকে দাহ করতে, মায়ের কিরিয়া করতে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করবে নাথুনি।

—তাই বলছে?

—খুব চিল্লাচ্ছে। তাই তো বলি, ওদের উলটা হিসাব। জীন্দা মানুষকে দেখবে না। মরে গেলে ধুমধামে কিরিয়াকাজ করে মান উঠাবে। এই শীতে বুড়ির গা থেকে রেজাইটা টেনে নিয়ে কাঁথা দিয়েছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি মরলে নাথুনি বাঁচে। এদের বাড়ি নিয়মিত যাস কিরিয়া অবধি।

—যদি কিছু না দেয়?

— দেবে রে দেবে। না দিলে নাথুনি গোকুল লালার কাছে হেরে যাবে না? নিন্দে হবে ওর জাতভাইদের কাছে।

কথায় বলে মাঘের শীত বাঘের গায়ে। মাঘের শীতে ঠাণ্ডা লেগে নাথুনির মা মরে যায়। কিরিয়া অবধি যায়-আসে শনিচরী। নাথুনির

তিন বউ। বড় বউ বিরস বদনে শনিচরীদের আটা ও গুড় দেয় রোজ। বলে, বুড়ো হয়ে মরেছে, তার কিরিয়াতে অত খরচ কেন?

নাথুনির মেজ বউ অত্যন্ত ধনী জোতদারের একমাত্র মেয়ে। ধনী জোতদারের একমাত্র মেয়েকে বাপ বিয়ে করেছিল বলে নাথুনি মাতৃধনে ধনী। সেও অনুরূপ বিয়ে করতে চেয়েছিল। কপাল মন্দ, বড় বউ ও ছোট বউ একতমা নয়। একতমা একা মেজবউ। সে আবার স্বামীর ঘরকে গরীবের ঘর মনে করে ও সতীনদের বিষনজরে দেখে। রাগের কারণ হল বড় ও ছোট বউ ছেলের মা, সে মেয়ের মা। অতএব লোকচক্ষে হেয়। বড় বউয়ের কথা শুনে সে ধারাল হেসে বলে, কিরিয়াতে তিরিশ হাজার টাকা কি একটা টাকা হল? শত বছর বাঁচুন আমার বাপ, কিন্তু তিনি মরলে দেখিয়ে দেব কিরিয়া কাকে বলে।

বড় বউ বলে, তা তো খরচ করতেই হবে। তোর পিসির নাপিত দোষ হয়েছিল সে কলঙ্ক ঢাকতে হবে না?

—হাশালে দিদি। আমার পিসির নাপিত দোষ? আমার পিসের নাম যে গয়া শহরে সবাই জানে। তোমার বোন যে ভাশুরের ঘর করে বিধবা হয়ে, সে কথা তো বলছ না?

এই থেকে তুমুল কলহ বাধে। কিন্তু মেজ বউ পুণ্যবতী। তার কথা ভগবান শোনেন এবং বসন্ত রোগে মরতে বসে মেজ বউয়ের বাপ। মেজ বউ শনিচরীকে ডেকে পাঠায়। বলে শনি মঙ্গলের মড়া দোসর খোঁজে এ কথা সত্যি। নইলে শাশুড়ী মরল, সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবার চেচক হল কেন? শোন্ শনিচরী, এই একটা টাকা বখশিশ।

—চেচক?

—হ্যাঁ রে।

শনিচরী খুবই ন্যাকা সাজে ও বলে, তবে যে শুনি আপনাদের, উচা জাতের. চেচক হয় না? চেচক হয় শুধু নিচু জাতে? আমাদের ঘরে? সেইজন্যে তো আমরা গোরমেনের টিকা ভি নিই, ওর দেওতার পূজাও লাগিয়ে দিই।

—গোরমেনের টিকা গোরক্ত।

এ কথা বলেই নাথুনির মেজ বউ টিকা প্রসঙ্গে ছেদ টানে ও বলে, তুই তো তখন ছিলি ? বড বউয়ের সঙ্গে আমার গরম-গরম কথা হল ? তা, যে কথা সে কাজ আমার। বাপ বিনে কেউ নেই আমার। এখানে বাস করি শত্রুপুরীতে। ছেলের মা যারা, তাদেরই আদর যত, আমি তো মেয়ের মা।

—আপনারও আদর আছে।

—সে কি আমার আদর ? আমার বাপ মোহর সিংয়ের টাকার আদর। বাপ আমাকে দূরে বিয়ে দিতে চায়নি, তাতেই তো সতীনের ঘর করছ। নইলে চৌহান রাজপুত আমরা, এ ঘরে বিয়ে হয় ;

— কপালে যা লেখা আছে।

—তাই সত্যি রে। শোন্‌, আমি চললাম বাপের কাছে। তুই আর বিশ্‌নি তো যাবি, আরো বিশটা রাণ্ডী নিয়ে যেতে হবে। তাদের দেব একশো টাকা, ঔর চাল। তোদের তুজনের পঞ্চাশ টাকা ঔর চাল। কিরিয়াতক্‌ ওখানেই থাকবে. খাবদাবি, ঔর কিরিয়াতে কাপড়লত্তা নিয়ে তবে আসবি।

—হুজুরাইন, আপনার বাবা তো মরেন নি।

—পচে গেছে গা, খুব জোয়ান দেহ অত তুধ-ঘি খাওয়া শরীর। অমন শরীর ছেড়ে প্রাণ বেরোতে চায় ? আমার শাশুড়ী মরতে তোদের মোটা চাল, খেসারির ডাল দিয়েছিল।

—ঔর তেল, লবণ, মির্চা।

—কত দিয়েছিল তা আমি জানি না ? আমার বড় সতীনের হাতটা যে কত বড়, সে কি আমার জানা নেই ? আমি দেব চাল, ডাল, তেল, লবণ. আলু আর গুড়।

—হুজুরাইন গরিবের মা-বাপ।

—তবে হ্যাঁ, কান্নার মত কান্না হওয়া চাই।

—কাঁদব, ঔর মাটিতে লুটাব ?

—মাটিতে লুটাবি।

—মাটিতে লুটব, ঔর মাথাও ঠুকব ?

—মাথাও ঠুকবি।

—কপাল কেটে যাবে।

—আরো পাঁচ পাঁচ তোদের দুজনের? টাকাটা কোনো ব্যাপার নয় শনিচরী। আমার বাপের দাহ ঔর কিরিয়া এমন হবে, যে গল্প রয়ে যাবে মুল্লুকে। দেখে আমার স্বামী আর সতীনরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে। আমি এক বাপের এক মেয়ে। বাপ যা রেখে যাচ্ছে, তার মান রেখে কিরিয়া-দাহ করে দেখিয়ে দেব। রোজ রুপোর গেলাসে দুধ খেয়েছে, জওয়ানীতে রাণ্ডী রেখেছে, বুড়ো হলেও রাণ্ডী রেখেছে। বিলাইতী বিনে মদ খায়নি। আমাকে দুঃখ দেবে নতুন বউ, তাই মা মরে গেলে বিয়ে করেনি।

—কিছু টাকা দিন, বাজারী রাণ্ডী লোগ্‌কে আগাম দিতে হবে। ওরা কি কম খচড়াই?

—নে।

সমগ্র ব্যাপারটি বহুমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মালিক-মহাজনের ঘরে মানুষ মরলে দাহ কিরিয়াতে যত খরচ হয়, তার মান নিমেষে উঠে যায়। রুদালীদের সম্মানও ওঠে। ফলে বরাদ্দের বাইরে যে খরচ হয়, তা তুলে নেয় মালিকরা দুসাদ, ধোবি, গঞ্জু, কোলদের ঘাড় ভেঙে। সর্ব অর্থেই মোহর সিংয়ের অন্ত্যেষ্টি গল্প কথা হয়ে দাঁড়ায় এবং খরচের সিংহভাগ নিয়ে যায় ব্রাহ্মণরা। নাথুনির বউ আর স্বামীগৃহে ফেরে না। শ্বশুরের সম্পত্তি যাতে নাথুনি না পায়, সেজন্যে মেয়েদের বিয়েতে অসাগর খরচ করতে থাকে। অবশ্য তা কয়েক বছর বাদে।

শনিচরী তার সৌভাগ্যের কথা দুলনকে বলল। দুলন কচকচ করে বিশ্রী হেসে বলল, কলিয়ারিতে সবাই ইউনাইন করে। তা রুদালী ঔর রাণ্ডীদের নিয়ে তু ভি ইউনাইন বনা দে এক? তু বন্ যা পিসিডেন!

—হায় রাম!

—এখন বাজারিয়া রাণ্ডী খোঁজ গে?

—কৈস্‌ন?

বিশ্‌নি হুঁকো নামিয়ে বলল, এনে দেব রাণ্ডী। মালিক-মহাজন যত মেয়েকে নষ্ট করে তারা রাণ্ডী হয়।

—দূর, ওরা একটা আলাদা জাত।

—না না। তুই জানিস না।

—তোহরিতে হাটবারে গেলে মেলাই রাণ্ডী।

দুলনের কি মনে পড়ল, বলল, আরে শনিচরী, নওয়াগড়ের গম্ভীর সিংকে জানিস?

—বাবা! তা জানব না? হাঁথি চড়ে সে দেওয়ালীর মেলায় ঘুরে? এই এত বড় নাক আর গলায় মাগ।

—খুব খারাপ কাজ করল।

—নতুন কি কাজ করল?

—ওর তো বাঁধা রাণ্ডী মোতিয়া। তাকে বউয়ের সম্মানে রেখেছিল। মোতিয়ার মেয়ে গুলবদনকে রূপার মল পরিয়ে কোলে নাচাত। মোতিয়া মরে যেতে গুলবদনকে সাদী দেবে বলেছিল। আজ দেখি সেই গুলবদন তোহরি যাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। বলল, জনম দিতে জানে, পালপোষ করতে শেখেনি। বের করে দিল আমাকে। আমি শুধালাম, কেন? ও বলল, বুড়ার ভাতিজা খুব নাখারা জুড়েছে কতদিন। বলতে গেলাম, তা আঁখ মোটা করে বলল, মা মরে গেছে তিন মাহিনা, তুই কেন ঘর জুড়ে বসে আছিস? ভাতিজা কি বলে শুনতে হলে শোন্ নয়তো চলে যা। রাণ্ডীর মেয়ে তোর ভাতের অভাব কি?

—বহোৎ হারামি তো?

দুলন গলা ঝেড়ে কাসল। বলল, আমার মনে দুখ্‌ উঠে গেল। গুলবদন বলল, ওর ভাতিজার কাছে থাকব, নিজের মেয়েকে এ কথা বলতে পারত? ওর থাকি যদি, আমার সন্তান হবে না? তারাও একদিন লাথ খেয়ে বেরোবে ত? তাই হব, বাজারে যাব।

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, অমন রূপ! ওকে কোনো শেঠ তুলে নিয়ে যাবে।

বিখ্নি বিজ্ঞের মত বলল, নিজের মাকে দেখেছে, ও কি আর বাঁধা রাখ্নি হবে?

বিখ্নি গেল তোহ্রি। ফিরে এসে বলল, বাপ রে, মাই রে! টাকা পাবে বলতে রাণ্ডীদের ভিড় জমে গেল।

—দেখলি ওদের?

—দেখলাম।

—কেমন দেখলি?

—চার আনার রাণ্ডী সব, বুড়ো হয়ে গেছে। কষ্ট খুব। তব্ভি সুর্মা পরে ডিবরি নিয়ে দাঁড়াতে হয়। বুড়ো মরেছে জানলেই চলে আসবে। ভাল কথা!

—কি?

—বুধুয়ার বউ, তোর বেটার বউকেও দেখলাম।

—তোহ্রিতে?

—হ্যাঁ। তোর চেয়েও বুড়ো হয়ে গেছে।

—থাক ওর কথা।

—ও নিজেই পরিচয় দিল। আজ দশ বছর ওখানে আছে। ছেলের কথা শুধাল।

—তুই কি বললি?

—কি বলব? কেন বলব? কথাই বলিনি।

— বেশ করেছিস।

ধুঁধুলের তরকারি আর আটার লেট্টি খেতে-খেতে শনিচরীর বউয়ের কথা মনে পড়ল। খিদেটা খুব বেশি ছিল। কোন্ বছর যায়? সে বছর লাইনে হাতির পাল উঠেছিল আর একটা দাঁড়ানো ইঞ্জিনও ফেলে দেয়। বুধুয়া মরার বছর। ওই টোকো আম গাছটা ছিল এতটুকুন, এখন ফল দিচ্ছে। দশ বছর তোহ্রিতে। ভাল হয়েছে হরোয়া ভেগে গেছে কোথা। মায়ের পরিণতি জেনে যায় নি।

খাওয়ার পর দুজনেই তামাক খেল। শনিচরী বলল, ওর করম! বুধুয়া মরলেও আমি ওকে ফেলতাম না।

—না না, তাই ফেলিস কখনো?

—খুব গরিব দেখলি?

—খুব।

শনিচরীর মুখে আর কথা যোগাল না।

তারপর মোহর সিং মরল।

বিশাল ধুমধামে কিরিয়া হল। রাণ্ডী বুড়িরা শনিচরী আর বিখনিকেই নমস্কার করে বলল, হুজুরাইন। আবার দরকার হলে পাত্তা চালিয়ে দিও। এসে যাব।

শনিচরী আর বিখনি কাপড়ের সঙ্গে ফনফনে পেতলের সরা আর বাঁশের ছাতাও পেয়েছিল। বিখন সেগুলো হাটে বেচে দেয়। টাকা হাতে থাকতে-থাকতেই পোক-কাটা ভুট্টা কেনে বোরা-বোঝাই। বলে, জাঁতায় পিষলে আটা হবে, ভাঙলে দালিয়া হবে, বুঝলি?

ক্রমে জীবনটায় শৃঙ্খলা আসে। কেউ মরলে বাঁধা রোজগার। নইলে বাকি সময় আধাপেটা সিকিপেটা খাও। না জুটলে? কোই পরোয়া নেহী। বছরে একটা-দুটোর বেশি কাঁদার বরাত জোটে না। কাজেই সকলের মত জুটলে খেতমজুর খাট, নয়তো মালিকের খেত গুড়োও, জঙ্গলে গিয়ে মূল-কন্দ খোঁজ, সবলের মত।

বিখনিই সকলকে অবাক করে দিল। ছেলেকে দেখতে গেল না একবার, শনিচরীর উঠোনে লঙ্কা গাছ আবজে লঙ্কা বেচল হাটে। তারপর বলল, রসুন বুনে দেখতে হবে। রসুন বিকোয় ভাল।

ক্রমেই ওদের সুনাম বাড়ল। শনিচরীদের সবাই ডাকতে থাকল। হ্যাঁ, পয়সা নেয়। কিন্তু সত্যিই মাথা ঠোকে, সত্যিই গড়াগড়ি খায় মাটিতে। আর মৃতের যশোগাথা যে কতরকমে গেয়ে গেয়ে কাঁদে! শুনলে মৃতের আপনজনদেরও মনে হতে থাকে যে মরেছে, সে হাড়-বজ্জাত, শয়তানের দোসর নয়। সে স্বর্গের দেবতা, ছলতে ধরাধামে জন্মেছিল।

চমৎকার চলছিল সব। দু বছর খুবই মন্দা যায়। নাথুনির বড় বউয়ের ভাই শোথ জ্বরে মরতে বসেছিল, হাসপাতালে গিয়ে সেরে

আসে। শনিচরীদের প্রত্যক্ষ মহাজন লছমনের বিমাতার আচরণ আরো মর্মান্তিক। বাতজ্বরে নিশ্চিত ছিল মৃত্যু, কিন্তু কোত্থেকে এক সর্বনেশে বৈদ্য এসে তাকে বাঁচিয়ে তুলল।

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, নসীব!

নাপিত পারশনাথও খুব অসন্তুষ্ট হল। বলল, য়ে ধরম কী বাত না হ্যায়।

—কৈসন?

—দেখ্ না তু, বুধুয়াকে মা! আগে আগে মানুষের রোগভোগ হলে মানুষ মরত। জনম কে সাথ্ সাথ্ মরণ ভি চল্না চাহিয়ে। নইলে ধরতির কাম চলে? অসুখ হলে বুড়ো মানুষ মরবে! তা না, ডাক্তার-বৈদ্য-হেকিম, সবাই বুড়োগুলোকে বাঁচিয়ে তুলছে? এ তো ঠিক কাজ নয় বুধুয়াকে মা?

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, তোমার কি বল? জন্মে-বিয়েতে-মরণে তুমি আছ। বিয়ের কথা পাড়তেও তোমাকে লাগে। কিন্তু আমার কি অবস্থা হল তা বল?

বিখনি কিন্তু হতাশ হল না। বলল, সময় হয়নি তাতেই মরল না। সময় হলে কি কেউ থাকবে?

দুলন বলল, এ কিছু নয় রে। আগের চেয়ে আজকাল বেশি খাস, তাতেই একটু এদিক-ওদিক হতে চিন্তা হচ্ছে। মালিক-মহাজনকে দেখিস না? লছমন সিংয়ের সৎ মা তো গম বেচা টাকা দেখলে কাঁদতে বসত। এ বছর গম হয়েছে, বেচে টাকা পেলাম। আগামী সনে যদি তেমন গম না হয়?

শনিচরী বলল, যাও, সব কথায় কি তামাশা চলে?

তারপর শনিচরীর কপাল খুলল, এই বছর। বিখ্নি হাসতে-হাসতে এসে বলল, খুব ভাল খবর।

—কি?

—সে বসে বলতে হবে।

—খবরটা কি?

—রাগ করছিস ?

—কি খবর, তা বলবি তো ?

—গম্ভীর সিং তো মরছে।

—কে বলল ?

বিথ্নি সব খুলে বলল। খবরটা দিয়েছে পারশ নাউ। নাপিতের দেওয়া খবর মিছে হয় না। নাথুনির মায়ের খোঁখীর ব্যামো হয়েছিল, শনিচরীর মনে আছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে খুব। বলুক না বিথ্নি।

নাথুনি তার মাকে যেভাবে রেখেছিল, সে নিয়ম এখন ঘরে ঘরে চলছে। খোঁখী মানে রাজযক্ষ্মা। শিবের অসাধ্য রোগ। এ রোগ যাকে ধরেছে, তাকে চিকিৎসা করালে স্বয়ং শিবঠাকুরকে অপমান করা হয়। গম্ভীর সিংয়ের আপন বলতে কেউ নেই। ভাতিজা সব পাবে। বুড়োর খোঁখী রোগ ধরতে ভাতিজা তড়িঘড়ি উঠোনে ঘর তুলেছে। গম্ভীর সিংকে সেখানে রেখেছে। রামছাগল এনে ঘরে বেঁধেছে। রামছাগল দেখে গম্ভীর সিং বলেছে, ঘরে বতু বাঁধলে তো কেউ বাঁচে না। আমি কি বাঁচব না ? না বাঁচলে এমন কিরিয়া করবি, যে দেখে সবাই তাজ্জব বনে যায়। সবাই শোচে যে হ্যাঁ, মানুষ একটা মরেছে বটে।

—তারপর কি হল ? বিথ্নি বলুক ?

গম্ভীর সিং খুবই আজীব লোক। এখন সে ওষুধবিষুধ ছেড়ে রোজ পুজো-হোম-যজ্ঞ করাচ্ছে। ওর বউ জেদ করে ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তারও ভরসা দিচ্ছে না।

—মরেনি তো এখনো ?

—মরবে তো। ভাতিজার করার নেই কিছু। বুড়ো উকিলকে ডেকে কিরিয়া কাজে লাখ টাকা খরচ করতে বলেছে।

—কেন ?

—বলছে টাকা সব ফুরিয়ে রেখে যাব। ভাতিজা জোতজমা চাষ করিয়ে যা পারে করুক। আমার ছেলেপিলে নেই। ওই বজ্জাতের জন্যে নগদ টাকা রেখে যাব না।

—তা হলে ?

—আজ না হোক কাল, বুড়ো মরবে।

—ততদিন ?

—আমি একবার ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবি ?

—রাঁচি।

—রাঁচি ? কেন ?

—আর বলিস কেন ? হাটে আমার দেওরপোর সঙ্গে দেখা। সে বলে, চাচী, একবার চল। তার মেয়ের বিয়ে।

—মেয়ের বিয়ে ?

বিখনি নিশ্বাস ফেলে বলল, বলছে সে বিয়েতে নাকি সে হতভাগাও আসবে। আমার ছেলেটা। তুই বলবি ছেলেকে দেখতে চাস, তো ঘরের কাছে তার শ্বশুরালে যা ? সে আমি যাব না। কিন্তু দেওরপোর বাড়ি গিয়ে একবার দেখে এলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। সেও জানবে না যে তাকে দেখতে এসেছি।

শনিচরী বলল, এ কথা বললে আমি বলব না কিছু। ছেলেকে দেখবি বলছিস। তবে ঝটপট আসবি তো ? না, থেকে যাবি সেখানে ?

—তা থাকি কখনো ? ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, পথে তোর সঙ্গে দেখা। সেদিন তুই না থাকলে আমি কি করতাম ?

—গম্ভীর সিংয়ের কথাটা মনে রাখিস।

—আরে আমি চারদিনের মাথায় ফিরব।

মাইল তিনেক হেঁটে গেলে বাস রাস্তা। শনিচরী ততখানি পথ গিয়ে বিখনিকে তুলে দিল বাসে। বলল, সিটে বসলে আট টাকা। মেঝেতে বসে চলে যা, দুটো টাকা দিস।

গ্রামে ফেরার পথে শনিচরী বুঝল, এ রকম উত্তেজনার ঘটনা তার জীবনে আর ঘটেনি। তারই সহেলী বিখনি, যে হাঁটা পথ ছাড়া অন্য পথ জানে না, সে বাসে চেপে রাঁচি চলে গেল ? দেওরপোর মেয়ের

বিয়ে দেখবে বলে? মানুষের দেওরপো থাকে কাছেভিতে। রাঁচির মত বড় শহরে থাকে?

শনিচরী সকলকে গল্প করতে করতে এল। সবাই বলল, শনিচরীর জীবনে সবটাই হল নিদারুণ দুখ। তবে বিখনিকে পাওয়া একটা আশীর্বাদ ওর পক্ষে। কি খাটিয়ে-পিটিয়ে বুড়ি! শনিচরীর ঘরের চেহারাই ফিরে গেছে এখন। একেই বলে নিয়তির খেলা। কোথায় বাড়ি, কোথাকার কে, সেই হল আপনজন। যেন কোন গাছের বাকল কোন গাছে জোড়া লাগল।

ঘরে ফিরে শনিচরীর যেন মন বসে না আর। অবশেষে ও গেল জঙ্গলে জ্বালানি কুড়োতে। শুকনো ডালপালা বয়ে নিয়ে এল খানিক। বিখনি কখনো খালি হাতে ফেরে না। নয় দুটো শুকনো ডাল, নয় একটা পথে পড়ে থাকা দড়ি, নয় এক তাল গোবর, যা হয় কিছু একটা নিয়ে ঘরে ঢোকে। এখন ওর মাথায় ঢুকেছে, কারো একটা বক্না বাছুর পেলে পালানি নেবে। শনিচরী ভেবে পায় না এই বুড়ো বয়সে সংসারে এত মায়া কেন ওর।

কয়েকদিন এইভাবে গেল। গম্ভীর সিংয়ের অবস্থা প্রত্যাশিতভাবে মন্দ হতে থাকল। সেখানে গেল শনিচরী একদিন। গোমস্তার সঙ্গে সব কথাবার্ত বলে নিল। কথায় বার্তায় এখন জানা গেল, বলা হচ্ছে খোঁখীর ব্যামো। কিন্তু গম্ভীর সিং মরছে অন্য রোগে। অসুমার নারী সঙ্গ করবার ফলে দেহে ঘৃণা রোগ। শরীর গলে পচে যাচ্ছে। সেই জন্যেই এত যাগযজ্ঞের ঘটাপটা। রোগের জ্বালাতেই ওষুধ-বিষুধ না খেয়ে গম্ভীর সিং মরণকে কাছে ডাকছে।

—শুক্লপক্ষে মরতে চায়।—গোমস্তা বলল।

—কৈছন?—শনিচরীও তাজ্জব। মালিক-মহাজন সব পারে, তা বলে ইচ্ছে হলে শুক্লপক্ষেই মরতে পারে?

—কে জানে?—গোমস্তা দার্শনিক নির্লিপ্ততায় বলল, শুক্লপক্ষে মরলে সিধে বৈকুণ্ঠ। কৃষ্ণপক্ষে মরলে যুধিষ্ঠিরের মত প্রথমে নরকদর্শন, তারপরে স্বর্গবাস।

পুরাণের চরিত্রগুলি সম্পর্কে শনিচরীর বিশেষ গভীর জ্ঞান নেই। তবু তাদের মহত্ত্ব বিষয়ে তার আনুগত্য আছে। ক্যালেণ্ডারে যুধিষ্ঠিরের ছবি দেখার ফলে তার মনে ত্রিলোক কাপুর ও যুধিষ্ঠির, অভি ভট্টাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি একাকার। শনিচরী তাই অবাক হয়ে বলে, কৈছন? হাঁ হুজুর, মালিক-পরোয়ার কা যুধিষ্ঠির হায়?

গোমস্তা এই অজ্ঞ স্ত্রীলোককে শান্ত কণ্ঠে বুঝিয়ে দেয়। মালিক-মহাজন যা বলে, তাই হয়। পাপ এবং পুণ্য হল দেখার ভুল। দুষ্ট লোক বলবে, যে মালিক-পরোয়ার, বাপ বেঁচে থাকতে ডাকাতি করেছে অংরেজ আমলে, স্বাধীন ভারতে একাধিক লাশ স্বহস্তে ফেলেছে, লছমনের বাপের ঘোড়া চুরি করেছে, দুসাদটোলি স্বহস্তে জ্বালিয়েছে, মেয়েছেলেদের বহুজনকে নষ্ট করেছে, সে মহাপাপী। মালিক নিজে তা মনে করে না। তাই কি পাপে তার মহাব্যাধি হল, তা জানার জন্যে বাড়িতে জ্যোতিষী গণকের মেলা বসেছে।

—কুছ পাত্তা মিলা?

—কা পাত্তা?

—য়ো পাপ কা?

—জরুর। গাভীন একটি গরুকে বালককালে মালিক ঠ্যাঙা ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল। এই একমাত্র পাপ।

—তবুও বলি, ইচ্ছে হলেই মালিক শুক্লপক্ষে মরবে?

—নিশ্চয়। এখন অবধি দেখলাম না, মালিক যা চেয়েছে তা হয়নি। তবে এও বলে দিচ্ছি, মালিক যা করছে, তা খুব ভাল করছে। ওই ভাতিজার হাতে পড়লে সম্পত্তি উঠে যাবে লাটে।

—কেন?

—মালিক যা করেছে, অছুত হলেও সব হিন্দু ঘরে। কোন মেয়েটা অহিন্দু নয়। ভাতিজার রাণ্ডী তো মুসলমান।

—হায় রাম!

—তৈরি থাকিস বাপু। এদ্দিন চাকরি করলাম। কিরিয়া হয়ে গেলে আর এখানে থাকছি না। কিরিয়াও হবে, আমিও চলে যাব। মালিক

বলেছেন. মোহর সিংয়ের দাহ ওঁর কিরিয়া যেন মানুষ ভুলে যায়, এমন ব্যাপার করতে হবে।

—জান লড়িয়ে দেব হুজুর।

শনিচরী ফিরে এল।

বাড়ি ফিরল দুর্ভাবনা নিয়ে। দিনে-দিনে ছয়দিন হল। বিখ্‌নির ব্যাপার কি? গ্রামটাও ওদের অজগ্রাম। বাইরের জগতের সঙ্গে কাজ কারবার নেই মোটে। বাসে চড়ে কেউ কোথাও যায় না। রাঁচি থেকে বিখনির খবর কে এনে দেবে? নিশ্বাস ফেলে শনিচরী কাঁথা বিছানা রোদে দিল। চারটি ভুট্টা জাঁতায় ভাঙল। তারপর গেল পঞ্চায়েতী চালাঘর মেরামত করতে। এ কাজে মেহনত দেওয়া বাধ্যতা-মূলক। সর্বদা দেখাশোনা না করলে মাটির ঘর দিমাগ্‌ লেগে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। সে কাজ সেরে চারটি ডালপালা মাথায় বয়ে ঘরে এসে বোঝা নামিয়ে তবে ও লোকটাকে দেখল।

অচেনা লোক। মাথা নেড়া, খালি পা।

—বিখ্‌নি মরে গেছে?

শনিচরী যেন নিমেষে বুঝল সব, আর প্রশ্নটা করল। বলল, তুমি তার দেওরপো?

—জী।

শনিচরীর ভেতরে তখনি ধস নামল। কিন্তু বহু মৃত্যু, বহু বঞ্চনা, বহু অবিচারে গঠিত ওর ধৈর্য ও সংযম। ও আগন্তুককে বসতে বলল। নিজেও বসল, চুপ করে রইল বহুক্ষণ। তারপর আস্তে বলল, কতদিন হল?

—চারদিন।

শনিচরী আঙুলে গুনে দেখে বলল, সেদিন আমি গম্ভীর সিংয়ের বাড়িতে। কি হয়েছিল?

—হাঁপানি থেকে বুকে কফ বসে গেল।

—এখান থেকে যেতে না যেতেই?

—পথে ঠাণ্ডাই শরবত খেয়েছিল।

—তারপর ?

মনে পড়ছে রঙিন শরবত, হজমি গুলি, বেলের মোরব্বা, এ সব কিনে খাবার দিকে বিখ্‌নির বড় লোভ ছিল।

—তারপর হাঁপানি উঠে গেল। আমার শালা হাসপাতালে কাজ করে। ডাক্তার দেখালাম, সুঁই-ইলাজ করালাম!

—আমি কোনদিন তা করিনি।

বেনে'ত দোকানে ঝাঁটা চালিয়ে জখম করে আরশোলা ধরত শনিচরী। মেটে হাঁড়িতে আরশোলা সিদ্ধ করে জলটা খেতে দিত। বিখ্‌নির হাঁপের টান কমে যেত।

—ওর ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—সে আর এল কোথায়? এখন তাকেও খবর দিয়ে যাব। জেঠাইন্ কি আপনার কাছে কিছু রেখে গিয়েছিল?

—কিছু না। জেঠাইন্ বলছ, মরলও তোমার কাছে, তার কেউ আছে বলেই তো জানি না। পথে পথে ঘুরছিল…

—আমিও জানি না। জানলে নিয়ে যেতাম।

—এখন এস বাছা। বাসে যাবে, বাস রাস্তাও দূরে।

লোকটি চলে গেল। শনিচরী এখন একা বসে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করল। কি হচ্ছে মনে? দুখ? না, দুঃখ নয় ভয়। স্বামী মরেছে, ছেলে মরেছে, নাতি চলে গেছে বউ পালিয়েছে, দুখ শনিচরীর জীবনে কবে ছিল না? তখন এমন আগ্রাসী ভয় হয়নি ত? বিখ্‌নি মরে যেতে ওর পেশায় চোট পড়ল, ভাতে হাত পড়ল, তাতেই ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে কেন? বয়স হয়ে গেছে বলে। শনিচরীদের জীবন, পারলে শেষ নিশ্বাস অবধি খেটে চলার জীবন। বয়স মানে জরা। জরা মানে কাজ করতে না-পারা। কাজ করতে না পারা মানে মৃত্যু। শনিচরীর নিজের মাসি বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। এত বুড়ো, যে পোঁটলার মত তাকে তুলে ঘরে নিতে হত। শীতের দিনে রোদ পোহাতে তাকে বাইরে বসিয়ে সবাই কাজে গিয়েছিল। এসে দেখে বুড়ি মরে কাঠ হয়ে আছে।

শনিচরী তেমন মৃত্যু চায় না। মরবে কেন? স্বামী মরল, ছেলে মরল, শনিচরী কি দুঃখে মরেছিল? দুঃখে মানুষ মরে না। প্রচণ্ড শোকের পরও মানুষ ক্রমে স্নান করে, খায়। ফসল চারা খাচ্ছে দেখলে ছাগল তাড়ায়। মানুষ সব করে। কিন্তু না খেতে পেলে মানুষ মরে যায়। শনিচরী এত শোকে যখন মরেনি, বিখ্নির শোকে মরবে না। দুঃখ আছে খুব, কিন্তু কাঁদবে না শনিচরী। পয়সা, চাল, নতুন কাপড় না পেলে কাঁদাটা বাজে বিলাসিতা।

শনিচরী দুলনের বাড়ি গেল।

দুলন ব্যাপারটির সম্যক গুরুত্ব বুঝল। বলল, দেখ বুধুয়াকে মা! জমির দখল ছাড়তে নেই, তা তোহার লিয়ে যো রোনা-কাম জমিন্ হ্যায়। দখল ছাড়া চলবে না। তুই মজাটা দেখছিস না? একেক জন মরছে, তোরা যাচ্ছিস, ওরা কান্নাকাটির জাঁকজমক নিয়ে মানের লড়াই লড়িয়ে দিয়েছে। গম্ভীর সিংকেই দেখ না। ওর যে রোগ হয়েছে, তাতে ডাক্তারী ইলাজ করলে মানুষ সারে। ও সে চেষ্টাই করছে না। মরলে জাঁকজমকের কথা ভাবছে।

—ওদের কিসে মান, কিসে লড়াই, ওরাই জানে।

—তোকেও জানতে হবে।

—জেনে কি করব?

—বুধুয়ার বাপ মরতে তার মজুরী কাজ করিস নি মালিকের খেত-খামারে?

—জরুর।

—বিখ্নি মরতে তার কামও করবি।

—কৈছন?

—নিজে যাবি।—দুলন রেগে চেঁচিয়ে বলল, তোর রুটির ব্যাপার। নিজে যাবি।

—তোহ্রি?

—হাঁ, তোহ্রি। যাবি, রাণ্ডী যোগাড় করবি। নইলে গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজা আর গোমস্তা সব টাকা মেরে দেবে।

—আমি যাব!

—জরুর।

—সেখানে যে ····

—বুধ্য়ার বউ আছে এই তো?

—তুমি জান?

—জরুর। তো কা য়ে ভি এক বরবাদী রাণ্ডী হায় না? ওকেও ডাকবি।

—ওকেও?

—জরুর। ওরও খেতে-পরতে হয় না? রাণ্ডী ডেকে কাঁদানো এক মজাব খেলা। মালিক মহাজনের টাকা পাপের টাকা। তার রয়-ক্ষয় নেই। পাক না চারটি বাজারিয়া রাণ্ডীরা। তাদেরও ত মালিক-মহাজন রাণ্ডী বানিয়ে কতজনাকে লাথ মারে, মারে না?

—মারে।

কে কেমন রাণ্ডী হযেছে সব কথা শনিচরী জানে না। কিন্তু মনে পড়ল, পেটের জ্বালায় বুধ্য়ার বউ ঘর ছেড়েছিল, গুলবদন গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজাকে "ভাই" মনে করেছিল। কিন্তু গম্ভীর সিং বা ভাতিজা ওকে রাণ্ডী ছাড়া কিছু ভাবে নি। সব যেন বড্ড গোলমেলে। শনিচরী সব ভেবে দিশা করতে পারে না। কিন্তু ডুলন কি বলছে?

অত পাপ পুণ্য দেখতে যাস না বুধুয়াকে মা। পাপ-পুণ্য মালিকদের এক্তিয়ারের জিনিস। ওরাই সে হিসেব ভাল বোঝে। তুই-আমি বুঝি খিদের হিসাব।

—সাচ বাত।

—তবে আর কি, চলে যা।

—গ্রামে সবাই মন্দ বলবে না আমাকে?

ডুলন অতি দুখে হাসল। বলল, পেটের জন্যে কোন কাজ করলে, তাতে বুরাই দেখে কে?

শনিচরী ওর কথা বুঝল।

গম্ভীর সিং মারা গেল দিন সতেরো বাদে। ওর শ্বাস উঠেছে যখন,

তখনি গোমস্তা শনিচরীকে খবর পাঠায়। শনিচরী বলে পাঠাল, আমি যাব, লোক নিয়ে যাচ্ছি।

শনিচরী কালো থানটা পরে নিল, চলে গেল তোহ্‌রি। লোককে জিগ্যেস করে রাণ্ডী পট্টির সন্ধান নিতে একটুও লজ্জা হল না ওর। পেটের হিসাব সব চেয়ে বড় হিসাব। ডাকতে ডাকতে ঢুকল ও, রূপা, বুধনি, সোম্‌রি, গাঙ্গু! কাঁহা হায় তু সব? আয় আয়, রুদালী কাম আছে।

চেনা-চেনা বেশ্যারা সব একে-একে এল। ভিড় জমে গেল সেখানে। অনেক মানুষ। দিন পাঁচ টাকার বেশ্যা থেকে দিন এক সিকের বেশ্যা।

—হুজুরাইন্ আপ্?

—বিখ্‌নি মরে গেছে যে।—শনিচরী হাসল। তারপর ভিড়ের পেছনে চেনা-চেনা মুখ দেখে বলল, বুধুয়ার বউ? বহু তুইও আয়, গুলবদন, তুইও চল্। গম্ভীর সিং মরছে, কেঁদে টাকা নিয়ে ওদের মুখে নুন ঘষে দে। লজ্জা কি? যা পারিস উস্থল করে নে। চল্ চল্। সব মাথাপিছু পাঁচ টাকা, সবাই চাল পাবি, কিরিয়াতে কাপড়।

বেশ্যাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যুবতী বেশ্যারা বলল, আমরা?

—সবাই চল্। বুড়ো হলে এ কাজ তো করতে হবে, আমি থাকতে থাকতে তোদের হাতেখড়ি করে দিই?

অসম্ভব মজা পেল সবাই। শনিচরীকে মোড়া পেতে বসাল গাঙ্গু। রূপা চা কিনে আনল, বিড়ি। কিসের যেন উত্তেজনা। তারপর সবাই চলল নওয়াগড়।

গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজা, গোমস্তা, সবাই দেখে তাজ্জব বনে গেল। গোমস্তা হিসহিসিয়ে বলল, রাণ্ডীটোলি ঝেঁটিয়ে এনেছিস? প্রায় একশো রাণ্ডী?

শনিচরী বলল, কাঁয় নেই? মালিক বলেছে, কিস্‌সা-কহানী হয় এমন শোর মচাবি। তা দশটা রাণ্ডীতে কি কিস্‌সা-কহানী হয়?

সর সর, আমাদের কাজ আমাদের করতে দাও। মালিক এখন আমাদের।

গম্ভীরের লাশে ঘা পচা গন্ধ। ওর পেটফোলা লাশ ঘিরে রুদালী রাণ্ডীরা মাথা কুটে কাঁদতে লাগল। গোমস্তার চোখ ফেটে দুঃখে জল এল। কিছুই বাঁচবে না গো। ওই মাথা-কোটাকুটিটা শনিচরীর খচড়াই। মাথা কুটলে দুনো টাকা! ভাতিজা আর গোমস্তা দাঁড়িয়ে রইল অসহায় দর্শক। মাথা কুটতে-কুটতে, কাঁদতে-কাঁদতে, গুলবদন শুকনো চোখ বিশ্রীভাবে মটকে ভাতিজার দিকে চেয়ে হাসল। তারপর কান পেতে শনিচরীর কাঁদা শুনে দোহার ধরল।

ডাইনী

চৈত্র মাসে বৃষ্টি হয় নি। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ জ্বলতে জ্বলতে এল আর গেল, আষাঢ় এল ধূমাবতী হয়ে। মেঘ দেখায়, মেঘ লুকোয়, কুরুডার দার্শনিক নৈরাশ্যবাদী বুধনি ওঁরাও গভীর তৃপ্তিতে বলল, ঃ, এবার খরা ত হলই, আকাল হল বলে।

ওরা কুরুডা নদীর তিরতিরে জল ভরছিল। শনিচরী বলল হ্যাঁ লক্ষণ খুব খারাপ। আকাশে শকুন আর গির্নিবাজ পাক খাচ্ছে, দেখেছিস?

মোতি বলল, এবার সরকার আকালে মরতে দিবে না। আগে থেকেই খিচুড়ি দিবে।

বুধনি বলল, শুনেছিস?

মরদ এসেছে। তোহ্রিতে যেয়ে রিলিফ। রাস্তা কাটতে হবে, মজুরি দিবে, খিচুড়ি, মাইলো।

বুধনি বলল, তবে আকাল এসে গাঁয়ে ঢুকবে, যাব কেন? আগেই যাব। আকাল এসে নিজন গাঁয়ে থাকুক গা।

এ কথাটিকে তখন কেউই গুরুত্ব দেয় নি, কিন্তু অতি সত্বর কথাগুলি নতুন তাৎপর্যে দেখা দেয় এবং সকলেই বলে, 'আকাল এসে নিজন গাঁয়ে থাকুক গা' কথাগুলি হল অমঙ্গলকে আহ্বান। কুরুডা এখন অশুভ ও অমঙ্গলকে ডাকছে। একটি শকুন নাকি কথা কয়টি বাতাস থেকে ছোঁ মেরে তুলে নেয় ও ডাইনীকে পৌঁছে দেয়।

ডাইনী তখন আবাস খুঁজছে। আকালের সঙ্গে যা যা ঘটছে, সবই ডাইনীর কারণে।

শিশুরা নাকি রিলিফে প্রদত্ত সয়াবিনের দুধ খেয়ে ঘাড় উলটে বমি তুলে মরে যাচ্ছে। মরছে গাই-মোষ। গাছ থেকে টাউরি খেয়ে ঘুরে পড়ে মরে যাচ্ছে দাঁড়কাক। ডাইনীর উপস্থিতিতে এ সব ঘটছে।

ডাইনী হবার কোন ঠিকঠাক নেই। রোজ যার সঙ্গে উঠছ-বসছ,

সেই পুরুষ-রমণী ডাইন বা ডাইনী হয়ে যেতে পারে। ডাইনী কাছেভিতে থাকলে অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে পারে, যা কেউ চোখে দেখেনি। সবাই কানে শুনেছে।

মুরহাইয়ে নাকি জনৈক গঞ্জু বুড়ি, চকমকি ঠুকে বিড়ি খেতে যাবে। চকমকি পাথর থেকে আগুন না বেরিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। নাকি কোথায় আঁতুড়ে শিশু পথেই হেঁটে চলে যাচ্ছে আগুনের মালসা পায়ে ঠেলে। কোথায় নাকি মুণ্ডাদের সমাধিক্ষেত্রে দেখা গেছে, সমাধির পাথর ঠেলে ফেলে মৃতেরা উঠে বসে গান গাইছে।

এ সব কেন ঘটছে তা কেউ ভেবে পায় নি। টুরা হল মুণ্ডা গ্রাম। সেখানকার পহান্ বলেছে, তার যুবতী মেয়ে টাহাড় থেকে টুরা ফেরার পথে বাতাসে উপে গেছে।

সামগ্রিক বিপর্যয়। সর্বত্র আতঙ্ক। শেষে সবাই টাহাড়ের হনুমান মিশ্রের কাছে গেছে। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, শিবমন্দিরের পূজারী ও অঞ্চলের এক মুখ্য ব্যক্তি। হনুমানজী উপোস করে হত্যা দিয়েছেন। তারপর বলেছেন, দেবতা তাঁকে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখালেন। 'ম য় অকাল হুঁ' বলে এক ভয়ংকরা রমণী, উলঙ্গ সে, একটি রক্তবর্ণ মেঘে চেপে উড়ে গেছে। পঞ্জিকায় বলছে, সে ডাকিনী। এই ডাইনীকে খুঁজে বের করে তাড়াতে হবে। তাকে আঘাত করে রক্তপাত ঘটালে বা পুড়িয়ে মারলে সমূহ সর্বনাশ।

ডাইনী নাকি কুরুডা, মুরহাই, হেসাডি, এই রকম সব গ্রাম কেন্দ্র করে ঘুরছে।

কারণ, উক্ত গ্রামসকল ও অনুরূপ সকল গ্রামের অধিবাসীরা মহাপাপী।

হনুমান মিশ্র এই পাপ ব্যাপারটি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন—মহাপাপী তারা। নইলে নকশাল হাঙ্গামা, জে. পি. আন্দোলন, জরুরী অবস্থা, সব সময়ে পুলিস উক্ত গ্রামসকল নকড়ছকড় করল কেন? উচ্চ বর্ণের লোকদের ছুঁল না কেন? মহাপাপী ওরা। ওই গঞ্জু-দোসাদ-ধোবি-ওঁরাও-মুণ্ডারা। শেষের দু দল তো পাপীর পাপী।

আজ নিজেদের অসভ্য দেও-দেওতা, কাল মিশনের যিশু, পরশু হিন্দুদের দেবতা ! পুজোর বাছ-বিচার নেই। ফলে তারা, আকালে খরায়-পুলিসী তাণ্ডবে কোন দেবতার বরাভয় পায় না।

—মহাপাপী তারা। নইলে খরা বা অতিবৃষ্টিতে তারা মরে কেন ? ভিক্ষে করতে লজ্জা পায় না। শ্রমভীরু, কামচোর, ওদিকে বলে কাজ পাই না।

ডাইনীও এই সব পাপী-বসতিতে অনুকূল আবহাওয়া পায়। কিন্তু, ডাইনী খুঁজে তাড়াতে না পারলে সর্বনাশ ওদেরই।

এ কথা বলে হনুমান মিশ্র আতঙ্কের একটা বিশাল অদেহী প্রেতকে ছেড়ে দিলেন বাতাসে। অজানা আতঙ্কে সবাই শুকিয়ে যেতে থাকল।

সবাই সবাইকে অবিশ্বাস করতে থাকল, প্রিয় ও চেনাজানা মানুষের আচরণকে করল অবিশ্বাস।

মুরহাইয়ের সোদন গঞ্জু তার বুড়ি মাকে রাতে উঠে বাইরে যেতে দেখে পিছু নেয়। মা যথারীতি উঠোনে বসে কাজ সারে ও উঠে আসে। এসে দোর বন্ধ করার পর সোদনের সহসা মনে হয়, যে ঘরে এসে খড়ের বিছানায় শুচ্ছে, সে তার মা নয়। আতঙ্কে অস্থির সোদন চেঁচিয়ে বেরিয়ে যায় ও পড়শিদের ডাকে। পড়শিরা সোদনের মাকে বাতি জ্বেলে হাঁটিয়ে দেখে, ওর পা মাটিতে পড়ছে কিনা, মেঝেতে ছায়া পড়ছে কিনা। অতঃপর সোদনের মা'র হাত সর্বসমক্ষে নরুনে চিরে দেখা হয় রক্তটি লাল, না কালো। তারপর বুড়ি রেহাই পায়। কিন্তু নিজের ছেলে তাকে ডাইনী ভাবল, সেই দুঃখে সোদনের মা হরম্ দেওরের থানে গিয়ে বসল।

না খেয়ে মরাই ওর সংকল্প ছিল, কিন্তু উপোসের ঝিমে যেই ঘুম এল, অমনি ও মনে মনে জানতে পেল, সোদনকে ডাইনী ধরেছে। তখনি উঠে ও চেঁচাতে থাকল, ওকার সাথ মৎ যাইও সোদন ! য়োহি ডাইন। এবং ছুটতে থাকল। গিয়ে দেখে, যা ভেবেছে তাই ! সোদন একটা মাদী শজারুকে ধাওয়া করেছে। সোদনকে ও পায়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে তবে ছেলেকে বাঁচাতে পারল। শজারুরূপিণী ডাইনী বিফল আশায় পালাল।

সব স্বামী-বাপ-ভাই-ছেলেই মেয়েদের ওপর নজর রাখতে বাধ্য হল। মাটিতে ছায়া পড়ছে কিনা, মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করার পর ফিরছে যখন, তখন সঙ্গে মাথার ওপর কোন কাক উড়তে উড়তে আসছে কিনা, রাতে বাইরের কাজ সেরে ঘরে ঢুকে আগল দিচ্ছে যে সে একই মানুষ কিনা, এ সব বিষয়ে কড়া নজর রাখা চলতে থাকল। ডাইনীর খোঁজ করা সহজ কাজ নয়। সর্বত্র সকলে সকলকে সন্দেহ করে চলতে হয়। ফলে কতিপয় অঘটন ঘটে যায়, গেল।

প্রতি বছর আকালে হেসাডির দৈতার তুসাদ, তার মাকে একটা টিনেব বাটি দিয়ে বাস-জংশনে বসিয়ে দিয়ে যায়, এবারও দিল প্রতি বাবে দৈতারেব মা মাস দুয়েক ভিক্ষে করে, রাতে বটতলায় ঘুমোয়। বাসের ক্লীনারদের কাছাকাছি। ক্লীনাররাও দুবন্ত গরমে বটতলাতেই শোয়। গাছের আওতার বাইবে, বাঁধানো চাতালে। প্রতি বছর ওরা দৈতাবেব মার ঘুমের মধ্যে বকবকানি শোনে। এবার প্রথম রাতের পরেই ওরা বিদ্রোহ করল। বলল, রাতে ও কোন্ পিশাচকে ডাকছিল? আও আও বলে?

দৈতাবেব বুড়ি মা, ব্যাপারটিব গুরুত্ব সম্যক বোঝেনি। সে নিদন্ত হেসে বলল, কালো গাইটা। নিদ্ মেঁ সপন দেখি য়ো খচড়ী গোয়ালে ঢুকছে না। ফলে তার বিরুদ্ধে কেস গুরুত্ব পেল। স্বপ্ন, কালো গরু, কালো রংটি অশুভ, তাকে ডাকাডাকি! ক্লীনাররা বলল, ভাগ ইহাসে। নইলে ঢিল মেরে ভাগাব।

খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, বুড়ি তিন মাইল হেঁটে ফিরতে ফিরতে মুখ থুবড়ে পড়ে মরেও গেল। অধৈর্য ও হ্যাংলা শেয়ালের দলের কৃপায় বুড়ির সৎকারটাও দৈতারকে করতে হল না। অচিরে সবাই নিশ্চিত হল, শেয়াল নয়, ডাকিনীই দৈতারের মাকে খেয়ে গেছে।

আতঙ্কের চাপে থাকতে থাকতে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র বিদ্রোহ করে। তার ওপর যদি আকালের আতঙ্ক যোগ হয়, পাপীর দল সে ভার সইতে পারে না।

রিলিফ দেয় যারা, সেই রিলিফ অফিসার, মিশনের কর্মী, সেবা-

সঙ্ঘের সাধুরা সকলেই লক্ষ্য করলেন, দুর্গতদের চোখে-মুখে ভীষণ চাপা হিংস্রতা ও রুক্ষতা। ওদের চোখ ভাঁটার মত ঘুরছে, কি যেন খুঁজছে। খুব বিস্ময়কর। কেননা এঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, এই অঞ্চলের আদিবাসীরা, স্বভাবে অনুভূতিহীন। দুর্ভিক্ষের সময়ে এরা মিশনের দরজায় শিশুদের ফেলে দিয়ে চলে যায়। আগুন লেগে গ্রাম ছাই হয়ে গেলে চট করে সেখানে ফেরে না। ব্যাখ্যা চাইলে বলে, আমাদের কাছে শিশুরা মরবে, মিশন ওদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে। ঘর পুড়লে ফিরি না। কেননা ঘর তৈরি করি মাটিতে, গাছের পাতায়। একটা লোহার কড়াই ও কোমরের বলোয়া ছাড়া ঘরে পয়সা দিয়ে কেনা কোন জিনিস থাকে না। কিসের টানে ফিরব ?

এঁরা দেখেছেন, এই টানবিহীন মানুষগুলিকে, আকালের সময়ে যেন চূড়ান্ত নির্লিপ্তি পেয়ে বসে। মুখে-চোখে কিসের দেওয়াল যে তোলা থাকে, সে বাধা টপকে এদের মনে কোন মানুষী কৌতূহল জাগিয়ে তোলা যায় না। রিলিফ-গ্রহণরত কঙ্কালসার জননীর কোলে কঙ্কাল-সার শিশুর সামনে সমাজসেবী মহিলারা, দেখো বেবি, খিলৌনা দেখো বলে ঝুমঝুমি নাচিয়ে দেখেছেন। বাচ্চারা কাচের পাঁচিলের ওপার থেকে নির্মম ঔদাসীন্যে চেয়ে থেকেছে।

এবার এদের চোখ মুখ খুবই সজীব। জাগ্রত, চঞ্চল, ক্রুর।

আরো আরো অস্বস্তিকর রিপোর্ট। গ্রাম-সেবীমণ্ডলীর।

যথা :—গ্রামে কোন বহিরাগত নেড়ী কুকুর ঢুকলে আগে অন্য নেড়ী কুকুররাই তাদের তাড়াত।

এখন মানুষ তাদের নির্মম হিংস্রতায় ঢিল মেরে বের করে দিচ্ছে।

রিলিফ নেবার পর, এই গরমেও সবাই আগুন জ্বেলে ঘুমোচ্ছে। পালা করে পুরুষরা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে।

রিলিফ দানের সঙ্গে টিকা ও ইঞ্জেকশান দান সাত পাকে বাঁধা। প্রতি বছর মহিলা ডাক্তার বা মিশনারী বা ডাক্তারী ছাত্রীও টিকে-ইঞ্জেকশান দিয়েছেন, ওরা নিয়েছে। এবার বহিরাগত মহিলাদের হাত থেকে ছুঁচ নিতে ওরা অস্বীকার করছে।

রিলিফ দিতে ইচ্ছুক জনৈক ধনী প্রৌঢ়া, স্টেশন ওয়াগনে মাইক লাগিয়ে কৃষ্ণ চেতনা'র গান বাজাতে বাজাতে তোহ্ রি যাচ্ছিলেন। পথে একটি গ্রামে জল চাইতে গিয়ে মহিলা নিজে, এবং তাঁর শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসিনী সঙ্গিনীরা জল পান নি। তাঁদের গায়ে ঢিল পড়েছে। এতে মর্মাহত হয়ে তাঁরা বলেছেন, যাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষরূপী কৃষ্ণ মানবিক চেতনা জাগাতে পারেন নি, তাদের অনাহারে মৃত্যুই কৃষ্ণ ভগবানের কাম্য। তাঁরা তোহ্ রি যান নি। রি'লফের টাকাকড়ি, চাল, দুধের গুঁড়ো, ওষুধ সব নিয়ে পাটনা ফিরে গেছেন।

এ সব ঘটনায় গ্রামসেবীরা খুব উদ্বিগ্ন। তারা বুঝতে পারছে, গ্রাম থেকে গ্রামে, কোন অঘটনের প্রত্যাশায় আতঙ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহ বইছে। বুঝতে পারছে, লোকগুলির মানসিক সংগঠনে কোন পরিবর্তন ঘটছে।

এর নিরসন কিসে হবে? তারা শুনেছে, এদের মনোজগতে পশু-ভাবের প্রাবল্য কমিয়ে দেবভাব আনার জন্যে হনুমান মিশ্র সাতদিন ধরে যজ্ঞাগ্নি জ্বেলে এক কুইন্টাল ঘি আহুতি দিতে চেয়েছেন এবং পাটনার 'কৃষ্ণ চৈতন্য' আশ্রমের সেক্রেটারী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক সে ঘি দিতে চেয়েছেন। শর্তসাপেক্ষে। যখন ঘি দেওয়া হবে, তখন 'শিবস্তোত্রম্' নিচু পর্দায় বলতে হবে। কেননা বাইরে তখন এঁরা স্টেশন ওয়াগনে "লর্ড কৃষ্ণ, হোয়্যার আর য়ু" বাজাবেন। এতে হনুমান মিশ্র দোনামোনা করছেন। কৃষ্ণসংগীতে তাঁর আপত্তি নেই। কেননা হরি যিনি হর তিনি। তাঁর আপত্তি ঘিয়ে। ওটি গাওয়া ঘি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার গরুর দুধ থেকে তৈরি। শিব রগচটা ঠাকুর। অস্ট্রেলিয়া তাঁর এলাকার বাইরে বলে তিনি যদি ক্ষেপে যান? হিন্দু দেবতারা বিশ্বের প্রভু। কিন্তু যখন তাঁদের উক্ত পদ দেওয়া হয়, তখন অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হয় নি। তাই, হাঁ বলতে পারছেন না।

ডাইনীর ব্যাপারটি উক্ত শ্বেতাঙ্গ জেনেছে এবং মিশ্রজীকে অনুরোধ জানিয়েছে, ডাইনীকে যেন হত্যা করা না হয়। খাঁটি ভারতীয় ডাইনী পেলে সে নিয়ে যাবে স্বদেশে। সেও বলেছে, ডাইনীকে খুঁজে বের করতে হলে প্রথমেই চালাও হারে সকলে সকলকে অবিশ্বাস করা হল

প্রাথমিক আবশ্যিক। বলেছে, দরকার হলে নিজেকেও অবিশ্বাস করতে হবে।

মিশ্রজীর মনে কথাটি ধরেছে। তিনি বলেছেন, ওরে হতভাগারা! কত সময়ে তো একাই মাঠে বা পাহাড়ে বা বনে ঘুরিস। নিজের ছায়া পড়ছে কিনা, মাথার 'পরে কাক বা শকুন বা চিল উড়ছে কিনা, দেখাটা তোদের নিজেদেরই কর্তব্য।

নিজেই নিজেকে সন্দেহ কর, নিজের ওপর নজর রাখ, এই নির্দেশের ফলে নানাবিধ স্তরভঙ্গ ও উৎক্ষেপ ঘটে যায় আতঙ্ক-অধিকৃত মানুষগুলির মনে। ডাইনীকে খুঁজে বের করতে হবে, অথচ প্রাণে মারতে হবে না।

কুকডার পহান্ বলে, 'বুঝি না কিছু। আগে আগে তো এমন ডাইন আসে নি? সেবার শনিচরীর পিসি যখন ডাইন্ সাব্যস্ত হয়…

সে চুপ করে যায়। তার এবং শ্রোতাদের চোখে ধূর্তামি ঝিলিক দেয়। বুড়িকে তারা ঢিল মেরে খুন করেছিল ও হায়েনা নৈশভোজন সারার কারণে পুলিস তাদের ধরতে পারে নি।

—সে বলে, এবার কী হল? সবাই নতুন হয়ে গেল?

—শনিচরীর ছেলে বলে, 'জানি না, টাহাড়ের মিশ্রজী এমন ভয় ঢুকিয়ে দিল!

সব নতুন রকম! রিলিফ দিল, রিলিফ গেল, আকাশে দেখ ছেঁড়া মেঘ ঘোরে। ধানের চারা যেন মরে আছে। গাছের পাতায় রস নেই, যেন পোয়াতির জিভ। সেদিন বিসরা গঞ্জুর বউ ছেলে বিয়ালে। ছেলের মুখে একটা দাঁত। নেকড়ে-হায়েনা-শেয়াল দিনেমানে পথে ফিরে।

বুঝি আবার সেঙ্গেল-দা হবে। আকাশ আগুন বর্ষাবে। জ্বলে যাবে সব। দেওদেওতার কি সেদিন আছে? আবার নতুন ধরতি 'সির্জাবে?

এ সব কথাবার্তা সকালে হয়। রাতে পহানের বউ শোনে, পহান্ কাঁদছে ও কাকে ডাকছে, আয় আয়, কাছে আয়। কাছে আয় রে।

—কাকে ডাকে?

—ছায়াটাকে। পেচ্ছাপ করতে গেলাম, ছায়া সঙ্গে গেল। ঘরে এলাম, ছায়া নাই।

—ছায়া নাই?

—না রে।

—কেন?

—আমি বুঝি ডাইন্ হলাম!

এতেই বোঝ যায়, পহান্ প্রধান পুরোহিত, তার সঙ্গে দেবতার প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান আছে, এই অকাট্য সত্যও পহান্‌কে আতঙ্কের গ্রাস থেকে বাঁচাতে পারছে না। পহানের বউ স্বামীর চেয়ে মনোবল রাখে। সে ফসফস করে ছুটো ডিবরি জ্বালল ও স্বামীকে বলল, ওই তো ছায়া। পহান্‌কে ধরতে পারে ডাইন্?

বোঝা গেল, মনোজগতের ভূস্তরে ভাঙচুর হয়ে গেছে পহানের, আত্মবিশ্বাস টলে গেছে। নইলে মাঝরাতে নিজেকে ডাইন্ বলে সন্দেহ করার কারণ কি?

এরপর বুধনি ওঁরাও, কুরুডার জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে কুড়োতে সে হঠাৎ দেখল কুণ্ডীর জলে একটি লোমশ হাতের ছায়া। তখনি সে বুঝল সে ডাইনী হয়ে যাচ্ছে। বুঝেই সে কাঠ ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে ঝুঁকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে নিজের রূপান্তর দেখতে থাকল জলে। এবং আরেকটি লোমশ হাত দেখে সে 'আমি ডাইনী!' বলে এমন চেঁচাল যে, ভালুকের মত খতরনাক জানোয়ারও ঘাবড়ে গিয়ে তাকে টপকে পালাল। বুধনি তখন সংবিৎ ফিরে পেল ও কাঠ ফেলে দৌড়ল গ্রামের দিকে।

বুরুডিহির বিসরা তুসাদ একদিন তার একমাত্র পার্থিব সম্পদ কালো বকনাটাকেই মেরে ফেলল। বকনাটা বকনা থাকে। কিন্তু বিসরা মৌয়া খেলেই বকনাটা যুবতী মেয়েছেলে হয়ে তাকে ডাকতে থাকে। কালো বকনার মৃত্যু বিসরা তুসাদের মত লোকের জীবনে ভীষণ সর্বনাশ সূচনা করতে পারে, করল। বিসরা কয়েকদিন পাগলের মত লাল চোখ করে ভোম্বা মেরে বসে থাকল শূন্য গোয়ালে। তারপর, বকনা,

বিহ্বনে তার ভবিষ্যৎ সমাধিস্থ বুঝতে পারল। বকনা বড় হবে না, বাছুর বিয়োবে না, দুধ দেবে না, বকনা কেনার ঋণ শোধ করা যাবে না, বাঁচার জন্যে আবার ধার করতে হবে, এ সব কথা মনে হতেই সে বকন-বাঁধা দড়ি দিয়ে গোয়ালেব আডা থেকে ঝুলে পড়ল। রাত্রে। বিকেলে ও ছেলেকে একটি লাট্টু কিনে দিয়েছিল। বাড়ির চালা মেরামত করেছিল। বউকে বলেছিল, বকনাটা ডাইনী ছিল না রে। শুধামুধা অবোলাটা মারলাম।

বউ ভেবেছিল, সাময়িক বিহ্বলতা কাটিয়ে স্বামী আবাব প্রকৃতিস্থ হচ্ছে।

বিসরা দুসাদ ছিল তল্লাটেব সবচেয়ে ভাল টোটকা ওষুধ জানা গুণিন্। গ্রামের লোবের অসুখে-বিসুখে একমাত্র ভরসা। এবং জলের খোঁজিয়া। মাটির নিচে কোথায় জল থাকে, সে জানত। এ রকম লোকের মৃত্যু গ্রামসমাজের কাঠামোকে প্রত্যক্ষ আঘাত করে। সে ছিল চিরান্ধকার গ্রামগুলিব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয়তা তার জীবনে ঋণমুক্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারেনি, কিন্তু তাকে সম্মান দিয়েছিল। দারিদ্র্য বা অসচ্ছলতা বিসবা দুসাদরা আকাশ-বাতাসের মত অমোঘ ও সর্বব্যাপী বলেই জানে। স্বাচ্ছন্দ্য পায়নি বলে বিসরার মনে আলাদা কোন ক্ষোভ ছিল না। সে পায়নি, অন্যরাও পায় নি। দারিদ্র্যেব কম্যুনিজমে দুসাদ-গঞ্জু-ওঁরাও-মুণ্ডাবা এক 'কমরেড' শ্রেণীভুক্ত।

'বিসরার মরণের মূলেও ডাইনীর ভয়!' পহান্ হেঁকে বলল, আজ বিসরা গেল, কাল যদি ভুরাই লোহার মরে? আমরা লোহা-কাজ করাব না? পরশু ভরত মরলে আমরা কাঠের কাজ করাব না? ডাইনী খুঁজে বের কর। আমি হত্যা দিব, উপোস করব, তোমাদের কোন ভয় থাকবে না, বিপদ হবে না।

ডাইনী-আতঙ্কের কথা গ্রামসেবী সঙ্ঘও ক্রমে জানতে পারে ও আদিবাসী-কল্যাণ মন্ত্রকের কর্মীকে জানায়। কর্মী সরকারী লোক হিসেবে খবরটি পুলিসকে জানায়। কেননা ডাইনী-খোঁজার নামে বুড়ো-বুড়ি

হত্যা ঘটলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ। সেখানেই তার কর্তব্য শেষ হয়। এবং সরকারী-কর্মচারী সত্তা ভুলে গিয়ে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপে ও হনুমান মিশ্রকে একান্ন টাকা দিয়ে এক মাদুলি পরে আসে।

থানার দারোগা বলেন, এখনও ডাইনী-খোঁজের নামে খুন হয়নি। হলেই বা আমি কি করব? সরকারী চাকর। হরিজন হত্যা ঘটলে রিপোর্ট করব। কিন্তু ব্রাহ্মণ নয়, রাজপুত নয়, আদিবাসী বা তপশিলী জাতি যদি স্বজাতের লোকজন মারে? ডাইনী বলে? তখন আমি ছুটি নিয়ে নেব। ডাইনীর ব্যাপারে কিছু করতে যাব না। সরকার আসে, সরকার যায়। ডাইনী চিরকালের। আমি কি ডাইনীর বাণে মরব নাকি?

এ ভাবেই সব ঘটনাবলী ঘুরপাক খেতে থাকে ভুলভুলাইয়ায়। ডাইনীর অজানা আতঙ্ক এবং ভুলভুলাইয়া সমার্থক। তাতে ঢোকা যায়, বেরোনো যায় না। তারপর একদিন মুরহাই গ্রাম থেকে শোরগোল ওঠে। আকাশে মশাল নাচে, আকাশচেরা বীভৎস আর্তনাদ শোনা যায় আঁ—আঁ—আঁ। ডাইনীর খোঁজ মেলে।

এই মুরহাই গ্রামটির সঙ্গে 'ডাইনী' নামের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। গ্রামবাসীরা যথারীতি গঞ্জু ও দুসাদ। যাঁরা এই অঞ্চলটির প্রসঙ্গে মনে করেন, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ নিয়ে যত ভেদাভেদ, তাঁরা সবটা ঠিক বোঝেন না।

জাত-বর্ণের ব্যাপারেও আরব্যোপন্যাসের গল্পের বাক্যের মত পুরিয়াকে অন্দর পুরিয়া, উস্‌কে অন্দর পুরিয়া আছে। কেঁচো খুঁড়তে ডাইনোসর বেরোয়।

হনুমান মিশ্র যে ভোলা গঞ্জুকে কুয়োর কাছে আসতে দেবেন না, সে আচরণের ন্যায়সঙ্গতি ভোলাও বোঝে ও মেনে নেয়।

এদিকে ভরত দুসাদ, ভোলা গঞ্জুর চেয়ে উচ্চবর্ণ, ভরত ও ভোলা দুজনেই রামরিক ধোবির চেয়ে উচ্চবর্ণ। নানাবিধ সমস্যা। সমস্যাগুলি ওঁরাও ও মুণ্ডাদের কাছে খুবই হাস্যকর। ওরা এত জাত-পাঁত বোঝে

না। বোঝে না বলে ভরত, ভোলা ও রামরিক সকলেই ওদের মূর্খ মনে করে।

প্রায় প্রতি গ্রামেই ওঁরাও বা মুণ্ডা বসতি আছে। সবচেয়ে মজা হল, ওঁরাও বা মুণ্ডাদের প্রধান পুরোহিত পহান্-এর শ্রেষ্ঠত্ব অ-আদিবাসী গঞ্জু দোসাদ ও ধোবিরাও মানে।

মুরহাই গ্রামটি দুরারোগ্য অনাহার-উপোস-আকাল-খর-বেঠ-বেগারী-মহাজনের বজ্জাতি ইত্যাদিতে ভোগে। যখনি রোগের জ্বালা কিঞ্চিৎ কম থাকে, তখনি জাত-পাঁতের সমস্যা নিয়ে পরস্পর লাঠালাঠি করে, পরস্পর ঝগড়া মেটায় ও এ ভাবেই জীবনকে ঘটনাবহুল রাখে।

একেক জায়গায় একেক বৈশিষ্ট্য। হেসাডির মেয়েছেলেরা খচ্‌ড়ী হয়। কুরুডার ওঁরাওরা কামচোর। বুকড়ুর পুরুষরা বদরাগী। মুরহাইয়ে বুড়োবুড়ি প্রতি দশ-পনের বছরে একজন না একজন ডাইন বা ডাইনী হয়।

তখন তারা অন্যের গাই-মোষকে বাণ মারে, পরের বউকে রাতে বাইরে ডাকে ও কুকুরছানা হয়ে কামড়ে দেয়, নয়ত চুহা হয়ে সবার ধান-ভুট্টার বস্তা দাঁতে কাটে।

সেবার বাচ্চারা পটাপট দুধ তুলে হাত-পা খেঁচে মরতে থাকল শিবরাত্রির পর। সরকারী ডাক্তার বলে, মিশ্রজীর শিবমন্দিরে ঠাকুরের মাথায় দুধ ঢালল, দুধ জমল নোংরা চৌবাচ্চায়, সেই দুধ একদিনের বাসি, বাচ্চাদের খাওয়ালে মরবে না?

কেউ তার কথার প্রতিবাদ করেনি। রামরিক বিবি তার তিন বছরের মেয়েকে মাটি চাপা দিয়ে জাত ভাইদের কজনকে ডাকে। অন্ধকারে তারা সলা করে। তারপর চলে যায় মহুরী ধোবিনের ঘর। মহুরী বৃদ্ধা, লোলচর্মা, আগ্রাসী খিদে তার। সে বাঁকে বয়ে যে দুধ আনে তাই খেয়েছিল রামরিকের মেয়ে।

মহুরীর ঘরের চালে আগুন দিয়ে ওরা মহুরীকে বের করে। আধ-পোড়া অবস্থায় ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ভয়ে ও পোড়ার যন্ত্রণায় মহুরী পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ে ও মরে।

এ হল মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে মহুরীকে আঘাত করা। রামরিক ও তার খুড়তত ভাই আজও জেল খাটছে।

এর বছর দশেক আগে রোত্তো মুণ্ডার বিধবা বউ ডাইনী হয়েছিল। সুখেব বিষয়, নাক কেটে নিয়ে রক্ত ঝরিয়ে দিতেই সে মানুষ হয়ে যায়। তাকে প্রাণে মারতে হয়নি।

এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য হল, মুরহাই জায়গাটি ডাইনীদের কাছে প্রিয়। জায়গাটি হতভাগা ও প্রান্তরে কাশবনে বাতাস বইলে, কেন যেন মনে হয় কারা 'হায় হায় হায়' বলে কাঁদছে।

এ হেন মুরহাইয়ে ডাইনী প্রথম ধরা পড়ে। কারণ, উক্ত রামরিক ধোবির ছেলে ও বরম্ গপ্পর বিধবা বোনের, জাত-পাঁত অসমর্থিত অবৈধ প্রণয়।

হতভাগা জায়গার হতভাগা ভালবাসা। জাত-পাঁতের কঠোরতায় এখানে অবৈধ প্রেম কখনোই পূর্ণতা পায় না। তবুও মাঝে মাঝে প্রেম হাজির হয় ও যাদের আক্রমণ ও অধিকার করে তাদের উস্তম-পুস্তম করে মারে।

রামরিকের ছেলে পরসাদ ও বরম্-এর বোন মানি, আশৈশব তুজনে তুজনকে দেখছে। পরসাদের বউ মানির বন্ধু। মানির বরও পরসাদেব চেনাজানা ছিল। গ্রাম সম্পর্কে মানি হল পরসাদের ছেলের পিসি। হঠাৎ করম পুজোয় নাচতে গিয়ে তুজনে তুজনের প্রেমে পড়ল।

কয়েক দিনেই তুজনে তুজনকে চোখে চোখে খুঁজতে থাকল। কয়েক দিনেই তুজনে তুজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হাট থেকে ফেরার পথে, বন থেকে জ্বালানি টেনে ঘরে ফেরার পথে ছলা খুঁজতে থাকল। অবশেষে তুজনেই ধরা পড়ল।

পরসাদের বউ এসে মানিকে গালাগাল দিয়ে ঘরে ফিরে কাঁদতে বসল।

বরম্ তার বোনকে কেটে ফেলার শুভ সংকল্প ঘোষণা করে পারমিটে কেরোসিন আনতে গেল।

রামরিকের মা বুদ্ধিমতী, বহুদ্রষ্টা। বরমদের ঘরে এসে সে উঠোনে

বসে নিজের ঘৃণ্য স্পর্শ বাঁচিয়ে হুঁকো টানল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, যা হবার তা হয়েছে। বেশি শোর তুলে লাভ নেই। আমার বউ চিমড়ি শুঁটকি। জোয়ান ছেলের মন ওঠে না। মানি হল বাঁজা বিধবা। শরীরের রক্ত শরীরে থাকলে খাসি দৌড়য়।´ তোমরা তোমাদের ঘর সামলাও।

গ্রামসমাজের পাঁচজন. রামরিক ও বরম্‌কে ডেকে বলল, কয়েক বছর ধরে আমরা নিতুষী হলেও বাইরে থে.ক পুলিস এসে আমাদের জীবনটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। তায় খরা, তায় আকাল। তায় এখন ডাইনীর ভয়। এ সময়ে ওরা যে নাখারা জুড়ল, তার পেছনেও ডাইনীর মায়া আছে কিনা, কে বলবে? এ নিয়ে এখন আর হই-হুজ্জুত নয়। যে যার ঘর সামলাও। বেশি গণ্ডগোল করলে দুজনকে জুতোর বাড়ি মেরে সিধা করে দেব।

কথ কয়টি ভাবতে গেলে বড় করুণ ও মর্মন্তুদ। দ্যোতকও বটে। কয়েক বছর আগে হলে, মহাজনী উৎপীড়ন অনশন আকাল খরা এদের মনোবল ভেঙে দিত না। ওগুলি ওদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কুরুডা নদীটি একদা ছিল না, কোয়েলের স্রোতোপথ পরিবর্তনের ফলে দুশো বছর আগে হয়েছে—এ কথা এরা বোঝে না। নদীটি নিশ্চয় চিরকাল আছে। কেননা বাপদাদার আমল থেকে ওরা নদীটি দেখছে।

কবে জীবনে মহাজন-জোতদার ছিল না, তাও এদের বোধাতীত। এরা বাপ-দাদার আমল থেকে মহাজন-জোতদারের শোষণ দেখেছে। অতএব উক্ত অভিশাপ চিরকালীন।

কিন্তু পুলিসের অত্যাচার চিরকালীন নয়। নকশাল হাঙ্গামা—জে. পি. আন্দোলন—জরুরী অবস্থা—পুলিস কেন ওদের জীবন নকড়াছকড়া করেছে তা ওরা বোঝেনি। কিন্তু জীবন জ্বলে গেছে।

মহাজনী জুলুম আকাল খরার পরেও জাতপাঁতের বিচারে, গ্রাম-সমাজের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধের বিচারে এদের মন ছিল। পুলিসী জুলুম এদের জীবনের প্রাণরস শুষে নিয়েছে।

এখন আর পরসাদ ও মানিকে শাস্তি দেবার উত্তম অবশিষ্ট নেই

মনে। গ্রাম-অর্থনীতিতে প্রতিটি কর্মক্ষম যুবক-যুবতী আবশ্যিক। এদের তাড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

গাঁওবুড়া হুমরু গলা ঝেড়ে সাফ করে বলল, পরসাদ! মানি! আমরা জীয়ন্তে মরে আছি। তোরা নতুন করে আর মারিস না। তাড়িয়ে দেব তোদের? কোথা যাবি? কি করবি? পরসাদের বউ ছেলে কোথা যাবে?

পরসাদ ও মানি, জুতো খাবে, বিতাড়িত হবে, মার খাবে—ইত্যাদি আশা করে এসেছিল। উল্টো হয়ে গেল সব। ওদের মনে তাৎক্ষণিক অনুশোচনা দেখা দিল। ওরা মাটিতে পড়ে কিরে কাড়ল, পরস্পরকে ভাইবোনের চোখে দেখবে।

কিন্তু ভালবাসা দুরারোগ্য ব্যাধি। কিছুদিন মানি খুবই সংযত হয়ে থাকল। বরম্ বলল, ফসল উঠলে তোকে আবার সাদী করিয়ে দেব। তোর দেওর এখন সা-জোয়ান। তার ইচ্ছেও আছে।

এ কথায় মানির চোখ ফেটে জল এল। দাদার আন্তরিকতা সে বুঝল। দাদার কথায় বুকে প্রবল বেদনার ধাক্কায় বুঝল, পরসাদকে সে ভালবাসে। আস্তে বলল, সে দেখা যাবে। ফসল উঠুক।

—আর ফসল! জলের যা হাল!

—জল হবে।

—আর জল হয়? মেঘ ঘুরে, দাঁড়ায় না?

জল বিনে ভুট্টা মাড়োয়ার ফসল নষ্ট হবার দুশ্চিন্তায় ভাই বোন পরস্পরের খুব কাছে এল নিমেষের জন্যে। বাপ মরতে, কামচোরা বউ ও বুড়ি মা নিয়ে বরম্ নাটাঝামটা হচ্ছিল। মানি আসার পর ভাই বোনে সংসার বেঁধে তুলেছে। ফসল কাটতে-আড়তে জাঁতায় ভাঙতে হাটে নিতে মানিই সর্বেসর্বা। বরম্ বলল, পরসাদের কথা তুই ভুলে যা।

—যাব।

—পড়শির ঘর ভাঙাভাঙি ঠিক নয়।

—না।

মানি সব কথাই মেনে নিল। তারপর বলল, ঘরটা ছেয়ে ফেল। জল ঝুঁঝায়।

—দড়ি আছে?

—আছে। আর, দু লাছা দড়ি তুই ভুরার ঠেঙে পাবি। সেবার নিয়েছিল।

—আমি নিয়ে নেব।

ঘরের প্রসঙ্গে দুজনেরই একসঙ্গে মনে পড়ল, পরসাদ বড় ভাল ঘর ছাইতে পারে। এলো পাতার আঁশ দিয়ে দড়ি পাকিয়ে সে এমন চাল বেঁধে দেয় যে সহজে চোট খায় না। নিশ্বাস ফেলে মানি তার দা নিয়ে বনে চলে গেল।

পরসাদ তা লক্ষ্য করল। দু চারদিন বাদে ও বনে মানির সঙ্গ নিল।

মানি ও পরসাদ জানছিল এ ভাবে দেখা সাক্ষাৎ ঠিক হচ্ছে না। এ ভালবাসা ওদের কোন শুভ পরিণামে পৌঁছে দেবে না। তবুও ওরা মরিয়া হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেসে গেল।

জঙ্গল। পাতার বিছানা। খুব হতাশায়, কিছুই রাখা যাবে না জেনেও পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়া। চোখে জল নিয়ে মানির ঘরে ফেরা।

ওরা দুজনই দেখেছিল।

প্রায়ান্ধকার কুরুডা নদীর বুকে, পাথরে বসে এক উলঙ্গপ্রায়, কালো, ভীষণা যুবতী, তার শরীর মধ্যভাগে স্ফীত, একটা পাখির কাঁচা মাংস খাচ্ছে। টাটুই পাখি। জলের ধারে থাকে। মাংস খুব তৈলাক্ত। তাদের দেখে যুবতীটি ভীষণ হিংস্র চোখে তাকায়, নিঃশব্দে দাঁত বের করে, তারপর দুলতে দুলতে চেঁচিয়ে ওঠে আঁ আঁ আঁ। মোষের মত। মোষকে জ্বলন্ত লোহা দাগলে এমনি করেই চেঁচায়। মহাজন গোলবদনের হাজার মোষ। সেগুলো লোহার দাগে চিহ্ন করে রাখতে হয়। নইলে চুরি করে চোর, টাহাড়ের গো-হাটায় বেচে দেয়।

ডাইনী! পরসাদ ও মানি সভয়ে বলল। তারপর গোপন মিলনের সাবধানতা ভুলে গ্রামে ছুটে গেল। আকালে মুরহাইয়ের লোক গাঁ

ছাড়েনি। কুরুডা ও হেসাডি জনশূন্য। সবাই তোহ্রি গিয়ে পড়ে আছে।

খবর পেয়ে গাঁওবুড়া, বিপদ বোঝাতে নাগারা বাজায়। নাগারার গম্ভীব কর্কশ শব্দে বিপদের সঙ্কেত ছুটে আসে। এই নাগারার ডাক যে ডাইনীকেন্দ্রিক তাও সবাই বোঝে রক্তের সঙ্কেতে। কুরুডা নদীতে বান নয়, জল নেই। আগুন লাগেনি কোথাও, বুনো হাতি ঢোকে'নি গ্রামেব শস্যক্ষেত্রে। এ নিশ্চয় ডাইনী।

—ডাইনী ?

—ডাইনী।

—কোথায় ?

—কুরুডাব বুকে।

—কি কবছে ?

— কাঁচা পাখিব রক্তমাংস খাচ্ছে।

—তাহলে ?

—তাডাতে হবে।

—তাড়াব কেন ?

—কি করবি ?

—মারব।

—না আ!

পহান্ ভীষণ চেঁচিয়ে বলল, হনুমান মিশ্রের নিষেধ ও না মানলেও পারে, কেননা ও হিন্দু নয়। অথচ ও জানে, না মেনে ওর উপায় নেই। হনুমান মিশ্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এত বেশি, এত টাকা তাঁর, পুলিস ও সরকারী কর্মচারী, মহাজন ও জোতদার সবাই তাঁর এত পদানত, তিনি নিষেধ করলে ডাইনীকে পুড়িয়ে মারার আদিম অধিকার ভুলে যেতে হয়।

পহান্ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শীর্ণ হাতে নাগারায় ঘা দিল। গ্রামবাসীদের বলল, সবই অন্য রকম এখন! এমন খরা, এমন আকাশ দেখি নি। ডাইনীও অন্য রকম!

—অন্য রকম!

—হ্যাঁ।

পহান্ সতর্ক ও সন্দিগ্ধ পশুর মত ছিনে পড়া ঘাড়টি ঘোরাল। ডাইনী চোখ দিয়ে রক্ত শুষে, কচি ছেলের জান খায়।

—খায় বই কি।

এ ডাইনীর শ্বাসে মরণ। শ্বাসে মেঘ উড়ায়, গাছ আফলা করে, মাড়োয়া খেত বাঁজা করে, এ অন্য জাতের ডাইনী।

বরম্ ও পরসাদ, নিজেদের বিবাদ ভুলে পরস্পরের দিকে চাইল।

সকলে মোদের মারতে পারে, মোরা ডাইনী মারতে পারব না কেন?

—পরসাদ! তুই আমার কথা শুনবি, না আমি তোর কথা শুনব?

—আমি জানি না! আমি পরসাদ, তুমি পহান্। যা বলবে আমরা তাই শুনব। কিন্তু—

—কি?

পরসাদ গলা সাফ করে বলল, টাহাড়ের ঠাকুর ত আমাদের পাপের কথা বলে গেল, আমরা শুনে গেলাম। না শুনে বা কি করব! পাপ করেছি, পাপী বলেছে।

—কিন্তু বললি কেন?

—কিন্তু পাপ কি মোদের একার?

—তবে আমার পাপ?

শনিচরী এতক্ষণ মাথার উকুন বাছছিল। সে বলল, তুমি ভুল বুঝছ পহান্। পালা-পার্বণে তুমি! দেওতার সঙ্গে কথা চলে তোমার! পুজোয় কোন চুক হলে পাপ তোমার হয়েছে। চুক না হলে পাপ হয়নি। এখন নিজেরা নিজেদের পাপের কথা ভাববে, না ডাইনী তাড়াবে?

পহান্ বোঝে, এখন তাকে নেতৃত্ব নিতে হবে। নইলে তার সর্বশক্তিময়তা বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ জন্মাবে।

সে বলে, ছেলেরা আসুক। মেয়েরা ঘরে যাও। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরে আগল দাও। পরসাদ। তুমি আগু দলে যাও।

— কেন ?—মানি লাজলজ্জা ভুলে যায়।

—ও দেখেছে। পথ দেখাবে।

বিকেলের আলো নিভু নিভু। পহান্ আগুন জ্বালে ও হাত জোড় করে মন্ত্র পড়ে। সেই আগুনে মশাল জ্বেলে নেয় যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধরা। পেট কোঁচড়ে পাথর। তারপর পহান্ দু হাত সাপটে পাক খেয়ে দৌড়ে আগুন নিয়ে ঘুরে আসে, মাটি মেখে নেয় বুকে ও কপালে, আকাশ পানে হাত তুলে চেঁচিয়ে ওঠে, হা আবা হরমদেও, তোমার কৃপায় আমি ডাইনী খেদাই !

বলেই ও কান পাতে মাথা কাত করে। কোনো অন্ধকার মনোবিশ্বে নির্বাসিত ওর আদিম ও অক্ষম দেবতা সম্ভবত ওর ডাক শোনেন ও সাড়া দেন। পহানের মান রাখে একটি পেঁচা। পহানের বিকট চীৎকারে সন্ত্রস্ত পেঁচাটি নিম গাছের কোটর থেকে ক্যাঁ করে ডেকে উড়ে যায় অসময়ে। বিকেল ও সন্ধ্যার বিয়ের সময় পেঁচা ওড়ার সময় নয়।

পহান্ এতে অত্যন্ত খুশি হয় ও মাথা তুলে বলে, দেওতা শুনল।

এখন ওরা প্রাচীন যুদ্ধ নীতিতে ছুটতে থাকে সার বেঁধে। চীৎকার করতে করতে। গ্রামের পর বনাঞ্চল। শুঁড়ি পথ ধরে নদীর বুক। ছুটতে ছুটতে পহান্ বলে সাবধান ! মশাল সাবধান ! বন জ্বলে গেলে সবার জরিমানা, ফাটক। বন জানি না-জ্বলে।

পরসাদের বন জ্বালাতে সাধ যায়, জঙ্গল বিভাগ ও পুলিসের সঙ্গে বিবাদে সাধ যায়, বেপরোয়া মনে হয় নিজেকে। ডাইনী তাড়ানোর কাজটি ওকে দুঃসাহস এনে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে হয়, এইভাবে ছুটতে ও সব সময় পারে না। কিন্তু এখন পারছে। পারছে যখন, তখন এই ছুটে চলার গতিময়তা রক্তে থাকতেই ও মানিকে নিয়ে পালাবে। দুঃসাহসী না হলে জাত-পাঁতের বেড়া ভাঙা অসম্ভব। সব সময়ে রক্তে দুঃসাহস যোগায় না। এখন রক্ত দুঃসাহসী। ও বলে হোই দেখ।

সকলে মশাল তুলে ধরে ও দাঁড়িয়ে পড়ে। মশালের লালচে কম্পমান শিখা কুরুডার কালো জলে। পাথরে পাথরে বেধে কালো

জল ফেনিল হয়ে ছুটছে। গ্রামবাসীদের ভয়ার্ত চোখে জলের পাককে মনে হয় সাপের কুণ্ডলীর পাক খুলে যাচ্ছে।

একটি বড় পাথর। তাতে দাঁড়িয়ে এক উলঙ্গ, ভীষণ কালো যুবতী। শরীরটি তার বিকৃত, সবটা দেখা যায় না। মুখের চারপাশে পালক ও রক্ত। ওদের দেখে যুবতীটি হাত তোলে। হাতে পাখির একটা ছিন্নডানা।

—ডাইনী!

সবাই এক সঙ্গে বলে।

ডাইনীর চোখে প্রত্যাশা জ্বলে ওঠে। সে দোলে ও নিঃশব্দে হাসে।

—হাসছে!

পহান্ শীর্ণ শরীর ও রোগা হাত নিয়ে এগিয়ে আসে। ভয় তাকে হিংস্র করে তোলে। তার সঙ্গীরাও ভয়ের আক্রমণে হিংস্র।

পহান্ বলে, হরম্ দেওয়ের নামে, সকল বোঙার নামে তোমারে খেদাব।

ডাইনীও এবার হিংস্র হয়। সে দু হাত তুলে, মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের জটা পেছনে সরিয়ে বন-নদী-আকাশ চিরে চেঁচিয়ে ওঠে অঁ—আঁ—আঁ। পাথরে পা রেখে এগোয় সে, চোখ জ্বলে ওঠে।

—মার পাথর।

ঝাঁকে ঝাকে পাথর এসে পড়ে। ডাইনীও পাথর তোলে। গায়ে পাথর পড়ে। রক্ত ফেলাস্ না তোরা! রক্ত হতে শত ডাইনী জন্মাবে। ডাইনীর হাঁ নিমেষে এত বড়টা হয়!

—পাথর মারব?

—মার পাথর!

ডাইনী সজোরে পাথর ছোঁড়ে। পহানের মাথায় বাজে। পহানের গাল বেয়ে রক্ত নামে।

—মার্, মার্, নইলে ও মারবে।

পাথর পড়তে থাকে। পরসাদ তার মশাল শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। আকাশে মশালের পর মশাল। ভীষণ, ভীষণ চীৎকার। অন্ধকারে পাথর বৃষ্টি।

আঁ—আঁ—আঁ চীৎকারে আকাশ দীর্ণ হয়। ডাইনী জলে নামে ও তড়িৎ গতিতে নদীর ওপারে ওঠে।

এপার থেকে মানুষগুলি ওকে তাড়া করে, পাথর ছোঁড়ে, চেঁচায়।

আঁ—আঁ—আঁ শব্দটি ডাইনী কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝার পক্ষে সহায়ক। ছুটতে ছুটতে পহান্ বলে, ডাইনী হেসাডি পানে যায়। তা যাক। আমরা বাঁচি।

কপালের রক্ত বার বার মোছে ও এবং বিজয় উল্লাসে বলে. আজ রাতে সবাই থানে জাগবে। ঘুম নাই আজ। নাচবে, মৌয়া খাবে আজ!

—কাল কি হবে হে?

—কেন? পূজা হবে।

পহান্ আবার হরমদেওকে ডাকে ও ছোটে। ডাইনীর চীৎকার ক্রমশ পূর্বদিকের অন্ধকারে বিলীন হয়। ক্ষীণ হয়ে আসে।

জিলাদের মাঠে গেল!

যাক্! জিলাদের মাঠে এখন ডান্ পিচাশের বাতাস ঘুরে। সেখানেই তো যাবে।

সকলে গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে নদীর ধারে থমকে দাঁড়ায় ও গলা বাড়িয়ে উৎকর্ণে শোনে ডাইনীর ক্ষীণ কণ্ঠ। কণ্ঠটি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ওরা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চতুর্দিকের নৈঃশব্দ্য যেন জলের মত নিঃশব্দে গড়িয়ে আসে। ওরা ডুবে যায়, ডুবে যায়।

জলে ডোবা মানুষের মত আবার অসহায় হয়ে পড়তে থাকে ওরা। ডাইনী তাড়াবার উন্মাদনা এই নিরন্ন, আতুর, সরকার ও প্রশাসনের উপেক্ষিত মানুষগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য বুভুক্ষু নেকড়ের মত হিংস্র করে তুলেছিল।

হিংস্রতার অবসানে ওরা নিঃস্ব। হঠাৎ ওরা ভয় পেয়ে যায়।

এ ওর দিকে তাকায়।

পহান্ এই অন্ধকারেই মনের রেডার চালিয়ে ওদের মনের পালাবদল বোঝে। এদের মন বড় থসথসে, পাললিক। তাকে কেলাসিত করে

গ্রানাইট কঠিন করে তুলতে হলে ডাইনীর দিকে লেলিয়ে দিতে হয়। কিন্তু ডাইনী চলে গেলে মন আবার নরম ও ভ্যাদভেদে হয়ে পড়ে।

পহানের মনে এখন স্নেহ দেখা দেয়। অসীম বাৎসল্য অনুভব করে সে এই আতুর রঙ্কদের প্রতি। মনে থাকে না সে নিজেও নিরন্ন রঙ্ক। মনে হয়, সে রাজা।

অসীম মমতায় সে বলে, ভয় পাস কেন তোরা? অ্যাঁ? আঁধারে মুখ দেখি না, গলার স্বরে বুঝি ভয়ের শ্বাস?

—ডাইনী কি গেল?

—গেছে গেছে। আমার কপালের রক্ত আর ঝুঝায় না। শরীরেও যেন ব্যথা নেই।

—ডাইনী গেল!

—হ্যাঁ। গেল না? বাতাসে বুঝিস না?

ওরা গ্রামের দিকে ফিরল। চলতে চলতে সকলেরই মনে হল শরীরে ব্যথা-বিষ নেই। বাতাসটি সুবাতাস। শনিচরীর নাতি বলল, এবার কুরুডাতে মাছ পাব। ওঃ, মাছ লুকিয়ে রেখেছিল।

—জল হবে আবাদ হবে, গভীর বিশ্বাসে পহান্ বলল, ওরা মেঘ আটকে দেয়, খেতের ফসল লুকায়, বনে শিকারের ফাঁদ পাতলে থরা শজারু লুকায়।

— পূজা হবে?

—কাল।

—আজ?

—নাচ-গান-মৌয়া। বুক ফাটিয়ে গাইবি বরম্, ঘর হতে ঢোলক আন্ গা।

—পেটে কাপড় বেঁধে গোলবদন সাজব?

—ধুর! হোলি নাকি, যে সং সাজবি?

—মৌয়া?

—নিমচাঁদ দিবে। আমার কাছে মান্তি আছে, বেটা দেয় নাই। নিশ্চয় দিবে।

বরম্ বলল, নিমচাঁদের ভাটি হেসাডির পথে নয়? রাতে যেয়ে দরকার কি? আমি দেব মৌয়া।

পহানের থানে আগুন জ্বলল। আজ রাতে ঘুমানো নিরাপদ নয় বলেই পহানের এই উদ্যোগ। ডাইনীকে মারতে হয় বলেই পহান জানত। ডাইনীকে তাডানোর কথা এই প্রথম জানল। অজানিতের ভয় সবচেয়ে বড় ভয়। কেননা সে ভয়ের অবয়ব নেই। ডাইনী ফিরে আসতে পারে। তাই রাত জাগাই শ্রেয়।

বরম্ কালই নিমচাঁদের ভাটি থেকে নিমচাঁদের চাকরের সহায়তায় দশ বোতল এক নম্বরী মৌয়া চুরি করেছে। ত্রিশ টাকার মাল। হাটে বেচলে নগদ টাকা। আধা তার, আধা চাকরটির। খড়ের নিচে বোতল লুকিয়ে আনতে তাকে অনেক কৌশল করতে হয়েছে। আজ এই সংকটের কারণেই সে মালটি বের করল।

মাল বের করল, তার জ্ঞাতিদের হুজিমত দেবার কারণেও। সে যখন দশ বোতল মৌয়া দিতে পারল, জ্ঞাতিরাও দিক যার ঘরে যে তাড়ি আছে জ্ঞাতিরা তাড়ি আনল অন্যদের হুজিমত দেবার কারণে। তারা যদি তাড়ি আনতে পারে, সকলেই পারে। তাড়ি কার ঘরে নেই, বা থাকে না?

শনিচরী অন্য মেয়েদের সঙ্গে চালভাজা, মকাই ভাজা, পেঁয়াজ ও লঙ্কা নিয়ে চলে এল। পহান্‌কে বলল, ঘরে থাকতে বড ডর। আমরা পিঁয়াজ-মরিচ দিলাম। আমরা মৌয়া খাব না?

পহানের মুখ হাসিতে ভরে গেল। সে বলল, তোরা বড় চালাক রে! আমাকে দিয়ে কবুল করালি। খা। তোদের তাড়ি আমি দেব।

মৌয়া ও তাড়ি। মকাই ভাজার চাট। নাগারায় ঘা। বরম্ এখন গান ধরল ও সবাই ধরল ধুয়া। বহুকাল পরে গ্রামে এ যেন উৎসবের পরিবেশ। মৌয়ার নেশায় সকলেরই বুক থেকে পাষাণ নেমে গেল। হনুমান মিশ্রের ঘোষণার পর থেকে সকলে ডাইনী-আতঙ্কের জাঁতাকলে যেন বন্দী হয়ে ছিল।

সবাই যখন কিঞ্চিৎ প্রমত্ত ও গানে মাতোয়ারা, শনিচরীর ভাঙা

কোমর ছুলিয়ে নাচ দেখে হাসতে ব্যস্ত, পরসাদ ও মানি চোখে চোখে তাকাল।

এই রাতে, এই পরিবেশে কি যেন ছিল। পরসাদ মাথা হেলিয়ে ইশারা করল। দুজনে একটু একটু করে পিছোতে পিছোতে পহানের ঘরের পেছনে গেল।

পরসাদ মানির হাত ধরল। এই রাতে, এই পরিবেশে কি যেন ছিল। মানি নিজেকে ছেড়ে দিল পরসাদের হাতে।

দুজনে ছুটে চলল এবার। হেসাডর দিকে নয়, তোহ্রির দিকে। অত্যন্ত আবদ্ধ এদের জীবনে তোহ্রিই হল বহির্জগতের দরজা। তোহ্রি থেকে কাঠবাহী ট্রাকে চলে যাওয়া যায় রাঁচি, হাজারীবাগ, ধানবাদ।

পহানের বউ ওদের যেতে দেখল। ও কিছুই বলল না। পরসাদের বউ ওকে বাঁজা বলে ঘেন্না করে, ওর হাতের প্রসাদী লাড্ডু নেয় না। পহানী সেই শোধ এখন নিল।

পরদিন, গ্রামের লোকজনকে ও অবশ্য বলে। যারা ডাইনীকে আগে দেখে, তাদের সাধ্য কি, যে অন্যায় দুষ্কার্যের আহ্বান উপেক্ষা করে? এইভাবে পরসাদ ও মানির পালাবার ঘটনাটিও ডাইনী-কাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত হয়ে গিয়ে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত পেয়েছিল।

কুরুডা বেল্টে ডাইনীর ব্যাপারটি রঙিন ছবিসহ এক চিত্তাকর্ষক রম্য-রচনায়, মার্কিনী পত্রিকায় অনেকেই পড়ে থাকবেন। সকলের পড়ে ওঠা সম্ভব নয়, কেননা পত্রিকাটির দাম বর্তমানে বারো টাকা এবং পত্রিকাটি কিনে পড়া অধুনা শিক্ষার অঙ্গ বলে বর্ণিত হয়। যাঁরা স্বদেশের শুভার্থে ইংরিজী তুলে দিচ্ছেন তাঁরাও লুকিয়ে লুকিয়ে ঝটিকা বেগে মিটিং থেকে মিটিঙে ট্যুর করতে করতে পত্রিকাটি পড়েন ও সাফাই স্বরূপ বলেন, প্রতি-পক্ষ কি ভাবছে, তা জানতে হবে বই কি! কিন্তু বিষয় হল, উক্ত পত্রিকা যাঁরা চালান, তাঁরা জানেন না, এই মিটিং-ব্যস্ত বাবুসকল তাঁদেরকে 'প্রতি-পক্ষ' ভাবেন। এ সংসারে এইভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়সকল অজানা থেকে যায় এবং কবির সেই গানের সত্যতা প্রমাণ হয়, 'জয়, অজানার জয়!'

এই সকল বাবুরা অত্যন্ত প্রত্ন-প্রেমী। তাঁরা ইংরিজী তুলে দেন ও বোঝান, ইংরিজী সত্বর এক প্রত্নশালার প্রদর্শে পর্যবসিত হবে।

যেহেতু ইংরিজী হারিয়ে যাবে, বা ভারতভূমে মারা যাবে, সেহেতু তাঁরা নিজেদের ছেলেপুলেকে ইংরিজী মাধ্যম স্কুলে পড়িয়ে থাকেন। বাবুদের মানসিক প্রক্রিয়া খুবই জটিল বা সরল। একই মানসিকতার কারণে তাঁরা ঢোকরা কামার বা পুরুলিয়ার মুখোশশিল্পী, বা পোড়া মাটির ঘোড়ার কুমোরদের গোষ্ঠীগত মৃত্যু ত্বরান্বিত করেন এবং তাদের তৈরি শিল্পবস্তু কলকাতায় দেখলে 'গণশিল্প' বলে চেঁচান।

কুরুডার ডাইনীব খবর আন্তর্জাতিক খবর হয়ে ওঠার পেছনের খবরও কম চাঞ্চল্যকর নয়। খবরটি সংগ্রহ করে যিনি লেখেন, তিনি পাটনাস্থিত সেই শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণভক্ত, যিনি হনুমান মিশ্রকে অস্ট্রেলীয় গাওয়া ঘি সরবরাহ করতে চেয়েছিলেন।

এই শ্বেতাঙ্গের নাম পিটার-ভারতী। ভারতে এ বরাবর থেকেই গেল এবং নানা রূপে দেখা দিল। লোকভারতীর পাগলা, কবিপ্রাণ ছাত্ররূপে এ একদা শালবনের ছায়ায় 'এই তো ভাল লেগেছিল' গেয়ে ফিরত।

রূপান্তরে এ স্বদেশে ফিরে গেল ও বছরখানেক বাদে ইতিহাস-গবেষকরূপে ফিরে এসে ভারত-নেপাল বর্ডারে বসে থাকল। সে সময়ে ইতিহাস ছেড়ে সে নেপাল-ভারত বর্ডারের ম্যাপ আঁকত। পুনর্বার সে স্বদেশে উধাও হল।

রূপান্তরে সে পর্বত-বিশারদ ভূতাত্ত্বিক হিসাবে ভারতে ফিরল এবং কলকাতায় কোন পাহাড় নেই জেনেও কলকাতায় বসে থাকল এবং মুক্তির দশকের কালে নানাবিধ সরল আচরণ করতে থাকল। কলকাতার দেওয়ালের লিখনের, ভিখিরিদের, কালীঘাটে বধ্য পাঁঠাদের, উপছে-পড়া ডাস্টবিনের ছবি তোলার মত সরলতা দেখাল। চড়কের মেলায় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পদ্মপুকুরে নাচল। গয়লাদের সঙ্গে তারকেশ্বরে জল বইল। এইসব করতে করতে সহসা একদিন সে বহু রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফারের সামনে গ্র্যাণ্ড হোটেলে মূর্ছা গেল।

জ্ঞান ফিরতে সে এক রূপান্তরিত সায়েব। তখ'নি সে বলল, স্বপ্নে এক বিশালকায় সন্ন্যাসী তাকে বলেছেন ওরে পাগল! আর কত পরশপাথর খুঁজবি?

বলেই তিনি হাঁ করেছেন। তাঁর হাঁয়ের মধ্যে পিটার দেখেছে যুগে যুগে তার ভারতীয় রূপ। তারপর দেখেছে তাঁর মুখের হাঁয়ে পাটনা স্টেশনের ছবি। অতএব পাটনাই তার নিয়তি এবং নির্দিষ্ট স্থান।

শেষ রূপান্তরে পিটার পাটনা আসে। কৃষ্ণের দয়ায় নিমেষে সব হয়ে যায়। কৃষ্ণচেতনা আশ্রম, দেশী-বিদেশী সেবক-সেবিকা, সারি সারি স্টেশন ওয়াগন, টাকারও অন্ত থাকে না। কেননা বহু ধনীজন এসে সাশ্রুনয়নে ব্ল্যাংক চেক পিটারের হাতে দিয়ে ধন্য হল। স্বামী আনন্দভারতী পিটারকে দীক্ষা দিয়ে পিটার ভারতী করে, তার হাতে আশ্রম সঁপে, এরোপ্লেনে হিমাচলে উড়ে চলে যান।

পিটার-ভারতীর ভারতপ্রেমকথা সুবিদিত। জন্ম থেকে জন্মে সব সূত্রে বাঁধা তার। তার আশ্রম লোকভারতীর শালবন-প্রেমিক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর, নেপালের হিপিদের, আশ্রমটির বাতাসে সব সময়ে শান্তিসংগীত বাজে লুক্কায়িত স্টিরিওতে। ফলে এখানে ঢুকলেই আনন্দ হয়।

হনুমান মিশ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হবার ফলে পিটার-ভারতী প্রথমে ডাইনীর খবর পায় এবং সংবাদটিতে আগ্রহী হয়। যেহেতু পিটার-ভারতীর ওপর ভারতীয় দেবতাবৃন্দের অপার কৃপা, সেহেতু সে ডাইনীর খবর অনুসরণ করতে থাকে।

নিজে করে না। তোহ্‌রিতে সে পেয়ে যায় শরণ মাথুরকে। মাথুর স্কুলশিক্ষক, পাটনায় তার শ্বশুর একটি হিন্দী দৈনিকে প্রধান সংবাদদাতা। ফলে মাথুর মাঝে মধ্যে স্থানীয় সংবাদ ছোট প্রবন্ধ হিসেবে লিখে পাঠায় ও ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে স্বর্গসুখ পায়।

তোহ্‌রির মত গঞ্জ জায়গা থেকে পাটনার কাগজে লেখা ছাপাবার ফলে মাথুরের স্থানীয় প্রতিপত্তি প্রচুর। মাথুর অত্যন্ত ধনী কন্ট্রাক্টরের ছেলে হয়েও অতীব সৎ, পরিশ্রমী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বর্তমানে সে

এখানকার প্রাচীন এক কোল বিদ্রোহের ইতিহাস লেখার জন্যে উপাদান খুঁজছে। এটি হবে তার ডক্টরেটের থিসিস।

তথ্য সংগ্রহের কারণে গ্রাম ঘুরছে বলে কুরুডা নদী-বহতা অঞ্চলটি তার পরিচিত।

পিটার-ভারতীর সঙ্গে মাথুরের একটি ব্যবস্থা হল। পিটার বলল, তুমি সম্পূর্ণ খবরটা দেবে। শেষ অবধি কি হয় তা দেখবে। আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দেব।

মাথুর এ কথা শুনে ধূসর হাসল। বলল, আমার বাবা এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় কাঠের কণ্ট্রাক্টর। টাকা তাঁর অনেক। আমি মাস্টারী করি বলে তিনি খ্যাপা। আমি টাকার জন্যে এ কাজ করব না।

—তা হলে ?

—আমার এই ডাইনীর ব্যাপারে অন্য সন্দেহ হচ্ছে। আমি নিশ্চয় তোমায় রিপোর্টাজ পাঠাব। কিন্তু যখন লেখাটা বেরোবে, আমার নাম তুমি ছাপার অক্ষরে স্বীকার করবে।

—নিশ্চয।

আমার রিসার্চের কাজের জন্যে আমাকে তো ওসব জায়গায় যেতেই হয়, তাই টাকা তোমাকে খরচ করতে হবে না, নামটা চাই।

এইভাবেই কথাবার্তা হয়। এখন, উক্ত ইংরিজী পত্রিকার পাঠক বলতে পারেন, লেখাটিতে শরণ মাথুরের নাম তো ছিল না ?

এর উত্তরে দুটি কথা আসে।

(এক) নাম থাকবে কেন ? মাথুরের সঙ্গে কথা হয় পিটার-ভারতীর। লেখাটি বেরোয় কুর্ট ম্যুলারের নামে। কুর্ট ম্যুলারের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না মাথুরের নাম স্বীকার করবার।

(দুই) মাথুরের রিপোর্টে আকাল-মুরহাই-হেসাডি, ক্রমানুবর্তী বিবরণ ছিল। মুদ্রিত লেখা যে চেহারায় বেরোয় তার সঙ্গে মাথুরের বিবরণীর কোন মিল নেই।

কুর্ট ম্যুলার অসাধ্য সাধন করে।

য়ুরোপীয় ডাইনী-নির্যাতন, নাৎসী ও অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসনে

কম্যুনিস্ট বা ইহুদী-নির্যাতন ইত্যাদির সঙ্গে মিশে ডাইনী খোঁজার লোমহর্ষক বিবরণ তার হাতে এক রগরগে গল্প হয়ে ওঠে।

প্রবন্ধটিতে প্রচুর ছবি ছিল।

সেবিকা আইলীন-ভারতীকে কালো রঙে চুবিয়ে ডাইনী সাজিয়ে ছবি তোলা হয়। টাটুই পাখি ভক্ষণনিরত ডাইনীর হাতে মুরগির রোস্ট দেখে মাথুর তাজ্জব বনে। কাহিনীর শেষে ডাইনীর ক্লোজ-আপে মুখের অভিব্যক্তি এমন যথাযথ হয়, যে আইলীন-ভারতী ওই মুখচ্ছবির জোরে, উক্ত কাহিনীর ভিত্তিতে যে ছবি হবে, সেই 'দি উইচ' ছবিতে নায়িকার ভূমিকা পাচ্ছে। ছবিটি আমেরিকার আরিজোনায় তোলা হবে। কেননা, সেখানকার ভূ-প্রকৃতি পালামৌয়ের ভূ-প্রকৃতির সদৃশ। ছবিটির বৈশিষ্ট্য হল, তাতে ভারতীয় ভূমিকায় শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ ভূমিকায় ভারতীয়রা অভিনয় করবেন।

মাথুর এত ঘটনাবহুলতা কল্পনাও করে নি। বিশ্বাসভরে সে নিজের সাইকেল নিয়ে ডাইনী-কাহিনীর অনুসরণে লড়ে যায়।

ডাইনীর দ্বিতীয় খোঁজ মেলে হেসাডিতে।

হেসাডির লোকজন ডাইনীর ব্যাপারে প্রথমে ভীষণ ভয় পায়। যে-যার ছায়া দেখলে সভয়ে দেখে ছায়াটি সঙ্গে লেগে আছে কিনা। রজস্বলা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের স্বজনরা সন্দেহের নজরে লক্ষ্য করে। কালো গরু, ছাগল ও কুকুর চামড়ার কারণে ঢিল খায়।

ডাইনী-ভীতির এই আবশ্যিক অনুষ্ঠান মানা হয় অক্ষরে অক্ষরে। পহান্ যথারীতি সজাগ থাকে এবং পূজার ফুল মাটিতে পুঁতে রাখে, মুরগির গলা ছিঁড়ে গরম রক্ত সর্বত্র ছেটায়।

এরপর যখন ডাইনীর খোঁজ মেলে তখন সকলেই নিশ্চিন্ত হয়। সব গ্রামেই যেহেতু সপ্তাহের বার অনুযায়ী নর-নারীর নামকরণ অধিক প্রচলিত, সেহেতু সর্বত্রই এতোয়া-এতোয়ারি, সোম্‌রা-সোম্‌না-সোমা-সোমাই-সোম্‌রি-সোম্‌নি, মংলা-মোঙল-মংরা-মংরী মুংলি-মোংলি, বুধাই-বুধ্‌না-বুধিয়া-বুধ্‌নি, বিস্‌রা-বিরসা-বিস্‌রি, শুকিয়া-শুকচর-শুখ্‌নি-শুক্‌চরী, শনিচর-শনিচরী নামের প্রাবল্য।

হেসাড়ির শনিচরী বর্তমানে বড়ই ব্যস্ত। সে হেসাড়ি গ্রামের ধাই, আঁতুড়ের ভূতঝাড়ানী, শিশু চিকিৎসক। ফলে তাকে সর্বদা বন বাদাড় ঘুরে জড়ি-বুটি শেকড়-পাতা-কন্দ যোগাড় করতে হয়। এতদিন ডাইনীর ভয়ে ও বনে ঢোকে নি।

নাতিটা ওর ন্যাওটা। ছেলেকে মার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ওর ছেলে ও বউ মরেছে। ছেলেটা মাত্র সাত বছরের। সংসারের সাহায্যে আসে না। শনিচরী অগত্যা নিজেকে গ্রামজীবনে অপরিহার্য করে তুলেছে। ওর ক্ষমতা বেনে দোকানের দোকানী ভগত বিশ্বাস করত না। লোকটার বউ পরপর মরা ছেলে বিয়োল তিন বার। সবাই বলল এ শনিচরীর কাজ।

শনিচরীর দোর ধরতে হয় ভগতকে। অবশেষে শনিচরী জলপড়া-তেলপড়া-তেলমালিশ ইত্যাদি করে ভগতগিন্নির সুপ্রসব করায়। ভগতদের দেওয়া মাড়োয়া বা ভুট্টা এখনো ওর জীবন রেখেছে। 'বিখিল' বা চাল শনিচরীদের কাছে দূরের স্বপ্ন। পাল-পার্বণে চালের ভাত মেলে। ভুট্টা বা মাড়োয়ার জলীয় ঘাটোই ওদের প্রধান খাদ্য।

ডাইনীর ব্যাপারটি নিয়ে শনিচরী ও পহানের মধ্যে একটি গোপন আলোচনা হয়েছে।

শনিচরী বলেছে, কি বুঝ?

—তুই কি বুঝিস?

—তুমি থাকতে আমি বুঝব? তুমি পহান। তুমি যা বলবে আমরা তাই মানি।

—তুই বল না আগে!

শনিচরী ঘাসের বোঝা নামাল। হেসাড়ি বাসজংশনে গোয়ালাদের কাছে ওরা ঘাস বেচে। বাসজংশনের নামও হেসাড়ি, কিন্তু শনিচরীদের কাছে ওটি 'কোহা হেসাড়ি' বা 'বড় হেসাড়ি'। সাত মাইল ভেতরে ওদের গ্রামটি আদি হেসাড়ি।

ঘাসের বোঝা নামিয়ে শনিচরী অন্য মেয়েদের হেঁকে বলল, তোরা যা, আমি পহানের সঙ্গে কথা বলি।

—পহানী জানে ?

মেয়েরা হেসে চলে গেল। পহান্ শনিচরীকে একটি বিড়ি দিল, নিজে একটি ধরাল।

শনিচরী বলল, কি রকম হল ? মুরহাই হতে ডাইনী হেসাডিপানে এল যদি, তবে তার ওঁ শুনলাম না ? জিলাদের মাঠে গেল যদি, তাহলে সেখানে ডাঙ-পিচাশের হাসি শুনলাম না ? বিন্কো (মেঘ) এল, বাদালি (বৃষ্টি) হল, এ তো হবার কথা নয় ?

পহান নিশ্বাস ফেলল ও আধখানা বিড়ি নিবিয়ে ট্যাকে রাখল। ভুরু কুঁচকে বলল, ডাইনী যদি, তবে পুড়াব না কেন ? তার রক্ত হতে ডাইনী জন্মাবে বলে কাটব না। পুড়াব না কেন ?

এ কথায় শনিচরীর হাত গালে উঠল, শনিচরী হাত বোলাল।

পহান্ বলল, মনে আছে ?

—মনে আছে।

—তুই-আমি আমার মায়ের দুধে মানুষ। আমি তখন খাদটা (ছোট ছেলে), তুই ছোটা মুকাহিকি (ছোট মেয়ে)। মনে পড়ে ?

—মনে পড়ে। তোমার মুখে ছিল এক কথা। কিরা লাগেংগা (খিদে পেয়েছে)।

—তুই বলতিস, মালু কুলার আরগুড়া (পেট ভরেনি)। তা এ কথা আমরা বলেছি, আমাদের বাপ-মা বলেছে, আমাদের ছেলে-মেয়ে বলেছে। তোর নাতিও বলবে। কিন্তু সে কথা বলি না।

শনিচরী আবার গালে হাত বোলাল। বলল, তোমার কাকা, সে হল ডান্ !

—ঘরে আগুন দিয়ে তাকে পুড়ায়ে ··

—সে আগুন ছিটকে পড়তে আমার গাল পুড়ে যায়। দাগ আছে।

—ডান্ পুড়াতে জল হল মাড়োয়া হল, নদীতে মাছ, স—ব আকাল দূরে গেল।

— কি হল এখন বুঝি না।

— আমার মনে হয়···

কি

পহান্ গভীর অস্বস্তিতে আবার সেই আধখানা বিড়ি ধরাল। চকমকি, শোলা ইত্যাদির পর বিড়ি ধরিয়ে সে বলল, কারেও বলিস না। আমার সন্দ হয়, টাহাড়ের বাস্তন দেওতা তো আমাদের ঘর জ্বলতে দেখলে জল না ঢেলে কেরোসিন ঢালে, এমন ভালবাসে। ছোট জাত, জুতোর নিচের ধুলা তোরা, এ বিনে কথা নাই মুখে। আমার সন্দ হয়, সেই ডাইনী-ডাইনী রব উঠাল, ডাইনী নাই!

—ডাইনী নাই!

—সন্দ হয়, নাই!

—মুরহাইতে ওরা··?

—আন্ধি ধুকায় (আঁধারে) কি দেখল কে জানে? ভালুক হতে পারে।

—ডাইনী নাই!

—সন্দ হয়। বাতাস সুবাতাস, বনে ভয়ডর নাই, মরতে মরতে বুধনার ছেলেটা বেঁচে উঠল। ছেলের জান খায় না, বাতাসে শাঁ ফেলে না বনের জানোয়ার তরসায় না, এ কেমন ডাইনী?

—দেখ! পূজা করে দেখ! গনে গেঁথে দেখ! জানলে তুমি জানবে, আমরা জানব না।

—কারেও বলিস না।

—না না

শনিচরী অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে পড়ল। কিন্তু ক্রমে ওর মনে সাহস ফিরতে লাগল। পহান্ যদি বলে থাকে, তবে পহান্ না-জেনে বলে নি। ডাইনী নেই! ডাইনী নেই যদি, তাহলে ও কেন জিলাদের মাঠে যাবে না?

'জিলাদের মাঠ' শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পাথুরে প্রান্তরে বিশাল বিশাল পাথর! পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কলটুলি ও গোলি গাছ। গোলি গাছের শিকড় শনিচরীর খুব দরকার। বিকেলে সূর্য ডুববে। বর্ষার আকাশে লেগে থাকবে আভা। তখন চুল খুলে শনিচরীকে গোলি গাছের শিকড় উঠাতে হবে।

সেই শিকড় হল মৃতবৎসার ওষুধ। ভগতের বউয়ের আবার সন্তান হবে। একটা বেঁচে গেছে। কিন্তু মরুঞ্চে পোয়াতি যতবার পেটে ফল ধরে, ততবারই সাবধান হতে হয়।

জিলাদের মাঠে বিকেলে কেউ যায় না। শনিচরীদের সমাজে এখন মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হয়, গুল্‌দা (চিতা) জ্বেলে জ্বালানোও হয়। হিন্দুরা আসার পর থেকে গুল্‌দায় জ্বালানো চলেছে।

আদিম যুগে চলত সমাধি। সমাধির ওপর পাথর দেওয়া হত। সেইসব জনপদ কবে চলে গেছে। জিলাদের মাঠ এখন এক পরিত্যক্ত শ্মশান-পাথরের মাঠ। সবাই জানে, সন্ধ্যে হলে পাথরগুলি জেগে ওঠে ও চলে ফিরে বেড়ায়।

শনিচরী ও পহানের ভয় করলে চলে না। ওখানে যায় শনিচরী। ওখানকার গোলি গাছের শিকড়ের গুণ বেশি।

ওখানে যায় পহান্‌। মাঝে মাঝেই ও মনে বোঝে, পাথরগুলি ছোটাছুটি বড্ড বাড়িয়েছে। বড্ড অস্থির ও অশান্ত হয়েছে আদিম ওঁরাওদের আত্মা।

হবারই কথা। মৃতকে সমাধি দিলেই হয় না। পরিবারে কেচ্চা (মৃত্যু) ঢুকলে, উল্লোচোত (অশৌচ) শেষ হলে, পূর্বপুরুষের সমাধি-প্রস্তরে জল চাল লবণ রাখা নিয়ম। জিলাদের মাঠে যাদের সমাধি, তাদের বংশধরা কে কোথায় গেছে কে বলবে? কিন্তু পরলোকে কি প্রেত না খেয়ে শুকাবে?

তাতেই আত্মারা অস্থির হয়। তাতেই পহান্‌কে ছুটতে হয় মাঝে-মধ্যে। জীবিত গ্রামবাসী ও মৃতদের আত্মা, সকলের প্রতিই কর্তব্য থাকে পহানের। যে পহান্‌ তা না মানে, সে পহান্‌ হবার অধিকারী নয়।

শনিচরী তাই পহানের কথায় সাহস পেল। ভগতের বউকে বলল, কাল ওষুধ আনব। আজ গোহাল কেড়ে রেখ, ঘরদোর মুক্ত করে রেখ।

—আর কি লাগবে?

—চাল-সুপারি-তেল কালোছাগলীর রোম-গোমূত্র—নতুন লোহার চাবি একটা। গর্ভের ভারে ভগতের বউ বড়ই কাতর। বলল, পেটে কি লোহার ছেলে এল, শনিচরী? এমন কষ্ট পাচ্ছি?

—তেল মালিশ কর, হাঁটাচলা কর, বসে থেক না। বসে থাকলে পরে কষ্ট।

—বাঁচব কি?

—নিশ্চয়।

—ভাই বলে পাঠাল, শহরের হাসপাতালে নিতে বলল আমাকে। স্বামী রাজী নয়।

—হাসপাতালে ছেলে বদলে দেয়।

—তুই দেখ, কি করতে পারিস।

—দেখি। তবে মা-ছেলে ভালয় ভালয় দু-ঠাঁই হলে ভুলে যেও না।'

—দেব, আংটি দেব।

—আংটি নেব না। একটা বক্‌না বাছুর।

—দেব।

বক্‌না মানে গাই। গাই মানে গাভীন্ গাই। দুধ বেচ, বাছুর বড় করে বেচ, ঘুঁটে দাও। একটা গাই থাকলে নাতির জীবন চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে শনিচরী ঘরে গিয়ে খস্তা নিল। নিমেগিমে বিকেলে জিলাদের মাঠ থেকে গোলি গাছের শেকড় নেবে।

নাতি বলল, কিরা লাগেংগা (খিদে পেয়েছে)।

শনিচরী ওকে এক খুঁচি ভুট্টার খই দিল। ভগতের বউ দিয়েছিল।

জিলাদের মাঠে যেতে যেতে শনিচরীর মনে হল দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য চাঁদ-সূর্যের মত চিরকালীন। এই 'কিরা লাগেংগা' আর 'মালু কুলার আরগুড়া' (পেট ভরেনি)।

তা কা-বেড়ে-চান্দো-বিল্‌কো—হাওয়া আকাশ চাঁদ তারা চিরকালের। 'খিদে পেয়েছে' আর 'পেট ভরে নি' কথাদুটিও চিরকালের। নিশ্চয় আদি অতীতেও কোনো ওঁরাওয়ের পেট কোনোদিন ভরে নি। নিশ্চয় কথাদুটির সৃষ্টি সে কারণেই।

শনিচরীর মনে হল, হেসাড়ি গ্রামের ওঁরাও বুড়ি আন্দাজে সে মস্ত কাজের কাজ করতে চলেছে। ভগতের বউকে খুশি করে, বক্‌না বাছুর নিয়ে, নাতির ভবিষ্যতের হিল্লে করে দিচ্ছে।

সোজা কথা? একটা গাই গোহালে? দুধ বেচ, ঘুঁটে বেচ ভগতের বউকে, বাছুর বেচ? হেসাড়ির মত গ্রামে ওঁরাও একজন, সারা জীবন বেঁচে, অন্তিমে স্বোপার্জিত কিছুই রেখে যায় না দেখাবার মত। সমাধির পাথর ছাড়া। পাথর তো জড় ও মৃত। শনিচরী একটা গাই রেখে যাবে। গাই মানে জীবনধারণের উপায়।

যে বকনা হাতে পায় নি, তার সুখস্বপ্নে বিভোর থেকে শনিচরী মাঠের মাঝে চলে এল। এখানে মনোলিথ ঘন-সন্নিবিষ্ট। দেখে মনে হয়, মাঝের সুউচ্চ, থাম্বা-সদৃশ পাথরছুটি আদি জনক-জননী। অন্য পাথরগুলি ওদের ছানাপোনা। ওই পাথরগুলির মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে নিঃশব্দে কুরুভার শাখা নদী জিলাদ। জল সিঞ্চনে পাথরের গোড়ার মাটি সরস। সেখানে সাদা ফুল নিয়ে আলো করে আছে গোলি গাছগুলি।

শনিচরীর চোখ আঁধারে হারাচ্ছে। আকাশে আলোর আভা, প্রান্তর অন্ধকার। পাথরের গোড়ায় অন্ধকাব আরো ঘন। শনিচরীর বয়স অনেক। চোখ ঝাপসা হয় দিনেমানেও। ও দেখল এক জায়গায় অন্ধকার যেন বিছিয়ে গেছে, ঢেলে দিয়েছে কেউ, ও খস্তা চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠল যেন মনোলিথ, গর্জে উঠল সমাধি প্রস্তর, আদিম অন্ধকার ধরল বিবৃত রমণীরূপ, দু হাত তুলে, আবছা আকাশ পানে চুল উড়িয়ে অন্ধকারটি চেঁচিয়ে উঠল, আঁা—আঁা—আঁা।

শনিচরী নিশ্চল, ভয়ে স্থাণু। ডাইনি পাথর তুলল ও এক হাতে পাথরে ভর দিয়ে শনিচরীর গায়ে পাথর মারল।

, শনিচরী কি করে তখন ছুটে পালায় তা ও নিজেও জানে না। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সহজাত বলেই হয়তো ডাইনীকে দেখার পরেও ও খস্তা ফেলে নামে পাথর বেয়ে ও ছুটতে থাকে।

পেছনে পায়ের শব্দ। 'আঁা—আঁা—আঁা' বিকট আর্তনাদে প্রান্তর ও আকাশ দীর্ণ। প্রাচীন ওঁরাওদের সমাধির পাথরগুলি চঞ্চল।

শনিচরী হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ে ও চেতনা হারাতে হারাতে গায়ে প্রেত আঙুলের স্পর্শ পায়। তারপর সব অন্ধকার হয়ে যায়।

ওখানেই ও পড়ে থাকে, পড়ে থাকত। খুবই আশ্চর্য ঘটনাব যোগাযোগ। সেই বিকেলেই মাথুর এসে যায় হেসাড়ি। পহান্ ওর পুরনো বন্ধু। পহানের জন্যে ও এক বোতল এক নম্বরী মাল এনেছিল, দেয়। আদিবাসী গ্রামে পহান্ যাকে মেনে নেয়, সে স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

মাথুর বলে, কোহ্‌া হেসাড়িতে রাতে থাকব। তোমার সঙ্গে কথা আছে!

—গিধনা ওঁরাও আর ইংরেজের লড়াইয়ের কথা তো বলেছি!

—সব কথা বল নি।

—কি বলি নি?

—তুমি সেই গিধনা ওঁরাওয়ের নাতির নাতি, তা বল নি।

—বলে কি লাভ?

—লুকোলে কেন?

পহানের চোখ ধূসর হল, অ-আদিবাসী সকল মানুষের প্রতি রক্তে লালিত অবিশ্বাস নামল চোখে।

ও বলল, বলে কি লাভ? গিধনা ওঁরাওয়ের ফাঁসি হয়। তার ভাই কাল্‌না মরে গুলি খেয়ে। তারপর আমার পূর্বপুরুষরা ঘর ছেড়ে পালায়। বলতে গিয়ে কি মরব?

—এখন বললে ভয় কি?

—আমাদের ভয় সকল সময়ে। তুমি তা জানবে না। অত কথা কেন? মদ খাও। বিড়ি এনেছ, বিড়ি দাও।

—আরেকটা কথা।

—কি?

—শনিচরীকে ডাক। সে নাকি ডাইনী পিশাচের খবর রাখে বলেছিলে?

—এই আসবে।

—কোথায় গেছে ?

— জিলাদের মাঠে।

—ডাইনির ভয় নেই ?

পহানের চোখ ধূর্ত ও সতর্ক হল। সে বলল, ও হয়তো ডাইনীর ভয় করে না।

মাথুর সামনের দিকে চেয়ে নিরাসক্ত গলায় বলল, হয়তো ডাইনী নেই। হয়তো হনুমান মিশ্র কোনো পুরনো রাগের দাদ তুলতে ডাইনীর গল্প বাতাসে ছেড়ে দিয়েছে ?

বাপ্তোন! দেওতা! পুলিস অফিসার, এম. এল এ. সবাই তাঁর বাড়িতে ওঠে, পায়ে গড়াগড়ি যায়। পাটনা থেকে সাহেব এসেছিল সেদিন। তিনি মিছে গল্প ছাড়তে পারেন ?

এবার দুজনেই হাসল। পহান্ বলল, তুমি বড় চালাক গিধড়। নিজে যা ভাবছ, আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও।

—তুমি কি কম গিধড় ?

—কি যে বল !

—মদ খাও ?

—শনিচরী আসুক।

কিন্তু শনিচরী এল না। খোঁজ নিতে জানা গেল, সে ফেরে নি মোটে। পহান বলল, তবে তো খুঁজতে যেতে হয়। পাথরে বেজে পড়ে গেল নাকি ?

জিলাদের মাঠে সন্ধ্যের পর কেউই যেতে চায় না। অবশেষে পহান্ আর মাথুর রওনা হল।

ওরাই জিলাদ নদীতীরে, বালিতে অচৈতন্য শনিচরীকে পায়। শনিচরীর পিঠ কে নখে ছিঁড়েছে। বালিতে পায়ের দাগ। দুজনেই ঘাবড়ে যায় ও মাথুর বলে, আমি ওকে পিঠে বয়ে নেব। তুমি টর্চ জ্বালিয়ে আগে আগে চল।

ওদের কথা শেষ হতে না হতে সামনে, জিলাদ ও কুরুডার সঙ্গম থেকে একটা হাসি উঠে আসে। সে পরিবেশে সে হাসি যথেষ্ট অমানুষী।

হাসির পরই আসে প্রান্তর চিরে ফেলা 'আঁ—আঁ—আঁ' শব্দ। পহান্ ও মাথুর অবিশ্বাস ও সংশয়ের উত্তর পায়। এ ভাবেই মাথুর, ডাইনীর ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে জড়িয়ে পড়ে।

কি ভাবে পহান্ ও মাথুর শনিচরীকে নিয়ে আসে, সে তার পরে মনে করতে পারেনি। সেই চীৎকার ও হাসি ওদের পেছন-পেছন ছোটে। মাথুরের মনে বহুবার ইচ্ছে যায়, শনিচরীকে নামিয়ে রেখে ফিরে যায়, টর্চ ফেলে দেখে। কিন্তু অচৈতন্য শনিচরী তখন টপ প্রায়োরিটি।

গ্রামে একে পহানের ঘরেই নামানো হয়। পহান ওর শুশ্রূষার ভার নেয়। মাথুর দেখে, সংশয়ী পহান নিমেষে হনুমান মিশ্রের সব-শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী হচ্ছে।

পহান্ নিজেকে অভিশাপ দেয় ও বলে, 'কিছু বুঝি নাই।'

—কি বুঝবে?

—ডাইনী ছিল।

মাথুরের খুব ইচ্ছে হয়, টর্চ হাতে একলা চলে যায় ও ডাইনীকে খোঁজে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য রকম। আতঙ্ক লোকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে হিংস্র ও বর্বর সৈন্যের মত ডাইনী-বিতাড়নে নামাচ্ছে।

ডাইনী-ভীতিতে ভয়ার্ত হবার কয়েকটি নিয়ম আছে। নিজের ছায়া সঙ্গে লেগে আছে কিনা দেখ, রজস্বলা ও গর্ভবতী মেয়েদের চালচলন সন্দেহের চোখে দেখ, কালো গাই-কুকুর দেখলে ঢিল মেরে দেখ সে চেহারা পাল্টে ফেলছে কি না।

রাতে কেউ ডাকলে সাড়া দিও না। বেপট জায়গায় ধুলোর ঘূর্ণি উঠলে বাতাসকে ভয় পেও। চিল-কাক-শকুনির সাক্ষাতে কথা বোল না। ওরা ডাইনীর দূত। শিশুদের সামলে রেখ। ওদের কচি রক্ত ডাইনীর বড় প্রিয়।

ডাইনী-বিতাড়নেরও নিয়ম আছে।

সংকল্প-কঠিন মুখে পহান্ নাগারায় ঘা দেয়। চামড়ার নাগারায়, পহানের চামড়ার নাগারায় বিপদের সংকেত বড় ভীষণ হতে পারে, বুক কাঁপানো।

নাগারায় ঘা পড়ে। পুরুষরা এসে দাঁড়াতে থাকে। তাদের হাতে মশাল, কোঁচড়ে পাথর। মেয়েরা শিশুদের নিয়ে ঘরে ঘরে দোর দেয়। পহানের দিকে অভিযোগ-ভরা চোখে কেউ চায় না। পহানের মুখ বেদনাবিদ্ধ। সংকল্পে কঠোর। চোখ তীক্ষ্ণ।

মাথুরের রিপোর্ট, পিটার-ভারতীকে—গ্রামের সকল পুরুষ জমায়েত হতেই পহানের নেতৃত্বে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার সামনে একটা আশ্চর্য নাটক হচ্ছিল। আমি তার ভেতরে যেতে পারছিলাম না। এটি ওদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি বর্ণ হিন্দু, বাইরের মানুষ, দর্শক হয়ে হাঁটছিলাম।

জিলাদ ও কুরুডার সঙ্গমের ওপারে বন। বনটি নিবিড়। জঙ্গল বিভাগ এক সময়ে মাটি উপযুক্ত দেখে খয়ের গাছ লাগায়। খয়ের গাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় ও বনের অন্য গাছের ফাঁক-ফোকর ভরে ফেলে।

কিন্তু খয়ের গাছ লাগাবার উদ্দেশ্য যা, কুটিরশিল্প হিসেবে খয়ের তৈরি করে স্থানীয় আদিবাসীদের অবস্থা ফেরানো, তা হয়ে ওঠেনি। বনবিভাগ দেখেছিল, খরচ সামলে পড়তা পোষায় না।

বালির ওপর ডাইনীর পায়ের ছিল দাগ দেখে দেখে আমরা নদী পেরোলাম। মশাল তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে পুরুষরা এগুচ্ছে। সামনে পহান্। সে দু'হাত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে চলছে, সে নিরস্ত্র। ও অত্যন্ত বিচলিত। শনিচরী ওর দুধ-বোন।

ওই যে!' বলে পহান্ই চেঁচায় ও দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা দেখলাম, দাঁড়িয়ে পড়ে দেখলাম, সামনে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কি যেন দুলছে।

আমার মনে হয়েছিল ভালুক। ভালুক দুপায়ে দাঁড়াতে পারে। ভালুকের নথ খুব ধারাল। শনিচরীর পিঠে আমি যে ক্ষতচিহ্ন দেখি তা খুব ধারাল নখে মাংস চেরার চিহ্ন। সত্যি বলতে কি, ভালুকের সম্ভাবনা আমি মন থেকে উড়িয়ে দিই নি।

কিন্তু পাথরের ওপর যে উঠে দাঁড়াল, সে ভালুক নয়। আকাশ চিরে গেল তার চীৎকারে। মোষকে জ্বলন্ত লোহায় দাগালে ওই রকম 'আঁ—

আঁ—আঁ।' চেঁচায়। কিন্তু চীৎকারটি মানুষের গলার। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ক্রুদ্ধ গর্জন। তারপরই ঢিল ছুঁড়তে লাগল ওটা।

পুরুষরা মশাল ফেলে পালাচ্ছিল। পহান্ বলল, এখন যে পালাবে, ও তার জান খেয়ে নেবে। কেউ পালাবে না। মুরহাই হতে ওরা ওরে তাড়িয়েছে, আমরাও তাড়াব।

মশাল তুলে ওরা মরিয়া সাহসে সামনে ছুটে গেল, পাথর ছুঁড়তে লাগল। এবারকার ডাইনী তাড়াবার নিয়ম টাহাড়ের হনুমান মিশ্রের কথামত। পাথর ছুঁড়ে ডাইনী তাড়াতে হবে। পাথরে এই ডাইনীরা জব্দ। ডাইনীর রক্তপাত ঘটলে সর্বনাশ, তার প্রাণ গেলেও সর্বনাশ।

মশালের আলোয় ওরা প্রস্তর যুগে ফিরে গেল। আমি সেই প্রস্তর যুগের পাথরছোঁড়া যুদ্ধের বিংশ শতকীয় দর্শক। এ লড়াই আমারও লড়াই। বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। কিন্তু আমি কিছুতেই ওদের সঙ্গে মনে মনে শামিল হতে পারছিলাম না। এই সময়ে, যুদ্ধ কালে আমার মত গা-বাঁচানো, ডক্টরেট লোভী ছেলেকেও আমার চেনা হয়ে গেল। আমার মত যারা, তারা যুদ্ধকালে দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখে ও পরের যুদ্ধের কার্যকারণ থেকে তত্ত্ব আবিষ্কার করে।

পাথুরে লড়াই চলতে চলতে, একজনকে সবাই মিলে মারবার কারণে সকলের মধ্যে প্রতিহিংসা বাড়তে লাগল। আমি ওদের মনের ভীষণ ভয়-জনিত সুতীব্র প্রতিহিংসার গন্ধ পেতে থাকলাম নাকে। ভায়োলেন্সের গন্ধ।

এবং মাঝে মাঝে ওরা মশাল ছুঁড়ে দিল ওপরে। মশালের লালচে ধিকিধিকি আলোয় সহসা ডাইনীর স্ফীত ও বিকৃত চেহারা দেখলাম। কালো, নগ্ন, যুবতী, বিকৃত রেখা শরীরের।

পাথর ফুরিয়ে যেতে ও আঁ—আঁ—আঁ চেঁচাতে চেঁচাতে নেমে এল। এরা আরো জোরে জোরে পাথর ছুঁড়ছে। নুড়ি নয়, বড় পাথর। এ পাথর মাথায় লাগলে ডাইনীর রক্ত ঝরবে। কিন্তু এরা সে কথা মনে রাখতে পারছে কই ?

ডাইনী বনের দিকে ছুটতে থাকল। আঁ—আঁ—আঁ ভীষণ চীৎকার।

ওরা ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ওকে বনে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে এল। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

ফিরে এসে পহান বলল, আজ রাতে ঘুম নাই। যে ঘুমাবে, তার রক্ত খাবে। সবাই আমার ঘরে চল। মদ আন, যার ঘরে যা আছে। মদ খেয়ে, হল্লা করে রাত জাগ। কাল পূজা হবে।

ঠিক এই রকমই হয়েছিল মুরহাই গ্রামে। তখনো পহানের ডাকে গ্রামবাসীরা রাত জাগে। সেই রাতেই সে গ্রামের দুজন প্রণয়ী পালায়। ওরা বলে তাও ডাইনীর অভিশাপে ঘটেছে। কেন না, যারা পালায়, তারাই ডাইনীকে প্রথম দেখেছিল।

আমরা ফিরে এলাম। মদ এরা নিজে চোলায়। ঘরে ঘরে তাড়ি থাকে। এরা 'টাক্' তৈরি করে। তার নেশা খুব কড়া।

সবাই যখন হল্লা করে রাত জাগছে, তখন পহান্ আমাকে ডাইনের এক সত্যি ঘটনা বলল।

পহানের ঘরের বারান্দায় মাথুর ও পহান্ বসেছিল। দূরে গ্রামের পুরুষ ও মেয়েরা মদ খেয়ে রাত জাগছে। ডাইনী তাড়িয়ে দিলে মনে এক ধরনের বিজয়োল্লাস হয়। মুরহাইয়ের লোকদের হয়েছিল, এদেরও হয়েছে। এরা এখন গান গেয়ে রাত জাগছে। গানটি হোলির গান। হোলি এদের বাৎসরিক শিকার পরবের দিনও বটে। এরা গাইছে,

হোলিতে গেল শিকার করতে
আমার মনের মত ছেলে
ও সে পূবে গেল?
ও সে পশ্চিমে গেল?
সন্ধে হল, জ্বলল হোলির আগুন,
সে যে ফিরল না আর?
নিলাজ আমি, কুরুডার পারে দাঁড়িয়ে আছি,
ফিরব যখন, শিকারের হরিণটা
ওর সঙ্গে ভাগ করে বইব,
ক্লান্ত হয়ে ফিরবে তো?

মাথুর গানটা শুনছিল আর ভাবছিল। এসেছিল একরকম মন নিয়ে। যা দেখল, তাতে হেসাডির লোকদের বিষয়ে নতুন নতুন ভাবনা হচ্ছে। ডাইনীর ব্যাপারটি সত্য-মিথ্যা যাই হোক, এদের ভয়, ভয়-জনিত রাগ ও হিংসা অত্যন্ত সত্য। আরো সত্য হনুমান মিশ্রের ব্যাপারটি। তাঁর কথা যে অহিন্দু আদিবাসীদের বেলাও খাটে, তা প্রমাণ হয়ে গেল। সব মাটিই ক্ষয় পায়। হনুমান মিশ্রের শ্রেষ্ঠত্ব যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে মাটি ক্রমে গ্র্যানাইট কঠিন হচ্ছে।

ডাইনীও কম হিংস্র ছিল না। কেন? সে সত্যিই ডাইনী? লোহা-আগুন, কিছু কিছু জিনিসের কাছে ডাইনীরা জব্দ বলে জানা যায়। পাথরের কাছে ডাইনী জব্দ? ডাকিনী শাস্ত্রে এ এক নতুন অধ্যায়। ডাইনীরা মৃত্যুর কাছেও জব্দ। এখনো ডাইনী বলে কারুকে সন্দেহ করলে তাকে হত্যা করা হয়

ডাইনী কি করে। দূর থেকে নজর দিয়ে বা তুক করে দুধে দই কাটায়, ছাগল-গাই মেরে ফেলে, শস্য নষ্ট করে, খরা ডাকে, আকাল ঘটায়, ছোট ছেলেপিলের প্রাণ নেয় রজস্বলা মেয়েকে স্বদলে টানে, গর্ভিনীর গর্ভে ঢোকে।

ডাইনে বিশ্বাস কি শুধু এদের? মাথুরের মা কারো সামনে ছেলে-পিলেকে খেতে দেন না, বলেন নজর লাগবে। মাথুরের বৌ বা বোনেদের গর্ভাবস্থায় সন্ধেয় এলোচুলে বেরোতে দেন না উঠোনে। বলেন, কু-বাতাস লাগবে।

মাথুর তো সেগুলো মেনে নিয়েই বাস করে। সে নিজে এম. এ. পাস। ওর নিজের ভাইরা বি. এ ও বি এল. পাস। তোহ্রি আন্দাজে কেন, অঞ্চল আন্দাজে খুব শিক্ষিত পরিবার। তার ওপর মাথুরের বাবা মস্ত কাঠের কন্ট্রাক্টর। বহু লরী, মস্ত গোলা, কাঠ চেরাই-ফাড়াই কারখানা।

তাদের বাড়িতে নজর দেয় কে? কে পাঠায় কু-বাতাস? এ ধরনের বিশ্বাস থাকা মানে পরোক্ষে ডাইনীতে বিশ্বাস হল না? তাদের পরিবারকেও অবহিত রাখে এমন ডাইনীও তবে আছে?

এই সবই ভাবছিল মাথুর এবং তার শিক্ষিত চেতনায় শিক্ষা যে উপরিস্তরে, তলে যে অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার তা বুঝে হতাশ হচ্ছিল।

পহান্ বলল, তোমরা ডান্‌-ডাইনে বিশ্বাস কর না। কিন্তু ডাইনী হয়ে যায় মানুষ। আমার জীবনের একটা গল্প শোন।

—বল।

—গিধ্‌না ওঁরাওয়ের খবর জানতে চাইছিলে। যে গিধ্‌না, ইংরেজের সঙ্গে লড়ে, সে আমারি পূর্বপুরুষ। এখন আমাদের কিছু নেই। সকলের মত আমিও কোহা হেসাডির গোলবদনের জমি চাষ করি চাষের সময়ে, অন্য সময়ে যা কাজ মিলে তাই করি। আর এই পহানের কাজ।

—ভালই কাজ তো!

—ভালও নয়, মন্দও নয়, কাজ!

—বল।

—আরেক গিধ্‌না হল। আমাদের এই বংশে। আমারি কাকা। তার নাম গিধ্‌না কেন দিল বাপ-মা তাই ভাবি। গিধ্‌না ওঁরাওয়ের পর ও নাম কেউ রাখে না এ বংশে। সেই কাকার কোলে আমি মানুষ। বাপকে আমার বাঘে মারে, তা তুমি জান। কাকা খুব ভাল লোক ছিল।

যতদিন আমাকে জোয়ান করে তোলে নি, ততদিন ভাল লোক ছিল! কাকার বউটা খচড়ি, ছেলেদুটাকে রামগড়ে কয়লা কাটার কাজে পাঠাল নিজের ভাইকে ধরে। তাতে কাকার মন খুব ভেঙে যায়।

কয়লার কাজে কাঁচা পয়সা। নয়া মালিক যখন কয়লাখনি নিয়ে নিল, তখন কাকার ছেলেরা পাকা বাড়িতে ঘর নিল। কাকার বউ তখন গ্রাম ছেড়ে ছেলেদের কাছে চলে গেল।

তখন ভাল লোকটা মন্দ হয়ে গেল। আমি বললাম বাপ জানি নাই, তোমারে জানি। আমার কাছে থাক। সে বলল, তোর ভাতে থাকব না। আমি বললাম, তা ভাল, নিজের ভাত খাও, আমার কাছে থাক।

কি বলল জান? বলল, দেওদেওতার কাছে থাকব না। দেওদেবতা মেনে চললাম। তাতেই বুড়ো বয়সে আমার এত শাস্তি। তুই চৌদ্দ বছরের ছেলে, পহান্ হবি বলে পহান্ তোকে গোদ নিয়েছে।

কাকা তার মত থাকে, আমি আমার মত আছি। সে বছর খুব বর্ষা হয়। এই জিলাদে বান, এই কুরুডায় বান, জল যেন খ্যাপা হাতিপারা ছুটে। পহান্‌ আমাকে বলল, তুই খাদটা আছিস, ছোট ছেলে, যেয়ে জেনে আয় দেখি, কাকা রাতে বাতি জ্বেলে কি করে?

আমি দেখি কাকা বাতি জ্বেলে কারে ডাকে, ভাত দে! জল দে! মৌয়া বের কর। মোরে ছেড়ে যাস না।

আমি বলি কাকা? কারে ডাক?

কাকা বলে তোর কাকীরে। দেখলাম, খুব মৌয়া খেয়েছে।

পহানকে বললাম। পহান্‌ খুব ভাবতে থাকল। শেষে বলল, রাতে বেরিয়ে যায় ভোরে ফের, কি হল ওর?

আমি বলি, আমি তো কিছু জানি না। দিনে তোমার ঘরে ভূতের মত খাটি, সন্ধে হলে ঘুমোই।

এরপরেই গ্রামে মানুষ মরতে থাকল। পহানের বউয়ের পায়ে ইট বাজল। তা বাদে সে ধনুকের মত বেঁকে মুখে ফেনা তুলে মরে গেল। ওই ভগতের পিসি, সে মরল কুরুডার জলে। আর বাচ্চাদের যে কি হল। হিক্ক তোলে, হাত-পা খেঁচে মরে। সাত-আটটা মরতে, তারপর পহান্‌ একদিন সকলকে ডেকে দেখাল কাকা রাতে ঘর ছেড়ে বেরোয়, জিলাদের মাঠে যায়, সকালে ফেরে। ও সেদিন মাঠে যায়, সেদিনই লোক মরে।

মাথুর রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। বলল, তারপর? তখন কি হল?

—বিচার হল।

—বিচার!

—পহান্‌ বিচার করল। কাকা বলল, জিলাদের মাঠে যাই, দেও-দেওতা সুবিচার করল না, ডাও-পিচাশকে শুধাই, কার পাপে আমার বউ চলে গেল, ছেলেরা খোঁজ নেয় না, আমি ভুখে মরি। পহান্‌ বলল, তোমার ভাইপো তোমাকে রাখতে চাইল, তুমি থাকলে না কেন? কাকা বলল, আমি গরিব। ওর দেখ্‌ভাল্‌ করতে পারি না, কাকী খেতে দিত না, তোমাকে গোদ দিয়েছি। তোমার ছেলে ও এখন। ও পহান্‌ হবে।

ওর কাছে, নিজের ভাতে থাকব কেমন করে? আর, দেওদেওতার পূজা দেখলে আমার মনে রাগ ওঠে।

মথুরের মনে হল, এগুলি একজন ভাগ্যহত মানুষের যন্ত্রণার উক্তি।

দেওদেওতার পূজা দেখলে মনে রাগ ওঠে, এতেই জানা গেল সব। তা বাদে ··!

—কি হল?

—রাতে সবাই কাকার ঘরের দরজায় শুকনো ঝোপের পাহাড় করল। আমি কিছু বলতে পারি না, করতেও পারি না। বুকের ভিতরে কবুতরের মত ঝাপট মারে।

পহান্ ঘন ঘন বিড়িতে টান দিল। অতীতের স্মৃতিতে সে এখন বিচলিত।

তারপর ওরা আগুন দিল। সেই আগুন জ্বলতে কাকা চেঁচাল। সে চীৎকার শুনে আমি আগুন ঠেলে ঢুকতে যাই, আমাকে সবাই ঠেকাল। শনিচরীর গালে আগুন উড়ে এসে লাগে, এখনো দাগ আছে।

—তারপর?

—গ্রামের সব শাপ কেটে গেল।

—তারপর?

—পুলিস আসে। কেউ কিছু বলে নি। গ্রামে তাঁবু ফেলে, দু'দিন খোঁজখবর করে, মুরগি আর মৌয়া খেয়ে পুলিস চলে গেল।

—কাকার বউ আর ছেলেরা?

—কে জানে তাদের খবর?

—সে তো বহুদিনের কথা।

—তা তো বটেই।

—রাত শেষ হয়ে এল।

—আজ আমার অনেক কাজ।

—পুজো হবে?

—দিতেই হবে।

—হেসাডিতে ডাইনী আর আসবে না ?

—না। যাতে না আসে, তা দেখতে হবে। গ্রামের ছেলেরাও মানে না কিছু। গাই ছাগল মাঠে নেয়। শ্মশান-পাথরে ছাগল মোতে-হাগে। এগুলো ভাল কাজ নয়।

—একটু শুয়ে নাও।

—তুমি ঘুমাও।

বারান্দায় ঘাসের চাটিতে শুয়ে মাথুর এবার হোলির গানে ছেলেটির বক্তব্য শুনল।

ও মেয়ে, ও পাষাণবুকো মেয়ে,
শিকার খেলে এলাম—
তুই বনের ধারে নেই।
তুই গাঁয়ের ধারে নেই।
তুই কেন ভিজে পায়ে এলি ?
কুরুডার জলে পা ভিজিয়ে ?
নতুন সাথী পেলি না কি ?
চুলে কুসুম ফুল।
মুখখানা তোর রাঙা ?

মাথুর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোবার আগে পহান্কে বলল, আমি আবার আসছি তোহ্রি ঘুরে। ডাইনীর কি হয় জেনে যেতে হবে।

হেসাডি গ্রামের অভিজ্ঞতার পর একদিন কোহা হেসাডিতে বড় হাটে তিন বৃদ্ধ মিলিত হল।

কুরুডা, হেসাডি ও মুরহাইয়ের পহান্। মুরহাইয়ের পহান্ বলল-শনিচরীটা তোদের ঘরে গেল ?

- হ্যাঁ।

—হাসপাতালে মরল !

– মাথুর আনল।

—ডাক্তার কি বলল ?

—কি অসুখ না কি ওর ছিল। সে অসুখে ঘা শুকায় না, রক্ত বন্ধ হয় না।

—রক্ত পড়া বন্ধ হয় নাই ?

—না। রক্ত পড়ল তো পড়ল, ঘা হয়ে গেল সব। চোখ ঢুকে গেল গর্তে।

কুরুডার পহান্, হেসাডির পহানের শোকার্ত ও কাতর মুখ দেখতে পারছিল না। ও বলল, বাবা! ডাক্তার কি জানবে ? ডাক্তার জানে সুঁই দিতে, ওষুধ গিলাতে, নাকে নল ঠুসতে। শনিচরীকে কেচ্‌চা (মৃত্যু) নখ বিঁধাল। তারপর মানুষ বাঁচে ? শনিচরী গেছে, ভাল গেছে।

—ওর নাতিটা ?

আমার কাছে। ও ছিল আমার দুধ-বোন। ছোট ছেলে! কোথা থাকবে ?

—ওর ঘরটা ?

—পড়ে যাক।

—খুব ওষুধ মন্ত্র জানত।

—তাতেই মরল।

হেসাডির পহান্ বলল, সোম্‌রা, আঁধার হয়। কেন ডেকেছ বল ?

—কথা কি! ডাইনীর সাড়া নাই। তাতে ভয় বেশি। কবে সাড়া পাব তখন ঠেঙাব ? আমি বলি, আমাদের ছেলেরা রাজী আছে। আমরা একসাথ হয়ে যদি খুঁজতাম!

হেসাডির পহান্ আস্তে বলল, না। রাজী আমাদের ছেলেরাও হবে, কিন্তু ভেবে দেখ।

—তুমি বল। তুমি বয়সে বড়, জ্ঞানে-মানে বড়।

হেসাডির পহান্ বুঝল, তারই মত নেংটিপরা, লোল চামড়া, আর দুই বৃদ্ধের কাছে ও যে সম্মানটা পেল, তা ওর দুই পূর্বপুরুষ গিধ্‌না ও কালনা ওঁরাওয়ের জন্যে। গিধ্‌নার ফাঁসি ও কালনার গুলিতে মৃত্যু নিয়ে একটি গান সবাই জানে।

গিধ্না, তুমি ভয় পাও নি
নিজে গলায় ফাঁস পরলে
কালনা, তুমি ভয় পাওনি
এগিয়ে গিয়ে গুলি খেলে।
তোমাদের নাম হয়ে গেল গাছের পাতা
যত বার ঝরে ততবার গজায়॥

হেসাডির পহান বলল, যারা যাবে, তারা মা-বাপের ছেলে। ডাইনীর স্পর্শ লাগতে মরব। নিজেদের ছেলেদের আমরা পহান হয়ে মরতে পাঠাব?

—না, ঠিকই বলেছ।

—যখন যেমন, তখন তেমন কাজ করব। ভাল কথা, গোলবদন কলিয়ারি চালাবে?

—শুনছি তো।

—দেখা যাক। পেট আর চলে না।

গোলবদন তখন শস্তা পেল, কলিয়ারি কিনল। ওর ভাইয়ের ইটভাটিও তো বন্ধ।

—বদমাশি করে বন্ধ রেখেছে।

মুরহাইয়ের পহান এবার উশখুশ করে বলল, ছেলেটা আমার শুনে এসেছে, ওই কলিয়ারি আর ইটভাটি টাহাড়ের হনুমান মিশ্র কিনেছে। পৌষ মাসে চালু করবে।

—কিনুক। যে কিনবে আমাদের বারো আনা রোজের বেশি দেবে না। দেবে? আমরা কাজ পেলে কাজ করব।

—কি হল দিনকাল। সময়ে জল নেই, বাতাসে হিম নেই।

—আরো মন্দ হবে।

—তবে চেষ্টা একটা করতে হবে। আদিবাসী দপ্তরকে বলতে হবে, আমরা যেন কুলি কাজ পাই।

হেসাডির পহান্ মাথুরকে সেই কথাই বলল। বলল, তুমি তোহ্রিতে অফিসারকে বল না!

—বলব।

এই সারফেস্ কলিয়ারিগুলি অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য। মাটির প্রায় ওপরে, নিম্নমানের বয়লা মেলে এই কলিয়ারিতে। জাতীয়করণ করে এই দূরদুর্গমে ছোট ছোট সারফেস্ কলিয়ারিকে সরকারী আওতায় আনা যায় নি। এগুলি সরকারকে জলিফলি করে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিরাজ করছে।

সত্তর-একাত্তরে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিপন্ন বলে হুজুগ তুলে যারা দক্ষিণ-পূর্ব বিহারের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তারা সে সময়ে দশ বা পনের হাজারেও এমন একেকটি কলিয়ারি কিনেছে। আদিবাসী ও স্থানীয় নিম্নবর্ণ কুলি জলের দরে মেলে। বেল্‌চা কোদালে এরা কয়লা কাটে, গাঁইতিতেও। কাঁচা রাস্তায় ট্রাক এই কয়লা বয় দূরে দূরে।

ইটভাটিও খুব লাভজনক। এখানকার মাটিতে যে ইট হয় তা কাঁচা শুকোলেও তাতে তৈরি বাড়ি বহু বছর টেকে, পোড়ালে তো কথাই নেই। ইটের মাটি সর্বত্র নেই, কলিয়ারি যেখানে সেখানে। দশ বা পনের বা ত্রিশ হাজারেই একজন কলিয়ারির মালিক। দশ বছর কয়লা কাটলেই লাভ প্রচুর। অঞ্চল লেবার বারো আনা রোজেই ধন্য। কেননা কোন কাজেই তারা এত পয়সা কামাই করে না।

মাথুর খবর নিয়ে জানল, খবরটি সত্যি। টাহাড়ের হনুমান মিশ্র মন্দির তুলে ক্ষান্ত হন নি। বহু ফলবাগিচা কিনেছেন, বহু জমি। কলিয়ারি কয়েকটা কিনলে অঞ্চলটি তাঁর হাতের মুঠোয় নিশ্চিতভাবে আসে।

হনুমান মিশ্র তার কাছে কথাটা স্বীকার করলেন। দুঃখ করে বললেন ইংরিজী পড়াবার কুফল এ সব। ছেলেরা আর মন্দির নিয়ে থাকতে চায় না। নিজেকে দিয়ে দেখ না! তুমি কি তোমার বাপের বেওসায় গেলে? ওদের জন্যে এখন এ সব করতে হচ্ছে। আমি বলি, করগে যা। তোরা একটা কেন, দশটা কলিয়ারি কেন। আমি আমার মন্দির নিয়ে থেকে যাব।

—অঞ্চল-লেবার নেবেন তো?

ইচ্ছে তো তাই। দেখি বিশ্বনাথজী কি করেন। ওঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়।

মাথুর সব কথাই হেসাডিতে এসে জানাল। তারপর বলল, ইটভাটি তো পোড়ো হয়ে আছে। সব নতুন করে করতে হবে।

— গিয়েছিলে ?

- নাঃ! সে তো অনেক দূরে।

—হেসাডির পর তিনটে গ্রাম পেরিয়ে যে গোম্ফা আছে, তারপর ইটভাটি।

—টুরা গ্রামে? টুরার কাছে। টুরা আরেকটু দূরে।

— আচ্ছা, ওখানে না হরিণ মেলে?

— মারবে না কি?

—জিগ্যেস করছি।

—জানি না। অত দূরে কে যাবে? আর, ওই গোম্ফার জায়গাটা ভাল নয়।

—কেন?

—রাতে জায়গাটা খুব খারাপ।

—ডাইনীর তো পাত্তা নেই।

—কি বুঝব বল? ডাইনী আছে বলে কিছুই জানলাম না। শনিচরীটা মরে গেল। সে কথা ভাবলেও দুঃখ হয়।

— চল না, শিকারে যাই।

—আর শিকার!

—বন্দুক আনব। শিকার করবে, পোরমিট?

—ওঃ! কত পারমিট নাও তোমরা।

—সরকারী কানুন সব হল ভুঁইছাড়া। গুলবাঘা গ্রামে ঢুকবে, গাই-ছাগল মারবে। পোরমিট এলে তাকে মারব? গুলবাঘা কি বড় বাঘ, কি পোরমিট, জানে?

— তাই তো। তোমার খুব শখ?

—খুব।

—কেমন বন্দুক ছোঁড় ? চাম্পিয়ন।

—দেখা যাবে। বড় খতরনাক এ গুলবাঘা। গাঁয়ে কুকুরগুলো আমাদের পাহারাদার। ওরা গাঁয়ের পুলিস। তা গুলবাঘা যদি কুকুর পেল, তো আর কিছু নেবে না। তাই মারব।

—কুকুর ?

—গুলবাঘা।

—বেশ! এবার আসার সময়ে একটু কেরোসিন আনতে পার ? কোহা হেসাডিতে পোরমিটে কেরোসিন মেলে না। মৌয়া তেলে বড় ধোঁয়া, চোখ জ্বলে যায়।

—আনব। তোহ্‌রি থেকে সাইকেলে আসতে পারব না। দুটো ছেলেকে পাঠিয়ে দিও।

কয়েকদিন বাদে দুটি ছেলে তোহ্‌রিতে হাজির হল। তারা কেরোসিন নেবে দু টিন। কিছু দড়ি ও পেরেক। পহান্ বলে দিয়েছে, মাথুর যেন খানিকটা লাল ওষুধ নিয়ে যায়। একা মাথুর জানে, সে ওষুধ, যাতে কাটা পোড়া সব সারে। শনিচরীর নাতির গায়ে গরম জল পড়ে পুড়ে গেছে।

সব শেষে ওরা বলল, বন্দুক ঔর গোলি নিতে বলেছে পহান্।

—কেন ?

—গুলবাঘা কোথায় ?

—ঢাই গ্রামের জঙ্গলে।

—কে দেখেছে ?

—কে দেখবে ? গ্রামের কুকুর উধাও হয়ে গেছে পরপর তিনটে। জঙ্গলের ওপর শকুন উড়ছে।

মাথুর বড় এক শিশি মার্কুরিও ক্রোম নিল। পহানের এটা বেশ ভাল। ডাক্তার ওষুধ, ইঞ্জেকশান, কিছু মানবে না, কিন্তু মাথুরের সঙ্গে যে ওষুধের ব্যাগ থাকে, তার মার্কুরিও ক্রোমে ওর পায়ের ফোসকা যে সেরেছিল, তা মনে রেখেছে। মাথুরের মনে হল পহান্ অন্য মানসিকতার মানুষ হয়েও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ মেনে নিচ্ছে তো অণু

পরিমাণে। সেবার মাথুর ওর দাঁতের সেপসিসে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ায়। শনিচরী হাসপাতালে গেলে বেঁচে যাবে শুনে পহান্ই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখায়।

হয়তো ডাইনীর ব্যাপারেও পহান্ কোন দিন যুক্তিবাদিতার পরিচয় দেবে।

কিন্তু ডাইনীর ব্যাপারে কি যুক্তিবাদিতা খাটে? মাথুর কি নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে ডাইনীর ব্যাপারে কূল পাচ্ছে

সাতপাঁচ ভেবে মাথুর বউকে বলল, দিলীপের পুরানো জামা প্যান্ট চারটি দাও তো।

—বাসন কিনব না?

—না।

দুটি ছেলেমেয়ে হবার পরেও মাথুর ও তদীয় পত্নীর সম্পর্ক খুব ভালো। মীরা কখনও ওকে, বাপের ব্যবসা না করে মাস্টারি করার জন্য দোষ দেয় না। মীরা অত্যন্ত নরম ও শান্ত মেয়ে। ওর স্বামী পরিবারের সকলের কাছে দুর্বোধ্য বলে মীরার মনে স্বামীর প্রতি একটা মমত্বের ভাব আছে।

এক পোঁটলা জামাকাপড়, মার্কারিও ক্রোম, পেরেক, দড়ি, বিড়ি নিয়ে মাথুর রওনা হল। বন্দুক ও গুলি। শিকার করতে ওর খুব ভাল লাগে। যাবার সময় দেখল, মীরার মুখটা শুকনো। নিশ্চয় কোনো উপোস করেছে, কোন ব্রতের কারণে।

—উপোস করে আছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—পুজো দেব।

—কেন?

—তোমার জন্যে।

—কেন?

—ডাইনী আছে না? যেখানে যাচ্ছ?

—যার ঘরে তুমি আছ তাকে ডাইনী কি করবে ?

—বোল না ও কথা। ভালয় ভালয় ফিরে এস। ওই সায়েবটা যত নষ্টের গোড়া। নিজে বসে আছে পাটনায়, তোমাকে আগুনে ফেলে দিল।

—না মীরা, ডক্টরেট করে তোমাকে নিয়ে আমেরিকা চলে যাব।

কথাটা বলার সময়ে মাথুরের হয়তো অনুরূপ কোন স্বপ্ন ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই তার মানসিকতার ধস নেমে সেই স্বপ্ন অলীক হয়ে যায় রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে। এখন, সব কিছুর পর, মাথুর আর স্বপ্ন লালন করে না। এখনো সে তোহরিতে মাস্টারী করছে এবং যে ইতিহাস নিয়ে থিসিস্ লিখবে না, গিধনাদের সেই বিদ্রোহের ইতিহাসের মালমসলা খোঁজার অছিলায় বারবার হেসাডি যায়। পহান্কে ও ভালবেসে ফেলেছে এবং কৌতূহলী পাঠক জেনে সুখী হবেন, এদের ভালবাসা এখনো সমান্তরাল, রেলপথের পাশের নদী। দুটির মিলিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। মাথুর ও পহান্ রেলপথ ও নদী, কোন বিন্দুতে মিলিত হলে সর্বনাশ হবেই হবে।

মাথুর চলে যায় হেসাডি। শনিচরীর নাতির ফোসকা-গলা ঘায়ে ওষুধ দেয়। পেরেক ঠুকে উঠোনে বসার মাচা বানায়। পহানের সঙ্গে গ্রামে কেরোসিন বিলি করে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়। তার পরদিন সকালে, শিকার করে বাঘটিসহ গ্রামবাসীদের ছবি তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েকজন যুবককে নিয়ে রওনা হয় ঢাই।

হেসাডির পর তিনটি গ্রাম পেরোলে এক গুহা। তারপর ইট-ভাটি। তারপর টুরা গ্রাম। টুরা মুণ্ডাবসতি গ্রাম।

তিনটি গ্রামের শেষ গ্রাম ঢাই। ঢাই অত্যন্ত ছোট গ্রাম। কুরুডা নদীর পারে। ওপারে জঙ্গল। আমলকী, পলাশ, সিধা ও শিশু গাছের জঙ্গল। গ্রামের কুকুর নদীর পারে সর্বদাই আসে। পরপর কুকুর নিখোঁজ মানে চিতাবাঘ। সবাই জানে, চিতাবাঘ কুকুরের মাংস খুব ভালবাসে। জঙ্গলের ওপর শকুন উড়ছে, কুকুরের ভুক্তদেহ নিশ্চয় ওখানেই। মাথুর ছেলেদের বলল, একেবারে কথা বলবি না। চিতা

অতিশয় খতরনাক। শব্দ পেলে পালাবে। খুবই আনন্দ হচ্ছে ওর, উত্তেজনা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সতর্কে হাঁটতে ভাল লাগছে। জঙ্গলের ভেতরটা সবুজ ছায়ায় ঘন, হাঁটতে মজা। সাপ নেই আশা করি। পায়ে না কামড়ালেই হয়।

তারপর জঙ্গল আবার পাতলা। কয়েকটা ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছ।

গাছের গুঁড়িতে বসে, ওদের দিকে পেছন ফিরে ডাইনী হাত তুলল। কুকুরের ঠ্যাং মুখের কাছে নামাল। মাথুরের বুকের নিচে হাতুড়ি পিটছে। যুবকগুলি এলোপাথাড়ি ছুটল।

ডাইনী মুখ ফেরাল। তারপর 'আঁা—আঁা—আঁা' চীৎকারে বন চিরে-ফেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্ফীত, বীভৎস শরীর। মাথুর চোখ ঢাকল, বন্দুক ফেলে দিয়ে পেছন ফিরল। তারপর দৌড়ল।

দৌড়তে দৌড়তে ও পেছন ফিরে দেখল। ডাইনী তাড়া করে আসছে। কিন্তু শ্লথ পায়ে। মাথুর আবার দৌড়ল।

ছেলেগুলি ধরে নিয়েছিল, মাথুরকে ডাইনী মেরে ফেলেছে। ডাইনীর 'আঁা—আঁা—আঁা' চীৎকারে সে ধারণা আরো পাকা হয়। মাথুর ভাল দৌড়তে পারে বলে ওদেরই ধরতে পারল।

মাথুর বলল ডাইনী নয়। মানুষ। ওরা মাথুরকে একেবারে উড়িয়ে দিল। ভয়, ভীষণ ভয়। সেই সঙ্গে হিংস্র আক্রোশ।

ওরা ঢাই গ্রামের ভেতর দিয়ে চেঁচিয়ে চলে গেল, 'ডাইনী! ডাইনী! মেয়েরা ঘরে যাও পুরুষরা বেরাও, আমরা আসছি।'

ওরা চলে গেল হেসাডি। ঢাই, তোপা ও বুরুডি গ্রামের পুরুষরা বেরোল। মাথুর এই নাটকে এখন মঞ্চে। বেরোবার পথ নেই। অথচ এ তার নাটক নয়, এবং তার কোন ভূমিকা নেই। অপেক্ষা করতে লাগল ও।

অপেক্ষা করতে করতে, ওদের ক্রুদ্ধ কথা শুনতে শুনতে ও হঠাৎ একটা বিস্ফোরক সত্য দেখতে পেল।

তাই আকাশে মেঘ ঘুরে, জল নাই! বনে কন্দ মিলে না। নদীতে মাছ নাই। বাতাস যেন শাঁস ফেলে!

কথাগুলি এই রকম। সহসা মাথুর বুঝল। মানবসৃষ্ট অর্থনীতির জগতে এদের কোন ঠাঁই নেই। ইটভাটি-কলিয়ারি-বোখারোর ইস্পাত—কাঠের ব্যবসা—রেলপথ—খেত শস্য—সবই এদের ফালতু করে রেখেছে—

প্রকৃতিই এদের একমাত্র উপায়। জল হলে চাষ হয়, বন সরস হয়, কন্দমূল মেলে, নদীতে মাছ। অনাবৃষ্টিতে প্রকৃতির স্তন শুকিয়ে গেছে। অতএব এরা ডাইনীকে দায়ী জেনে ক্রুদ্ধ। ভারতের মানুষ এদের চায় না। প্রকৃতি বিরূপ হলে এরা মুছে যাবে।

একে একে লোক জমল। সবাই সশস্ত্র। সকলের হাতে লাঠি। কোঁচড়ে পাথর।

এরা কেন ক্রুদ্ধ, তা মাথুর জানে। কিন্তু সে জেনেও মাথুর এদের মনোভূমিতে গিয়ে এক হতে পারবে না। একই অঞ্চলের সন্তান এরা এবং মাথুর। কিন্তু মাথুরের হাতে বন্দুকের বাঁট। নল এদের বুকে। বর্ণ হিন্দু বনাম আদিবাসী। বন্দুক ফেলে দিয়ে টার্গেট ও ঘাতক হাত মিলিয়ে এক হতে পারে না।

হেসাডির পহান্ এসে পৌছতে বেলা এগারটা বাজল। তারপর শতাধিক লোক একসঙ্গে চেঁচাতে চেঁচাতে বনে ঢুকল।

ডাইনী উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ছে ডাইনী, আবার চলছে। হোঁচট খাচ্ছে বারবার। জঙ্গলে ঢিল মারা বিফল। গাছে বেধে যায়।

আঁ—আঁ—আঁ' চীৎকারটা কখনো গর্জন, কখনো আর্তনাদ।

—হেই! দাঁড়া তোরা। ও নদী পারায়।

- কোথা যায়?

- আরে, আরে গোম্ফায় যায়।

—গোমফায়।

—দেখ্ তোরা!

জঙ্গলের আশ্রয় ছেড়ে ডাইনী এখন নদী পেরোচ্ছে। শ্লথ গতি। মাঝে মাঝে মুখ ফেরাচ্ছে। হাত তুলছে ওপরে, আবার পেট চেপে ধরছে। খুব অদ্ভুত ওর নড়াচড়া, চলা।

—মার পাথর !

—রক্ত পড়ে না জানি।

ডাইনী নিঃ হল। তারপর পাথর তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

লোকগুলি থমকে দাঁড়াল। মাথুর ওদের পেছনে। ভাল দেখতে পাচ্ছে না। সহসা, প্রায় বিদ্যুৎগতিতে ডাইনী যেন মরিয়া হয়ে ছুটে গেল গোম্‌কায়।

—গেল গেল গেল।

সবাই এসে গোমকার বাইরে দাঁড়াল। টুরা গ্রামের মুণ্ডারাও এসেছে। জনতার মেজাজ ভীষণ হিংস্র।

চাই গ্রামের পহান্‌ বলল, তোমরা এ কি করলে ?

—কি করলাম ?

—আমাদের জীবনে ও ঢুকে গেল ?

—আমরা ঢুকালাম ?

—গোম্‌কা হতে ও বেরোবে না।

—আমরা জানি।

—আমাদের বিপদে ফেলে তোমাদের যেতে দিব না।

—আটকাবে ?

—কেটে ফেলে দিব।

—আমরা কাটতে জানি না ?

হেসাডির পহান্‌ বলল, এ কোন কাজের কথা নয় হে। এমন বিপদ!

—কি করব, বল ?

—ওরে বের করে তাড়াতে হবে।

—বের করবে কে ?

—আমরা।

—কেমন করে ?

—শিয়াল গর্তে সাঁজালে কি কর ?

—আগুন দেই ?

—আগুন দাও।

—ঢাইয়ের পহান্ বলল, পুড়ায়ে মারবে? অ্যাঁ? পুড়াবে ওরে?

—না না, ওরে মেরে নিজেরা মরব?

—তবে কি বল?

—গোমফার মুখে আগুন দাও। ধোঁয়ার তাপে ও বেরোবে। তখন খেদাও। টুরার পহান্ বলল, খেদাবে জঙ্গলপানে। গ্রাম পানে নয়। মোদের গ্রামে আকালে জ্বলে আছি মোরা।

—জ্বলে নাই কে?

—তাই বলি।

এখন মাথুর যা দেখছে সব অবাস্তব। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায়, নিদারুণ হিংস্রতায় ওরা গাছ কাটছে, ঝোপ কাটছে। রক্তপিপাসু জনতা। সৈন্যদের নিয়মানুবর্তিতায় ওরা গোম্ফার মুখে ঝোপ ও ডালপালা পাঁজা করছে। ঢাই গ্রামের কে কেরোসিন আনল, ঢালল। হেসাডির পহান্ চকমকি ঠুকল।

আগুন, আগুন। বাতাস শ্বাস ফেলল। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। ধোঁয়া গোম্ফায় ঢুকছে। আগুনের তাপে কাঁচা ডালে ফটাস ফট্টাস শব্দ। আগুন এড়াতে লোকগুলি পিছিয়ে এল।

সবাই গলা বাড়াল। সবাই স্তব্ধ। চোখে মুখে ভীষণ উল্লাস। ভীষণ প্রতিজ্ঞা।

—বের হও। বের হও!

হেসাডির পহান্ দুলছে কেন? মন্ত্রোচ্চার করছে না কি? ডাইনী খুঁচিয়ে বের করবার নিয়ম এটি?

সবাই দুলছে। সবাই বলছে, বের হও! বের হও! মাথুর নিজে দুলছে এদের সঙ্গে এক হয়ে? নাকি তার মধ্যেও কোথাও আছে প্রস্তর যুগ? মাথুর গাছের ডাল চেপে ধরে শরীরকে শাসন করল।

—হুই! হুই দেখ!

ধোঁয়ার কুণ্ডলী হঠাৎ সাপের মত পাকিয়ে উঠল। অজগরের মত শ্লথ সর্পিলতায় গোম্ফায় ঢুকল। ধোঁয়ায় সব অন্ধকার।

অঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আর্তনাদ, আর্তনাদ, মানুষী আর্তনাদ, মানুষই তো ডাইনী হয়। যখন হয়, তখন মানুষই তাকে খুঁচিয়ে বের করে। মাথুরের বুকের নিচে সব ভেঙে পড়ছে কেন?

আঁ—আঁ—অঁ—আঁ। হঠাৎ আর্তনাদ থেমে গেল। নৈঃশব্দ্য। ভীষণ নৈঃশব্দ্য। তারপর একটা কাতর কান্না। অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য। যেন কোন নবজাতক কাঁদল।

সবই সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত। সহসা সমস্ত দৃশ্যের অবাস্তবতা ভেঙে দিয়ে টুরার পহান্‌ চেঁচিয়ে উঠল। না—আ!

টুরার পহান্‌ ছুটে গেল। বড় একটা ডাল টানতে টানতে আনল। দুহাতে ধরে ও আগুন ঠেলছে। পথ করছে।

—কি কর?

—আমায় যেতে দাও।

—না!

—আমি যাব যাব রে!

—না।

—ছেড়ে দাও।

—মরবে।

—মরেছি, মরে আছি। হা তোমাদের পা ধরি—

টুরার পহান্‌ তার হাত কামড়ে ধরল। লোকটি হাত ছেড়ে দিল। তার নিজের হাতে রক্ত।

টুরার পহান্‌ রক্তমাখা মুখ হাতের চেটোয় মুছে ফেলে বলল, যে আগাবে তারে কেটে ফেলব। সবাই নিশ্চল, বিভ্রান্ত।

টুরার পহান্‌ আগুন মাড়িয়ে ভেতরে ছুটে গেল। তারপর গুহাটা তার কণ্ঠে কেঁদে উঠল। সোম্‌রি! সোম্‌রি! সোম্‌রি!

মাথুর এগিয়ে এল। অবাস্তব দুঃস্বপ্ন থেকে বাস্তবতায় ফিরল। জনতার দিকে তাকাল ও, আগুন মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকল।

গুহার অন্ধকারে চোখ চলে না। চামচিকের দুর্গন্ধ। চামচিকেগুলি ধোঁয়ার তাড়নায় ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াচ্ছে।

গুহার মেঝেতে নতজানু টুরার পহান্। মেঝেতে পড়ে আছে নগ্ন এক যুবতী। তার দু পায়ের ফাঁকে নাড়ীতে বাঁধা নবজাতক।

—আমার মেয়ে!

টুরার পহান্ মেঝেকেই বলল। তারপর অন্ধকারে চোখ তুলে বলল, পোগাটা! দেহ বাড়ল, বুদ্ধি বাড়ে নাই! টাহাড়ের হনুমান মিশ্রের বাড়ি গোহাল কাড়বার কাজে দিয়াছিলাম। গোহালের কাজে।

—কবে?

বছর ঘুরে গেছে। আজ পাঁচ মাস হয় তার সংবাদ নাই। মিশ্রজী বলে সেথা হতে কোথা চলে গেছে। কত খুঁজেছি, পাই নাই। পরে জেনেছি ঠাকুরের ছেলে ওরে নষ্ট করে। শুধাতে যেয়ে জুতা খেয়ে এসেছি। ডাইনী, ডাইনী, ডাইনীর কথা তুলে দিল ঠাকুর! তা কখনো জানি নাই আমার সোমৃরি ডাইনী! কখনো জানি নাই!

—ডাইনী নয়!

মাথুর মুখ ঘোরাল। হেসাড়ি ও মুরহাইয়ের পহান্।

টুরার পহান্ বন্য পশুর মত মাথা নাড়ল। তারপর রুদ্ধ বিকৃত স্বরে বলল, আমারেও মার। এই গেঁদাটাকেও।

—ডাইনী নয়!

হেসাড়ির পহানের এই কথা দুটি এ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ ডাইনী প্রসঙ্গে শেষ কথা। তারপর হেসাড়ির পহান যা বলল, তা টুরার পহানের মেয়ে সোমৃরি প্রসঙ্গে প্রথম কথা।

—তুমি উঠে এস। মেয়েদের ডাক হে, এ তাদের কাজ।

—কি কাজ?

টুরার পহান্ বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধি চোখ তুলল। নিহত হবে যারা, তাদের কি কাজ থাকতে পারে? হেসাড়ির পহান্ গুহার দেয়াল ধরে মুখ ফেরাল।

বলল, চাই গ্রামে মেয়ে নাই? নাড়ী কাটবে না? ডাক। ওঠ।

মাথুরকে সে বলল, জামা খুল। বাপের হাতে দাও। বাপ রইতে পারে, তুমি আমি পারি না।

হেসাডির পহান্ বেরিয়ে এল। চেঁচিয়ে বলল, সবল কথা পরে হবে। টুরার পহানের বোবা হাবা মেয়ে সোম্রি ছেলে বিইয়েছে। কেউ গ্রামে যাও হে, মেয়েদের ডাক। পহান্! তোমার গ্রামে মানুষ নাই?

ডাইনী কোথা?

—টাহাড়ে যেয়ে শুধাও। বোবা হাবাটারে ছেলেরে দিয়ে নষ্ট করিয়ে খেদায়েছে। তা বাদে ধুয়া ছেড়েছে ডাইনী বেরাল, পাথর মার, জানে মের না।

—তুমি এ কি বল?

—যা বলি ঠিক বলি। গিধ্না-কাল্নার নাতির নাতি, ডাইনী হলে এ কথা বলতাম? যাও, গ্রামে যাও!

এ কথার পর আর কথা চলে না। গিধ্নি-কাল্না সকলের রক্তে স্বপ্ন হয়ে বেঁচে আছে, থাক।

হেসাডির পহান্ কখনো তাদের নাম বলে কোন দাবি জানায় না। যদি জানায়, তাহলে তাদেরি মত এই নিরন্ন পহানের কথা সবল ওরাও মানতে বাধ্য।

টুরার মুণ্ডা যুবকেরা গ্রামের দিকে ছুটল।

চাই থেকে মেয়েরা এল। নাড়ী কাটল, ছেলেকে মুছে সাফ করল। যারা ডাইনীকে পাথর মেরে বের করে দিতে চেয়েছিল, যারা আগুন জ্বেলে ডাইনীকে গুহা থেকে বের করতে চেয়েছিল, তারা ডালপালা কেটে মাচান বাঁধল।

মেয়েরা ধরাধরি করে সোম্রিকে বাইরে আনল। মাথুরের শার্টে তার নগ্নতা এখন আবৃত। সকলের দিকে চাইল সোম্রি। না, ওর চোখে প্রতিহিংসা নেই। পুরুষরা ওর দিকে চাইতে পারছিল না।

মাচানে ওকে ও শিশুকে শোয়ানো হল। চাটি পেতে দিল চাই গ্রামের পহানী। ওকে তোলা হল। টুরার পহান্ একটি সপত্র ডালে সোম্রির মুখের রোদ আড়াল করে মাচানের পাশে পাশে হেঁটে চলল।

পুরুষরা ছত্রভঙ্গ এখন। যে যার গ্রামে ফিরবে। হেসাডির পহান্ ও মাথুর জঙ্গলে ঢুকল। মাথুর বন্দুকটি খুঁজে পেল, গুলি।

হাঁটতে হাঁটতে মাথুর একটি কথাও বলল না। হেসাডির পহান দুটি কথা বলল। খিদার জ্বালায় কাঁচা মাংস খেয়েছে।

মাথুর কিছুই বলল না।

তুমি হনুমান মিশ্রকে যা বলেছ, কথা ফিরিয়ে নিও। ওর কুলি কাজে যাব না মোরা। কারেও যেতে দিব না। বাহারের কুলিও আনতে দিব না।

মাথুর মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ বলল, কথা বলল না। শান্তি, আশ্চর্য শান্তি। হেসাডির পহান মাঝে মাঝে অবাক হয়ে চাইছিল, যেন যা দেখছে, সব নতুন। মাথুর বুঝতে পারছিল, হেসাডির পহান্ বুঝছে, বাতাস তেমনই মধুর আছে, বনভূমি তেমনই সবুজ। আতঙ্কের চাপানো মেঘটা উড়ে গেছে বলে হেসাডির পহান্ জানছে, সব যেমন ছিল, তেমনিই আছে। কখনই আকাশ রং পালটায়নি। বাতাস থেমে যায় নি। অন্যান্য অনাবৃষ্টির বছরে প্রকৃতি যেমন থাকে, তেমনিই আছে। হেসাডির পহান্ শুধু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করেছিল, সব বদলে গেছে।

হেসাডির পহান্ আবার বলল, নিজেরা যাব না। বাহারের কারেও যেতে দিব না।

মাথুর কিছু বলল না। হ্যাঁ জানিয়ে মাথা হেলাল। ওর চোখ উপচে জল আসছে। পহান্ বলল, কাঁদ কেন?

মাথুর কিছু বলল না। পহান আর ওর তো কোন মিলনের বিন্দু নেই। ওরা সমান্তরাল। মিলিত হয় না, কেমন করে ও বোঝাবে ওর কান্না পাচ্ছে কেন?

ওরা জঙ্গল ছাড়িয়ে নদীর বুকে নামল। পেছনে চাইলে ওরা সুদূর টাহাড়ে হনুমান মিশ্রের সুউচ্চ মন্দিরের পেতলের ধ্বজা দেখতে পেত।

ওরা পেছনে চাইল না। সামনে এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে।